Approved by the D. P. I. of Bengal for the use of teachers
(Cal. Gazette 10. 4. 41)
It is also included in the list of books recommended by the Inspectors of Schools for the Departmental Examinations in the Art of Teaching.

শিক্ষা

(শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালী)

শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্. এ., বি. টি.-
প্রণীত

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণ

মূল্য ৪৷৷০ টাকা

Published by A. C. Ghosh, Presidency Library, 15 College Square, Calcutta. Printed by A. C. Ghosh, Sree Jagadish Press, 41 Gariahat Road, Calcutta—19.

ভূমিকা

প্রত্যেক ব্যবসায়ে সফলতা লাভের জন্য তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ কাজটি যদি জটিল বা কৌশলপূর্ণ হয় এবং তাহার যদি যুক্তি-সঙ্গত মূলনীতি ও সুচিন্তিত কার্য-পদ্ধতি থাকে, তবে তাহাদের সবিশেষ জ্ঞান লাভ না করিয়া কেহই দক্ষতা ও সফলতার সহিত সেই কাজ সম্পাদন করিতে পারে না। আধুনিক শিক্ষাদান-প্রণালীর সহিত সুপরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, শিক্ষাদানও একটা খুব জটিল বা কৌশলপূর্ণ কাজ। সুতরাং **শিক্ষাদানকার্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে তাহার মূলনীতি ও কার্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজন।**

ট্রেনিং কলেজে অধ্যয়নের সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত শিক্ষাদান-প্রণালীর সহিত সুপরিচিত হইয়া যখন একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হই, তখন সেই সমস্ত দেশের বিদ্যালয়গুলির আদর্শে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার উচ্চ সঙ্কল্প লইয়াই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে ভালরূপে বুঝিতে পারি যে, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলে, একমাত্র প্রধান-শিক্ষকের আপ্রাণ চেষ্টায়ও আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারে না। ইহাও দেখিলাম যে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে ট্রেনিং পাওয়ার সুবিধা যেরূপ সীমাবদ্ধ তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেও কোন বিদ্যালয়ে যথেষ্ট ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের আশা নাই। তখন আমার সংকল্প সাধনের একমাত্র উপায় মনে করিয়া আমার সহকর্মী শিক্ষকগণকে আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদান প্রণালীর সহিত সুপরিচিত করিবার প্রয়াস পাই। এই উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে শিক্ষকগণের একটা সভা করিয়া উক্ত বিষয় আলোচনার ব্যবস্থা করি। প্রায় ১৫ বৎসর পর্যন্ত যে কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকরূপে কাজ করিয়াছিলাম সর্বত্রই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করি। আমার সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। বিহার প্রদেশে ভাবুয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকরূপে কাজ করার সময়ে আমার পুর্বোক্ত ব্যবস্থা দেখিয়া পাটনা বিভাগের

তদানীন্তন সুযোগ্য ইন্‌স্পেক্টার R. Mc Combe Esq. M. A., I. E. S. তাঁহার পরিদর্শনী মন্তব্যে ইহার উচ্চ প্রশংসা করেন ও আমাকে এই কাজে খুব উৎসাহ দেন।

আমার এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে মাতৃভাষায় একটা পুস্তক লিখিবার প্রয়োজনীয়তাও অন্তরের সহিত অনুভব করি, কিন্তু সুযোগ-সুবিধার অভাবে তখন তাহা কাজে পরিণত করিতে অসমর্থ হই। ইহার পর যখন হুগলী ট্রেনিং স্কুলের সহকারী প্রধান-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া উক্ত বিষয় শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করি, তখন মনে হইল যে, ভগবান্ আমার পূর্ব সঙ্কল্প সাধনের এই সুযোগ দিয়াছেন। ইং ১৯৩৭ সালে নর্মাল স্কুলসমূহের নূতন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী তথায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে তাহার উপযোগী আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে বাঙ্গলাভাষায় একটি পুস্তকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করি এবং সেই অভাব দূর করার কার্যে ব্রতী হই। তাহার ফলেই আজ এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।

এই পুস্তক প্রণয়নের জন্য গত সাত বৎসর ধরিয়া আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু পুস্তক পাঠ করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছি। কেহ এই তত্ত্ব-বহুল, জটিল বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা করিলে সেই পুস্তকগুলি পাঠ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা বলা প্রয়োজন যে, আমি কেবল সেই সকল গ্রন্থকারের লেখার অনুবাদ করি নাই। স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহাদের প্রস্তাবিত কার্যপ্রণালী বিচার করিয়া এই দেশের বিদ্যালয়ে অবলম্বনের পক্ষে যতটা উপযোগী ততটুকুই গ্রহণ করিয়াছি এবং এই দেশের ভিন্ন অবস্থায় তাহাদের ব্যবহারের জন্য যথাসম্ভব কার্যকরী পন্থা নির্দেশও করিয়াছি। এই বিষয়ে কতটা সফলকাম হইয়াছি, আমার সহকর্মী শিক্ষকগণই তাহার বিচার করিবেন। গ্রন্থখানির উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহারা কোন প্রস্তাব করিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। তবে আমি শিক্ষকগণের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছি বলিয়া কেহ কেহ আমাকে দোষ দিতে পারেন; আমি সেই দোষ বিনা

আপত্তিতে স্বীকার করিয়া লইতেছি। কেননা, আমার মত এই যে, শিক্ষক-মাত্রেরই একটু আদর্শবাদী হওয়া প্রয়োজন এবং উচ্চ আদর্শ সামনে রাখিয়া কর্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। এই স্থলে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, নর্মাল স্কুলের নূতন পাঠ্যসূচির অনুসরণ করিয়া এই পুস্তক লিখিলেও কেবল সেই পরীক্ষা পাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহা লিখিত হয় নাই। আমার যে সমস্ত সহকর্মী ট্রেনিং লাভের সুযোগ পান নাই, তাঁহারাও যাহাতে আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিয়া অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সহিত নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যও সম্মুখে রাখিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই পুস্তক পড়িয়া শিক্ষকগণ যদি অধিকতর যত্ন, দক্ষতা ও সফলতার সহিত তাঁহাদের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য করিবার জন্য কিছুমাত্র উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করেন, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

এই স্থলে পুস্তকের আলোচ্য বিষয় এবং আকার সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এবং বিদ্যালয় পরিচালনা ও শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি ভিন্ন পুস্তক লেখা হয়। উক্ত দুই বিষয় একই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে বলিয়া পুস্তকের আকার কিছু বড় হইয়াছে মনে হইতে পারে। দুইটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এক বিষয়ে জ্ঞানলাভ না করিলে অন্যটির জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না বলিয়াই উক্ত দুই বিষয় একই পুস্তকের অন্তর্গত করিয়াছি।

পরিশেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শিক্ষা-প্রেমিক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য এম. এ., পি. আর. এস., দর্শন-সাগর মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া আমার এই পুস্তকের শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান অংশ দেখিয়া দিয়া এবং প্রয়োজন মত সংশোধন করিয়া এই পুস্তক প্রকাশে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ও উৎসাহ দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকাল ঋণী থাকিব।

গ্রন্থকার

ঢাকা
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪০

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া যাওয়ার পর দেশের চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য প্রায় তিন বৎসর পর্যন্ত পুস্তকটি পুনঃ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ ও ট্রেনিং স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের আগ্রাহাতিশয্যে উৎসাহিত হইয়া ও বিদ্যোৎসাহী প্রাক্তন প্রকাশকের সাহায্য লাভ করিয়া এতদিন পরে পুস্তকটির ২য় সংস্করণ বাহির করিতে সমর্থ হইলাম।

এই সংস্করণে অনেক বিষয় পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়াছে এবং কয়েকটি নূতন বিষয় যোগ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, অবসর গ্রহণের পর নানা অভাব অসুবিধার মধ্যেও সুদীর্ঘ শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি হিসাবে পুস্তকটিকে যতটা আধুনিক ও উন্নত করা সম্ভব তাহার চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। প্রথম সংস্করণের ন্যায় ইহাও শিক্ষার্থী ও শিক্ষাভিজ্ঞগণের দ্বারা সমাদৃত হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

কলিকাতা
১০ জুলাই, ১৯৫১

গ্রন্থকার

শিক্ষা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালী

(The Science and Art of Education)

প্রাচীনকালে চিকিৎসা কার্যের ন্যায় শিক্ষাদান কার্যও একটা **হাতুড়ে বিদ্যাই** ছিল। **ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ কৌশল বা উপায় ব্যতীত শিক্ষাদানের আর কোন সুনির্দিষ্ট যুক্তিসঙ্গত কর্মপদ্ধতি ছিল না।** ইহা তখন কার্য-কারণ-সম্পর্ক-যুক্ত কোন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমাদের দেশে বর্তমান সময়েও অনেকে শিক্ষাকে একটা হাতুড়ে বিদ্যা বলিয়াই মনে করে। কিন্তু শিক্ষার ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে শিক্ষার আর সেদিন নাই। শিক্ষার উন্নতিসাধন ব্রতে ব্রতী শত শত মনীষীর জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দীনাহীনা ভিখারিণী শিক্ষা আজ অমূল্য রত্নাভরণ বিভূষিতা রাজরাণীর উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। খ্যাতনামা শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌গণের পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে শিক্ষাদানের অনেক সুনির্দিষ্ট যুক্তিসঙ্গত উপায় বা কার্যপদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। **মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষার**

সুচিন্তিত মূলনীতি নির্ধারিত হইয়াছে এবং শিক্ষা যুক্তিসঙ্গত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুধু তাহা নহে, বর্তমান সময়ে **শিক্ষা একটা উৎকৃষ্ট পরীক্ষা-মূলক বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে**। ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শত শত শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্ পরীক্ষা ও গবেষণার সাহায্যে শিক্ষার নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে এক বৃহৎ শিক্ষা-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে শিক্ষা এখন আর একটা হাতুড়ে বিদ্যা নহে, উহা **এখন একটা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানের সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে**। হাতুড়ে চিকিৎসকের অভাব না থাকিলেও বর্তমান চিকিৎসা-বিদ্যা যেমন বিজ্ঞান আখ্যা পাইতে পারে, বর্তমান শিক্ষাও নিশ্চয় সেই উচ্চ আসনের দাবী করিতে পারে।

তবে চিকিৎসা-বিদ্যা যেমন কেবল একটা বিজ্ঞান নহে, তাহার সুনির্দিষ্ট **প্রয়োগ-প্রণালী**ও (Art) আছে, সেইরূপ **শিক্ষাও কেবল একটা বিজ্ঞান নহে, ইহারও সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি আছে**। কারণ, একদিকে যেমন শিক্ষার যুক্তিসঙ্গত মূলনীতি নির্ধারিত হইয়াছে, অপরদিকে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া বহু সুচিন্তিত শিক্ষাদান-পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হইয়াছে। **সুতরাং, বর্তমান শিক্ষাকে একটা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান** (Science) **এবং কার্যপ্রণালী** (Art) **দুই-ই বলা যায়।**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষার অর্থ

শিক্ষাদান একটি অত্যন্ত জটিল কাজ। ইহার সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটা সংজ্ঞা প্রস্তুত করা খুব কঠিন। তাই ইহার নানা বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া **শিক্ষাবিদ্‌গণ ইহার নানা সংজ্ঞা দিয়াছেন।** কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোন সংজ্ঞা প্রস্তুত হয় নাই যাহার মধ্যে শিক্ষার সম্পূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যাইতে পারে। তথাপি শিক্ষার এই বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোচনা করিলে শিক্ষার নানা বিশেষত্ব ও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা জন্মিবে। তাই এস্থলে শিক্ষার কতকগুলি সংজ্ঞার আলোচনা করা যাইতেছে।

১। জ্ঞানদান বা জ্ঞানার্জন

পূর্বে জ্ঞানদান বা জ্ঞানার্জনকেই শিক্ষা বলা হইত। যে যত বেশী জ্ঞানার্জন করিত সে তত বেশী শিক্ষিত বলিয়া সমাজে পরিচিত হইত। **জ্ঞানের ভাণ্ডার** বা **বিদ্যার সাগর** হওয়াই উচ্চ শিক্ষিতের আদর্শ ছিল। বর্তমানকালেও সাধারণ লোকে শিক্ষা শব্দ জ্ঞানার্জন অর্থে ব্যবহার করে।

ইহা সত্য যে, জ্ঞানার্জন শিক্ষালাভের একটা প্রধান উপায় বা অঙ্গ। বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া কেহই শিক্ষিত বলিয়া দাবী করিতে পারে না। কিন্তু কেবল বহু বিষয়ের যথেষ্ট তথ্য বা খবর সংগ্রহ করিয়া মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিলেই একজনকে শিক্ষিত বলা যায় না। যেমন সমস্ত ধর্মশাস্ত্র মুখস্থ করিলেও একটা টিয়া পাখীকে ধার্মিক বলা যায় না, সেইরূপ 'জ্ঞানের ভাণ্ডার' হইলেই একজনকে শিক্ষিত বলা যায় না। **জ্ঞান শিক্ষকের হাতের যন্ত্র-স্বরূপ।** তাঁহার উদ্দেশ্য (শিশুর বিকাশ) সাধনের উপায় হিসাবেই ইহার মূল্য। জ্ঞানার্জনের ফলে যদি শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ না হয় এবং তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে জ্ঞানের কিছুমাত্র মূল্য নাই। সুতরাং **কেবল জ্ঞানার্জনই শিক্ষা নহে, শিক্ষালাভের একটা অপরিহার্য মূল্যবান উপায় মাত্র।**

২। **নানা বিষয়ে অনুরাগ সৃষ্টি** (Creation of many-sided interest)।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানার্জনকে শিক্ষা বলা না গেলেও উহা শিক্ষা-লাভের একটা প্রধান উপায় বা অঙ্গ। কিন্তু **জ্ঞান সীমাহীন**। পাঠ্য জীবনে ছাত্রকে সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানদান করা সম্ভবপর নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রও সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতে পারে না। বস্তুতঃ বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান পুরিয়া দিয়া শিশুর মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা বলা যায় না। তাহা না করিয়া যদি **শিশুর মনে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রবল অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে শিশু সে সকল বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হইবে** এবং আজীবন স্বীয় চেষ্টায় জ্ঞানার্জনে রত থাকিবে, এই কথা কেবল জ্ঞানার্জনের বেলায় প্রযোজ্য নহে। কোন প্রয়োজনীয় কার্যে দক্ষতা অর্জন সম্বন্ধেও ইহা সমানভাবে সত্য। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানদান বা বিভিন্ন কাজে দক্ষতাদান অপেক্ষা **বিভিন্ন বিষয়ে অনুরাগ সৃষ্টিকেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠতর কাজ** বলা যায়। কিন্তু ইহাও শিক্ষা নহে, জ্ঞানার্জনের ন্যায় ইহাও শিক্ষালাভের একটা উপায় বা অঙ্গমাত্র।

৩। **মানসিক শক্তির ব্যবহার বা অনুশীলন** (Discipline of intellect)।

কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত মানসিক শক্তির ব্যবহার বা অনুশীলনকেই শিক্ষা বলা হইত এবং **শিক্ষাগারগুলিতে প্রচুর মানসিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা হইত**। কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহার কিছু মাত্র বিচার করা হইত না। বিষয়টি কঠিন হইলে এবং তাহা শিক্ষাকালে প্রচুর মানসিক ব্যায়াম হইলেই যথেষ্ট মনে করা হইত। মনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া ধারণা ছিল এবং তাহাদের ব্যবহারের জন্যই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইত। বুদ্ধিবৃত্তিকে সুতীক্ষ্ণ করিবার জন্য **এক এক বিষয়কে মানসিক শাণ পাথর** বলিয়া বিবেচনা করা হইত। যথা,—সঠিক চিন্তা এবং বিচার-শক্তির ব্যায়ামের জন্য গণিত শিক্ষা দেওয়া হইত ; ভাববৃত্তির ও কল্পনা শক্তির বিকাশ

এবং সাহিত্য পাঠে রুচি সৃষ্টির জন্য লাটীন, গ্রীক, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য (classics) শিক্ষা দেওয়া হইত ; স্মৃতিশক্তির ও যুক্তিশক্তির ব্যায়ামের জন্য ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হইত। শুধু তাহা নহে, কতকগুলি বিশেষ বিষয় শিক্ষার ফলে মনের যে শক্তিবৃদ্ধি হয় তাহা যে কোন বিষয় শিক্ষা বা কাজে প্রয়োগ করা যাইতে পারে বলিয়া ধারণা ছিল। তাই অনেকে এক বা দুইটি বিষয় শিক্ষায় সমস্ত শিক্ষাজীবন ব্যয় করিত এবং অন্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যাইত।

ইহা সত্য যে, শারীরিক ব্যায়ামের দ্বারা যেমন শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, সেরূপ মানসিক শক্তিও ব্যবহার বা চর্চার ফলেই বিকশিত হয়। কিন্তু ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে, **আমরা কোন কাজ করিবার জন্য চিন্তা করি, চিন্তা করিবার জন্য কাজ করি না।** মানসিক শক্তির ব্যবহার বা চর্চার জন্যই কোন বিষয় শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষাদান কার্য অস্বাভাবিক ও নীরস হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া ইহাতে কোন কোন মানসিক বৃত্তির অত্যধিক ব্যবহার হইতে পারে এবং অন্য মানসিক বৃত্তিগুলি উপেক্ষিত হইতে পারে ও অবিকশিত থাকিয়া যাইতে পারে। সুতরাং তাহা না করিয়া **বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা দিলে শিক্ষাদান কার্য অধিকতর স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তির বিকাশ হয়।**

মনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া পূর্বে যে ধারণা ছিল, বর্তমানে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। এখন স্থির হইয়াছে যে, **মন বিভিন্ন বৃত্তিতে বিভক্ত নয়, সমস্ত বৃত্তিগুলি একই মনের বিভিন্ন কার্য।** সুতরাং মনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলির বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র কার্য ব্যবস্থা করা ঠিক নহে। **বিভিন্ন বিষয়গুলি ঠিক ভাবে শিক্ষা দিলে প্রায় সমস্ত মানসিক বৃত্তির ব্যবহার ও বিকাশ হইতে পারে।**

পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন এক বিষয়ের অত্যধিক চর্চা করিয়া যে মানসিক শক্তি লাভ করা যায় তাহা সকল বিষয় অধ্যয়ন বা সকল কাজে সাহায্য করে না। **কোন এক বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জন করিয়া তাহা অন্য বিষয়ে প্রয়োগ করা যায় না।** অন্য যে বিষয়ের সহিত তাহার

সাদৃশ্য আছে সেই বিষয় শিক্ষায় বা সেই কাজে সাদৃশ্যের অনুপাতে ব্যবহার করা যায় মাত্র। [১]

ইহা ছাড়া শারীরিক ব্যায়ামকে যেমন স্বাস্থ্যোন্নতি বলা যায় না, তাহার একটা উপায় মাত্র বলা যায়, সেইরূপ **মানসিক শক্তির ব্যবহারকেই শিক্ষা বলা যায় না, তাহার একটা উপায় মাত্র বলা যায়।**

৪। সু-অভ্যাস গঠন

দার্শনিক-প্রবর অধ্যাপক জেমস **সু-অভ্যাস গঠনকেই** শিক্ষা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ মানুষের জীবন কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র। অভ্যাসের প্রভাবেই আমাদের জীবন-ধারা বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন কার্যের শতকরা আশি ভাগ অভ্যাসের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। সুতরাং **বাল্যকালে যত বেশী সু-অভ্যাস গঠন করা যায়, ভবিষ্যৎ জীবন ততই সুন্দর এবং মহৎ হইবার সম্ভাবনা।** কিন্তু আমাদের জীবনের উপর অভ্যাসের প্রভাব খুব বেশী হইলেও **আমরা কেবল অভ্যাসের দাস হইতে পারি না।** তাহা হইলে আমরা নূতন কোন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব না। জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে চিন্তা ও বিচার করিয়া কাজ করিবারও যথেষ্ট সুযোগ এবং প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ আমরা ইচ্ছাপূর্বক চিন্তা ও বিচার করিয়া যে সকল কাজ করি তাহার ফলেই আমাদের চরিত্র গঠিত হয় এবং তাহার বিচার করিয়াই মানব সমাজে আমাদের স্থান নিরূপিত হয়। সুতরাং **সু-অভ্যাস গঠন শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ হইলেও কেবল তাহার দ্বারা শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না** এবং কেবল সু-অভ্যাস গঠনকেই শিক্ষা বলা যায় না।

৫। শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশ

বর্তমান সময়ে সাধারণতঃ **বিকাশ বা উন্নতি** সাধন অর্থেই শিক্ষা শব্দ ব্যবহৃত হয়। **মানবশিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির সর্বতোমুখী বিকাশ সাধনই তাহার প্রকৃত শিক্ষা।** খ্যাতনামা শিক্ষাবিৎ মনীষী Pestolozziই প্রথমে শিক্ষার এই সংজ্ঞা দেন। (অবশ্য রুশো ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন)। তাঁহার

১ J. Adams—Evolution of Educational Theory, P. 215-20. ।

মতে প্রকৃতি মানবশিশুর অন্তরে তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তির বীজ নিহিত রাখিয়াছে এবং আমরা কেবল তাহার বিকাশ সাধন করিতে পারি, তাহাকে বাহির হইতে কিছু দিতে পারি না। তাহার প্রকৃতির অনুকূল কার্যব্যবস্থা করিয়াই আমরা তাহার স্বাভাবিক শক্তিগুলির বিকাশের সুযোগ দিতে পারি ও সাহায্য করিতে পারি। একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষশিশুকে যেমন প্রয়োজনীয় আলো, বাতাস, জল ও সার দিয়া, যত্ন করিয়া প্রকাণ্ড পাদপে পরিণত হইতে সাহায্য করা যায়, সেইরূপ মানবশিশুকেও ঠিকভাবে লালন-পালন করিয়া ও তাহার প্রকৃতির অনুকূল কার্যে নিযুক্ত করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক শক্তিগুলির বিকাশের সাহায্য করা যায় এবং তাহাই তাহার প্রকৃত শিক্ষা।

মানবশিশু বলিতে তাহার **শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মা** এই চারিটির সমষ্টি বুঝায়। তাহার শরীরের বিকাশ সাধনই **শারীরিক শিক্ষা,** মনের বা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনই **মানসিক শিক্ষা,** হৃদয়ের বা সুকুমার ভাব বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন করিয়া সৎকার্যে প্রেরণা দেওয়াই **হৃদয়ের শিক্ষা বা নৈতিক শিক্ষা** এবং তাহার আত্মার উন্নতিসাধন বা ধর্মজ্ঞান বা ধর্মভাব বৃদ্ধি করাই **আধ্যাত্মিক শিক্ষা**। শিশুর শারীরিক বিকাশের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও ব্যায়ামের প্রয়োজন ; মানসিক বিকাশের জন্য মানসিক খাদ্য বা জ্ঞানলাভ ও মানসিক কাজের প্রয়োজন ; তাহার হৃদয়ের বিকাশের জন্য তাহার হৃদয়ের খাদ্য অর্থাৎ সুকুমার বৃত্তিগুলির ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তাহার হৃদয়ে ধর্মের বীজ রোপণ করা ও তাহার ধর্মাচরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন—এই সমস্ত বিভিন্ন উপায়ে **মানবশিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন** করিয়া তাহাকে **সম্পূর্ণ বা আদর্শ মানবে পরিণত করাই তাহার প্রকৃত শিক্ষা।**

৬। পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ (Regulation of the Environment)।

শিক্ষাবিদ্গণ পরিবেষ্টনী বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব নিয়ন্ত্রণকেও শিক্ষা বলিয়াছেন। কেননা, **পরিবেশ শিশুর মনের উপর যে ক্রিয়া করে**

এবং শিশুর মন তাহার যে প্রতিক্রিয়া করে এই উভয়েরই ফলে শিশুর বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় বা তাহার শিক্ষালাভ হয়। সুতরাং শিশুর বিকাশের সাহায্য করিতে হইলে বা তাহার বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, তাহার পরিবেষ্টনীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, পরিবেষ্টনী বলিতে কেবল **প্রাকৃতিক পরিবেশ** (Physical Environment) বুঝায় না। **সামাজিক এবং মানসিক পরিবেশও ইহার অন্তর্গত।** বরং শেষোক্ত দুইটিই তাহার মনের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহার মানসিক বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য প্রধানতঃ তাহার সামাজিক ও মানসিক পরিবেষ্টনীর নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়।

পরিবেষ্টনীর প্রভাবে শিশু যে শিক্ষালাভ করে তাহা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়,—**উদার অর্থ ও সংকীর্ণ অর্থ।**

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের উপর তাহার পরিবেশ যত প্রকার প্রভাব বিস্তার করে উদার অর্থে তাহাকেই শিক্ষা বলে। কারণ সেই সমস্ত প্রভাবই মানুষের বিকাশের সাহায্য করে। এই অর্থে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই মানব-শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার শিক্ষালাভকার্য চলিতে থাকে। তাই বলা হয় **সমস্ত সংসার মানবের শিক্ষায়তন এবং সমস্ত জীবনব্যাপী সে ছাত্র।** প্রাগৈতিহাসিক যুগে, মানুষের শিক্ষা-ব্যবস্থার পূর্বে, মানুষ কেবল এই স্বাভাবিক পরিবেশ প্রভাবে শিক্ষিত হইত। মানুষের চিন্তাপ্রসূত শিক্ষাব্যবস্থা হওয়ার পরও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই উদার অর্থে ব্যবহৃত শিক্ষা লাভ করিতেছে। কারণ, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, মানবশিশুকে তাহার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারি না।

মানব-শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশের জন্য কৃত্রিম পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া তাহার জীবনের উপর আমরা যে বিশেষ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করি, সংকীর্ণ অর্থে তাহাকেই শিক্ষা বলে। এক কথায় বলিতে গেলে, আমাদের স্কুল কলেজে যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় তাহা এই সংকীর্ণ অর্থে

ব্যবহৃত শিক্ষা। এই ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী হইতে সামাজিক এবং মানসিক পরিবেষ্টনীই অধিকতর নিয়ন্ত্রিত হয়। পুস্তক পড়িয়া বা শিক্ষকের উপদেশ শুনিয়া ছাত্র নানা বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করে, তাহাই তাহার মানসিক পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করে এবং আমরা ইহা আমাদের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। ইহা ছাড়া শিশুর উপর নানা কৃত্রিম, প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং তাহাদের প্রতি শিশুর প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া আমরা তাহার যথেষ্ট বিকাশ সাধন করিতে পারি। সুতরাং মানুষের সৃষ্ট এই কৃত্রিম পরিবেষ্টনীর প্রভাবও কম শক্তিশালী নহে।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উদার অর্থে ব্যবহৃত পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের কর্তৃত্বাধীন নহে। কিন্তু আমাদের স্কুল-কলেজে যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় তাহাকে আমরা ইচ্ছামত আকার দিতে পারি ও তাহার প্রভাব আমরা ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। সুতরাং আমাদের শিশুগণের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রধানতঃ এই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত শিক্ষার উপরই নির্ভর করিতে হয়।

৭। পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করা (Adaptation or Adjustment to Environment)

শিশুকে তাহার পরিবেষ্টনীর উপযোগী করাই শিক্ষার সর্বাপেক্ষা আধুনিক সংজ্ঞা বলা যায়। সাধ্যমত পরিবেষ্টনীর নিয়ন্ত্রণ করিয়া যেরূপ শিশুর বিকাশের সাহায্য করা প্রয়োজন, সেইরূপ তাহাকে তাহার অপরিবর্তনীয় পরিবেষ্টনী উপযোগী করিয়া দেওয়াও প্রয়োজন। কেননা, পরিবার বা বিদ্যালয়ের পরিবেষ্টনী নিয়ন্ত্রিত করা সাধ্যায়ত্ত হইলেও সামাজিক পরিবেষ্টনী নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নহে। অথচ শিশুকে সমাজে বাস করিতে হইবে এবং তাহার সদস্য হিসাবে নিজ কর্তব্য করিতে হইবে। সুতরাং, তাহাকে যদি তাহার সামাজিক পরিবেষ্টনীর উপযোগী করিয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে সে ডাঙ্গার মাছের মত বোধ করিবে, সমাজ-দেহের অঙ্গ হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না, এবং পদে পদে সমাজের সহিত সংঘর্ষের ফলে ক্ষত-বিক্ষত হইবে। বস্তুতঃ **পরিবেষ্টনীর নিয়ন্ত্রণ করিয়া শিশুকে বিকশিত করা এবং পুনঃ শিশুকে তাহার**

অপরিবর্তনীয় সামাজিক পরিবেষ্টনীর উপযোগী করা ও পরিশেষে শিশু ও তাহার পরিবেষ্টনীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করাই শিক্ষার প্রধান বা একমাত্র কাজ।

খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌গণ এইগুলি ছাড়া শিক্ষার আরও অনেকগুলি সংজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রায় সকল গুলিই পূর্বোক্ত সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাই এস্থলে তাহাদের স্বতন্ত্র আলোচনা করা হইল না। *

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষার অর্থ ও লক্ষ্যের পার্থক্য

পূর্বে বলা হইয়াছে যে শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশ-সাধনকে শিক্ষা বলে। যেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য শিশুর এই বিকাশ করা হয় তাহাকে শিক্ষার লক্ষ্য বলা যায়। অথবা, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে, কোন অভিজ্ঞতা

---

* শিক্ষার কতিপয় অতিরিক্ত সংজ্ঞা—The perfection of our nature; the unfoldment of the child; the development of self-activity; self-realisation; transmission of life from the living, through the living, to the living organisation of acquired habits of action such as will fit the individual to his physical and social environment; education is the production of useful changes in human beings, change in knowledge, in skill and in ideals.

References :—

1. T. Roymont—Principles of Education, Chapter 1
2. John Adams—The Evolution of Education Theory, Chapter 1
3. T. E. Bolton—Principles of Education.

লাভের সময়ে শিশু যে শারীরিক মানসিক কাজ করে তাহাকেই শিক্ষা বলে। যেই ফল লাভের জন্য সেই কাজ করে, অথবা সেই কাজের দ্বারা যে ফল লাভ হয় তাহাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলা যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, **শিশুর বিকাশের বা অভিজ্ঞতা লাভের কাজকে শিক্ষা বলে, তাহার ফলকে লক্ষ্য বলে।** সুতরাং শিক্ষার অর্থের ন্যায়, লক্ষ্যও অনেক হইতে পারে। এস্থলে শিক্ষার কতকগুলি লক্ষ্য ও তাহাদের তুলনামূলক মূল্য আলোচনা করা যাইতেছে।

১। **আধ্যাত্মিক উন্নতি।** প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দুগণ এবং মধ্যযুগে মুসলমান ও খৃষ্টানগণ তাহাদের জীবনে ধর্মকেই সর্বপ্রধান স্থান দিতেন। সুতরাং **আধ্যাত্মিক উন্নতিই** তাঁহাদের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল। **পুরোহিতই তাঁহাদের শিক্ষক ছিলেন, এবং ধর্ম-মন্দিরই তাঁহাদের শিক্ষায়তন ছিল।** কিন্তু কালপ্রভাবে বর্তমানে মানুষ ধর্মকে সাংসারিক জীবন হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। ফলে এখন প্রায় সকল দেশেই ধর্মের সহিত সম্পর্কশূন্য (Secular) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশ্য বর্তমানেও ভারতবর্ষ ও রাশিয়া ব্যতীত প্রায় সকল দেশে ধর্ম-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে ধর্ম-শিক্ষা স্থান পায় মাত্র, আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা হয় না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানবশিশু তাহার শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মা এই চারিটির সমন্বয়। সুতরাং তাহার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করিতে হইলে তাহার আত্মার উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রায় সমস্ত মানুষের মধ্যেই একটা স্বাভাবিক ধর্মভাব, স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টজীবের স্বাভাবিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আছে এবং মানুষের সকল প্রবৃত্তির মধ্যে এই ধর্মভাবকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হয়। তাই হিন্দুশাস্ত্রে বলিয়াছে যে, আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে মানুষ পশুর সমান, কেবল **ধর্মভাব আছে বলিয়াই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ।** সুতরাং এই সর্বোচ্চ প্রবৃত্তির বিকাশের ব্যবস্থা না করিলে মানব-শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। অতএব **আধ্যাত্মিক উন্নতিকে শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে এবং শিক্ষার**

প্রত্যেক স্তরে ধর্ম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে প্রাচীন কালের ন্যায় এখন আর আধ্যাত্মিক উন্নতিকে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলা যায় না। কেননা, সাধারণ সংসারী মানুষ এখন আর কেবল ধর্ম-চর্চা করিয়া জীবন কাটাইতে পারে না ; তাহাকে জীবন-সংগ্রামের জন্যও প্রস্তুত হইতে হয়।

২। **শক্ত দেহ ও দৃঢ় মন সৃষ্টি করা** (To produce sound mind in a sound body)।

গ্রীক্‌গণই শিশুর শক্ত দেহ ও দৃঢ় মন সৃষ্টি করাকে শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন। স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্থায় শরীর গঠনের উপর খুব জোর দেওয়া হইত। শারীরিক ব্যায়াম (Gymnastics) শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকাশ ও সৌন্দর্যজ্ঞান বৃদ্ধির উপরও অধিকতর জোর দেওয়া হইত। মোটের উপর শরীর ও মন ঠিক ভাবে গঠন করাই গ্রীক্ শিক্ষার প্রধান বিশেষত্ব ছিল। বস্তুতঃ, শরীর ও মন পুষ্ট না হইলে মানুষ কোন কাজেই সফলতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং শিশুর শরীর ও মনকে সবল ও কার্যক্ষম করা শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য বলা যায়। কিন্তু ইহা শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশের অংশমাত্র। **নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশও** ইহার সহিত যোগ না করিলে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইলেও তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাহাকে **পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী** করা এবং **জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তুত** করাও শিক্ষার কার্য।

৩। **জ্ঞানলাভের আনন্দ উপভোগ এবং উৎকৃষ্ট মার্জিত রুচি ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা** (Aesthetic aim)।

কেহ কেহ বলেন, শিক্ষার কোন নীচ সংকীর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। **জ্ঞানলাভের আনন্দ উপভোগই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।** জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন, অন্য কোন নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নহে। জ্ঞানার্জনের ফলেই মানুষের রুচি ও আচার-ব্যবহার উন্নত হয় এবং তাহার দ্বারাই উন্নত ও সুসভ্য মানুষ এবং অনুন্নত ও অসভ্য মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। সর্বপ্রথমে সম্ভবতঃ গ্রীক্‌গণই শিক্ষার এই মহৎ লক্ষ্যের

ধারণা করেন। এরিস্টটলের (Aristotle) মতে উন্নত জীবন যাপনের জন্য তৈয়ার করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য প্রাচীন ভারতের হিন্দুগণও জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হইতেন এবং **কাব্যামৃতরসাস্বাদকে মানব জীবনে উচ্চ স্থান দিতেন**। ইহা সত্য যে, কিছুমাত্র শিক্ষালাভ না করিয়াও মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য জীব-জন্তুর ন্যায় জীবিকার্জন ও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইত। (অনেক অসভ্য জাতি বর্তমানে কার্যতঃ তাহাই করিতেছে) কিন্তু শিক্ষা ব্যতীত তাহাদের রুচি-প্রবৃত্তি, আচার-ব্যবহার অমার্জিত ও নিকৃষ্ট থাকিয়া যাইত এবং অন্য জীব-জন্তুর সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য থাকিত না, মানব-সমাজে সভ্যতার বিস্তার হইত না এবং মানুষ আজ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া দাবী করিতে পারিত না। সুতরাং মানুষের রুচি-প্রবৃত্তি, আচার-ব্যবহার উন্নত করা এবং তাহাকে উন্নত জীবন যাপনের জন্য তৈয়ার করাও শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহাও শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারে না। কেবল উৎকৃষ্ট রুচি ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিয়াই মানুষ জীবন যাপন করিতে পারে না। তাহাকে সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য, বিশেষভাবে জীবিকার্জনের জন্যও প্রস্তুত হইতে হয়।

৪। জীবন-সংগ্রাম বা জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তুত করা

ছাত্রগণকে জীবন-সংগ্রামের বা জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তুত করাও শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য। কেহ কেহ ইহাকে **রুটি-মাখন লক্ষ্য** (Bread and butter aim) বলিয়া শ্লেষ করেন এবং শিক্ষার এরূপ নিকৃষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষ ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলিয়া যতই গর্ব করুক না কেন, সে-ও শরীরের দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারে না। তাহাকেও সর্বাগ্রে উদর পূরণের ব্যবস্থা করিতে হয়। অধিকন্তু বর্তমানে উন্নত কিন্তু কৃত্রিম জীবন যাপনের ফলে তাহার অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সে এখন আর তরুতলে শয়ন, তরুবল্কলে দেহ আচ্ছাদন এবং স্বচ্ছন্দ বনজাত উদ্ভিদে ক্ষুন্নিবারণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে

পারে না ; অপর দিকে বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক সভ্যতার প্রভাবে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং মানুষকে সর্বাগ্রে জীবিকার্জনের জন্য কোন সদুপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমে ইহা না করিয়া তাহার পক্ষে ধর্মচর্চা, জ্ঞানের আনন্দ উপভোগ প্রভৃতি কোন মহৎ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ অভাবগ্রস্ত লোকের হৃদয়ে কোন মহৎ ভাব স্থান পায় না। এমন কোন কুকর্ম নাই যাহা সে অভাবের তাড়নায় করিতে না পারে। তাই **ছাত্রকে জীবিকার্জনের জন্য তৈয়ার করাও শিক্ষার একটা প্রধান ও একান্ত প্রয়োজনীয়** লক্ষ্য বলিয়া এখন সকল দেশে স্বীকৃত হইয়াছে, **কোন না কোন ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া** শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ ছাত্রকে কোন ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত করা এখন সমস্ত শিক্ষার অপরিহার্য শেষ কার্য (Sine Qua Non) বলিয়া মনে করা হয়।

কিন্তু জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তুত করাকেও শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলা যায় না। কেননা **মানুষ কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া এবং আরামে জীবন কাটাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না**। তাহা করিলে মানুষ ইতর জন্তু অপেক্ষা উচ্চস্থান দাবী করিতে পারিত না। তাহার জীবনে ইহার অতিরিক্ত উচ্চতর লক্ষ্যও থাকা প্রয়োজন। মানব জীবনের সার্থকতা রক্ষা করিতে হইলে **তাহাকে আরও উচ্চতর, মহত্তর জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে**।

৫। **উপযুক্ত ও কর্তব্য-পরায়ণ নাগরিক প্রস্তুত করা**। প্রাচীনকালে গ্রীস ও ইতালীর নগর-রাজ্য (City State) সমূহে উপযুক্ত ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক সৃষ্টি করা শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশসমূহে ইহাকে শিক্ষার সর্বপ্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করা হয়।

মানুষ আদিমকাল হইতেই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে এবং সামাজিক জন্তু নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে প্রত্যেক মানুষকে সমাজের ব্যবস্থা ও নিয়মকানুন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয়

৭। **চরিত্র-গঠন**ঃ বর্তমান সময়ে চরিত্র-গঠনই শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম বা একমাত্র লক্ষ্য বলা হয়। রেমণ্ট (Raymont) সুন্দর ভাষায় বলিয়াছেন, **"ছাত্রকে মাংসপেশীর সম্পদ দান, তাহার জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধন বা তাহার সুকুমার ভাব-বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন শিক্ষকের চরম বা সর্বপ্রধান লক্ষ্য নহে, ছাত্রের চরিত্র-বল বৃদ্ধি এবং তাহার নির্মল চরিত্র গঠনই শিক্ষকের চরম লক্ষ্য।"** ("The teacher's ultimate concern is to cultivate nor wealth of muscles, nor fulness of knowledge nor refinement of feelings, but strength and purityof character.")

শিক্ষার এই উচ্চ ও মহৎ লক্ষ্যের গুরুত্ব বা যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে চরিত্র বলিতে কি বুঝায় তাহাই প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন। অনেকে মনে করে যে চরিত্র বলিতে কেবল সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত **নৈতিক-চরিত্র** বুঝায়। সেই অর্থে চরিত্র কেবল কতকগুলি নিষেধাত্মক নির্দেশের বা বাধানিষেধের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়। তাই তাহারা বলে যে কেবল শুষ্ক নীতিপরায়ণ হইয়া সংসারে চলা যায় না। কিন্তু চরিত্র বলিতে কেবল সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত নৈতিক চরিত্র বুঝায় না। **কাহারও চরিত্র বলিতে তাহার সমস্ত কাজ বা ব্যবহারের সমষ্টি বুঝায়** (Character is the sum-total of conduct) **এবং ব্যবহার বলিতে ইচ্ছাকৃত কাজের সহিত সম্পর্কযুক্ত সমস্ত জীবনকে বুঝায়** (Conduct is the whole of life so far as life involves deliberate actions)।

সুতরাং ছাত্রের চরিত্র গঠন করিতে হইলে তাহাকে তাহার ইচ্ছাকৃত সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিতে হইবে। অর্থাৎ **নিজে ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া সততা ও দক্ষতার সহিত সমস্ত কাজ বা কর্তব্য করিবার জন্য ছাত্রকে প্রস্তুত করাই তাহার চরিত্র গঠন।**

ইহা সহজেই দেখা যাইবে যে নৈতিক চরিত্রও এই উদার অর্থে ব্যবহৃত চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কারণ যে ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া সততা ও দক্ষতার সহিত কর্তব্য করিতে পারে সে দুর্নীতিপরায়ণ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া শিক্ষার এই উদার লক্ষ্যের মধ্যে পূর্ববর্ণিত সমস্ত লক্ষ্যগুলি স্থান

পাইয়াছে। কি জ্ঞানার্জন, কি আধ্যাত্মিক উন্নতি, কি সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, কি মার্জিত রুচি ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা, সমস্তই শিশুর ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে ও তাহাকে বিচার করিয়া সততা ও দক্ষতার সহিত কর্তব্য করিবার শক্তিদান করে বলিয়াই ইহাদিগকে শিক্ষার প্রধান প্রধান লক্ষ্য বলা যায়। অপর দিকে, ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া সততা ও দক্ষতার সহিত কর্তব্য করিবার শক্তিলাভ করিলে, সে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে, নাগরিক কর্তব্য করিতে পারিবে এবং সুন্দর ও মহৎ জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং **চরিত্র-গঠনই শিক্ষার চরম বা শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য**; অন্যান্য লক্ষ্যগুলি আংশিক বা আনুষঙ্গিক লক্ষ্যমাত্র, সম্পূর্ণ বা চরম লক্ষ্য নহে। (দ্বিতীয় ভাগে নৈতিক শিক্ষার অধ্যায়ে এই বিষয় আরও সবিস্তারে আলোচিত হইবে)।

৮। **আদর্শ মানুষ তৈয়ার করা** (Perfection of man): আদর্শ মানুষ তৈয়ার করাই শিক্ষার চরম এবং সম্পূর্ণ লক্ষ্য বলা যায়, কারণ ইহাই পূর্ববর্ণিত লক্ষ্যগুলি সাধনের স্বাভাবিক ফল। আদর্শ মানুষ হইতে হইলে শিশুকে সুস্থ, সবল ও উদ্যমশীল হইতে হইবে। তাহাকে চিন্তাশীল, বিচার-পরায়ণ ও ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন হইতে হইবে, যেন সে যে-কোন অবস্থায় বিচক্ষণতার সহিত বিচার করিয়া নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারে এবং দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত তাহা সম্পাদন করিতে পারে। তাহার নীচ প্রবৃত্তিগুলি সংযত ও সুকুমার ভাববৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ হইতে হইবে। তাহা হইলেই সে কেবল নিজ স্বার্থ-সিদ্ধি বা সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না, উন্নত ও মহৎ জীবন যাপন করিতে শিখিবে এবং দেশের ও সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইবে। সর্বোপরি তাহাকে ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপরায়ণ হইতে হইবে। সে সুখদুঃখে অবিচলিত থাকিবে, বিপদে ভীত হইবে না, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনে সফলতা অর্জন করিতে পারিবে।

৯। **জাতি গঠন ও জাতীয় উন্নতি**:

এই পর্যন্ত শিক্ষার কেবল ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলিই আলোচিত হইয়াছে। এই গুলি ছাড়া শিক্ষার স্বতন্ত্র জাতীয় লক্ষ্যও থাকা প্রয়োজন। **জাতিগঠন ও**

জাতীয় উন্নতিই শিক্ষার একমাত্র জাতীয় লক্ষ্য। কোন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সময় যেমন ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, সেইরূপ জাতীয় লক্ষ্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়। কেননা, জাতি ব্যক্তিরই সমষ্টি হইলেও **জাতির স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর প্রয়োজন বা অভাব আছে। তাহাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা না করিলে কেবল যে জাতির উন্নতি হয় না তাহা নহে, ব্যক্তিরও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না এবং** সে তাহার নিজ শক্তির সদ্ব্যবহারের সুযোগ ও ক্ষেত্র পায় না। ইহা ছাড়া এমন অনেক কাজ আছে যাহা ব্যক্তিগত চেষ্টায় সম্পন্ন করা যায় না, জাতি হিসাবে সংঘবদ্ধ চেষ্টায় সম্পন্ন করিতে হয়। শিক্ষাই আমাদিগকে সেই সংঘবদ্ধ কাজের জন্য প্রস্তুত করিতে পারে।

শিক্ষা যে কেবল ব্যক্তিরূপ ইটগুলিকে তাহার আগুনে পুড়াইয়া কঠিন ও কার্যোপযোগী করে তাহা নহে, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত স্থানে সাজাইয়া বৃহৎ জাতীয় প্রাসাদও তৈয়ার করে। আজ যে ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিসমূহ সভ্যতা ও সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছে, একমাত্র তাহাদের জাতীয় শিক্ষার সাহায্যেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রথমতঃ জাতীয় আদর্শগুলির উপর ভিত্তি করিয়া জাতির জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ জাতির প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যক্তিগুলিকে তাহাদের প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া তৈয়ার করিতে হয়। **ব্যক্তির বিকাশ ও জাতির প্রয়োজন এই উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষাব্যবস্থা করিলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ, সবল, শক্তিশালী ও সম্পদ্‌শালী জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে।**

১০। স্তরভেদে শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

ব্যক্তি ও জাতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষার যেমন ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিতে হয়, সেইরূপ **বিভিন্ন স্তরের শিক্ষারও সুনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন।** বিভিন্ন স্তরের ছাত্রগণের প্রকৃতি, শক্তি ও অভাব এক নহে; সুতরাং তাহাদের শিক্ষার লক্ষ্যও এক হইতে পারে না।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ঃ দেশের অধিবাসীবৃন্দের নিরক্ষরতা দূর করাই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য। বর্তমান সভ্যতার যুগে **নিরক্ষরতা মহাপাপ** বলিতে হইবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ-লিখিত অগণিত পুস্তক-রাজির মধ্যে যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার নিহিত আছে, তাহা যাহার নিকট উন্মুক্ত নহে সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির। নিরক্ষরতা দূর করিয়াই আমরা তাহাদের এই অন্ধতা দূর করিতে পারি। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ বা উচ্চশিক্ষা লাভের শক্তি ও সুযোগ সকলের নাই। কিন্তু অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ সকলকে দেওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে পরে জীবিকার্জনের জন্য যে-কোন ব্যবসায় অবলম্বন করুক না কেন, অবসর সময়ে পুস্তক পাঠ করিয়া সকলেই যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করিতে পারে। কিন্তু **কেবল লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দিয়াই পাঠ্য-জীবন শেষ করিলে জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর হইবে না**। কারণ দেখা গিয়াছে যে, চর্চার অভাবে অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা লেখাপড়া ভুলিয়া গিয়া পুনঃ নিরক্ষরে পরিণত হয়। কার্যকরী ভাবে নিরক্ষরতা দূর করিতে হইলে **লেখাপড়ার অভ্যাস দৃঢ়রূপে গঠিত হওয়ার পূর্বে শিশুর শিক্ষা শেষ করা যাইবে না**। সে যাহাতে মাতৃভাষার সাহায্যে প্রায় সকল বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং মাতৃভাষার মধ্য দিয়া নিজের মনের ভাব পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করিতে পারে সেই পরিমাণ শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে। তাহা হইলেই সে পাঠ্য জীবনের পরেও অবসর সময়ে জ্ঞানার্জনে রত হইতে পারে। **অন্ততঃ ছয় বৎসর কাল নিয়মিত শিক্ষা না পাইলে শিশুর লেখাপড়ার অভ্যাস দৃঢ়ভাবে গঠিত হয় না,** মাতৃভাষার উপর তাহার প্রয়োজনীয় অধিকার লাভ হয় না এবং পরে অবসর সময়ে জ্ঞানার্জনে রত হইবার প্রবৃত্তি জন্মে না। ইহা ছাড়া প্রাথমিক স্তরে ছাত্রগণকে দৈনন্দিন জীবনের এবং সাধারণ কাজ-কারবারের হিসাব করিবার জন্যও প্রস্তুত করিতে হইবে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়মগুলির সহিত সুপরিচিত করিয়া তাহাদিগকে শরীর সুস্থ সবল রাখিতে শিক্ষা দিতে হইবে। এই স্তরের শেষের দিকে ছাত্রগণকে সাধারণ নাগরিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্যও প্রস্তুত করিতে হইবে। এই স্তরে যাহাদের শিক্ষা শেষ

হইতে তাহাদিগকে কোন শ্রমশিল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জনের জন্যও প্রস্তুত করিতে হইবে। সর্বশেষ এই স্তরের কোমলমতি ছাত্রগণের হৃদয়ে ধর্মের বীজ বপন করিতে হইবে, যেন ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারা নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় এবং সৎজীবন যাপন করে।

মধ্য স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

সাধারণতঃ ১৩ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় তাহাকেই মধ্যস্তরের শিক্ষা বলা হয়। আমাদের দেশের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির কেবল উপরের চারি শ্রেণীর শিক্ষাকেই মধ্যস্তরের শিক্ষা বলা যায় (মধ্য বাঙ্গলা পর্যন্ত প্রকৃত পক্ষে প্রাথমিক স্তরের অন্তর্গত)।

মধ্যস্তরের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছাত্রের স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তি নিরূপণ করা। যাহারা উচ্চশিক্ষালাভের উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের জন্য প্রস্তুত করা; যাহারা উচ্চশিক্ষালাভের উপযুক্ত নহে, তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রমশিল্প ও সাধারণ ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত করা।

১২ বৎসরের পূর্বে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না এবং তাহারা নিজে বিচার করিয়া কাজ করিতে পারে না। কিন্তু ইহার পর ছাত্রগণ কেবল অন্যের আজ্ঞা পালন করিয়া কাজ করে না, নিজেও বিচার করিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করে। বিশেষতঃ এই বয়সে তাহাদের পছন্দ-অপছন্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং তাহারা নিজের পছন্দমত কাজ করিতে ভালবাসে। সুতরাং এই বয়সে ছাত্রের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ও মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং কাহারা উচ্চশিক্ষালাভের উপযুক্ত ও কাহারা অনুপযুক্ত তাহা নির্ধারণ করা সহজ হয়। এই স্তরের প্রথম দুই বৎসরের শিক্ষা শেষ করার পরই ছাত্রগণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যাহারা উচ্চশিক্ষালাভের উপযুক্ত তাহাদিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য এবং যাহারা উচ্চশিক্ষালাভের উপযুক্ত নহে তাহাদিগকে বিভিন্ন শিল্প ও সাধারণ ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত করা কর্তব্য।[১]

১ The idea is fully developed in the author's article on Vocational Education published in the Teachers' Journal for August 1937.

অবশ্য সাধারণ বিদ্যালয়ে কোন ব্যবসায় ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসায়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত কাজ শিক্ষা দিয়া সেই সকল ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য প্রবৃত্তি জাগান যায়। **প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বিভিন্ন শ্রম-শিল্পের জন্য বুদ্ধিমান্ শ্রমিক সরবরাহ করিতে পারে। দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের এক অংশ তাহাদের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর নিপুণ শিল্পী তৈয়ার হইতে পারে।** আর এক অংশ উচ্চশিক্ষালাভের জন্য তৈয়ার হইতে পারে।

উচ্চস্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত নেতা সৃষ্টি করাই উচ্চস্তরের শিক্ষার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। উন্নতির পথে জাতির দ্রুত অভিযানের সাহায্য করিতে হইলে, জাতীয় জীবন সুপরিচালিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতা না থাকিলে জাতীয় জীবন সুপরিচালিত হওয়া সম্ভব নহে। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে, অনেক দেশভক্ত মহাপুরুষের প্রাণপণ চেষ্টায়ও জাতি যে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে না, জাতির জীবনস্রোত মধ্যে মধ্যে উন্মার্গগামী হইয়া যে জাতীয় সঙ্কটের সৃষ্টি করিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ **জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতার অভাব**। উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই জাতির এই অভাব পূরণ করিতে পারে। কি শিল্প-বাণিজ্যে, কি বিভিন্ন শিক্ষিত লোকের ব্যবসায়ে (learned professions), কি সমাজ-পরিচালনায়, কি দেশ-শাসন কার্যে, কি ধর্ম-ব্যবস্থায়, জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতা সরবরাহ করাই উচ্চশিক্ষার কাজ বা লক্ষ্য।

References :

1. J. Adams—The Evolution of Educational Theory. Chapter I.
2. H. Spencer—Education.
3. Bertrand Russell—On Education. Chapter II
4. Dr. W. Jenkins' article—Progress of Education in India.
5. J. Raymont—Modern Education, Chapter II.

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষকের পক্ষে মনোবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা ঃ

শিক্ষাদানের জন্য **শিক্ষককে বিষয় ও শিশু উভয়েরই জ্ঞান লাভ করিতে হয়,** বরং বিষয়ের জ্ঞান হইতেও শিশুর জ্ঞান তাঁহার পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয়। কারণ পুস্তক হইতে সহজে বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু শিশু সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া কি আকারে ও পদ্ধতিতে সেই জ্ঞান দান করিলে শিশু তাহা সহজে গ্রহণ করিতে পারে ও তাহার বিকাশের সাহায্য হইতে পারে তাহা ঠিক করা যায় না। **একমাত্র মনোবিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা শিশু সম্বন্ধে এই অতি-প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারি।** ইহার সাহায্যেই আমরা শিশুর সহজাত শক্তি, তাহার বিকাশের নিয়ম, তাহার মনের জটিল কার্য-পদ্ধতি শিশুর উপর পরিবেশের প্রভাব ও তাহার মনের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে মূল্যবান্ জ্ঞানলাভ করিতে পারি। শিশু কিভাবে চিন্তা করে, কিভাবে সুখদুঃখ বোধ করে, কোন কোন বিশেষভাবে ব্যবহার করে, কি আকারে শিক্ষা দেওয়া হইলে শিশু তাহা সহজে গ্রহণ করিতে পারে, একমাত্র মনোবিজ্ঞানই তাহা বলিতে পারে। সুতরাং **শিশুর সহজাত শক্তি, প্রকৃতি ও তাহার স্বাভাবিক বিকাশের সহিত মিল রাখিয়া তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইলে আমাদিগকে মনোবিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত হইতে হইবে।**

অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা মনোবিজ্ঞানের কাজ নহে। কিন্তু **শিক্ষার দ্বারা কি কি লক্ষ্য সাধিত হইতে পারে এবং কি উপায়ে সেই লক্ষ্যগুলি কাজে পরিণত করা যায় মনোবিজ্ঞানই তাহা বলিতে পারে।** সুতরাং শিশুর শিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শরীরতত্ত্ব (Physiology) ও রোগতত্ত্ব (Pathology) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যেমন কোন চিকিৎসক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রোগের চিকিৎসা করিতে পারেন না, সেইরূপ মনোবিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত না হইয়া কোন শিক্ষক শিশুর প্রকৃতি ও স্বাভাবিক বিকাশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষাদান করিতে পারেন না। সুতরাং অন্ধ পরীক্ষার (blind experiments) আশ্রয় না লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষকমাত্রেরই মনোবিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন ও বর্তমান ধারণা :

প্রাচীনকালে মন ও আত্মা এক বলিয়া ধারণা ছিল এবং **আত্মার জ্ঞানকেই মনোবিজ্ঞান বলা হইত**। পরে **মধ্যযুগে** মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ আত্মা ও মনের মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া বুঝিতে পারেন। তখন **চেতনার জ্ঞানকেই মনোবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া হয়।** অর্থাৎ সচেতন বা জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মন যে কাজ করে তাহার জ্ঞানই মনোবিজ্ঞান। কেবল **আত্ম-পরীক্ষার** (introspection) সাহায্যেই চেতনা সম্বন্ধে এই জ্ঞান লাভ করা যাইত। অর্থাৎ সচেতন বা জাগ্রত অবস্থায় কোন অভিজ্ঞতা লাভের বা তাহার প্রতিক্রিয়া করার সময়ে আমাদের মন যে কাজ করে তাহা চিন্তা করিয়া বা স্মরণ করিয়াই আমরা সে অবস্থায় অন্যের মনের কাজ সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করিতে পারি। সুতরাং প্রাচীন মনোবিজ্ঞান সম্পূর্ণ কর্তার আত্ম-মূলক (subjective) ছিল।

বর্তমান সময়ে মানুষের ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানকেই মনোবিজ্ঞান বলে। কেননা, কাহারও কাজ বা ব্যবহার দেখিয়া আমরা তাহার মনের অবস্থা বা কাজ সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করিতে পারি। সুতরাং ইহা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-মূলক (observational and experimental); কারণ অনেক লোকের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া এই জ্ঞানলাভ করিতে হয়। অপর দিকে **অন্যের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়াই এই জ্ঞান লাভ করা যায় বলিয়া বর্তমান মনোবিজ্ঞানকে বিষয়-মূলক** (objective) **বলিতে হইবে।** তবে নিজের অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া দেখিয়াই আমরা অন্যের ব্যবহার

ঠিক ভাবে বুঝিতে পারি। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে এখনও **আত্মপরীক্ষার** (introspection) **প্রয়োজনীয়তা আছে**।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। ইহা বিশুদ্ধ বা সাধারণ (General) মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগমাত্র (Applied Psychology)। মনোবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলিকে বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে বা শিশুর শিক্ষা বিধানে প্রয়োগ করা হইলেই তাহাকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বলা যায়। শিক্ষার্থীর প্রকৃতি এবং ব্যবহারই ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। শিক্ষার্থিগণ প্রকৃতিদত্ত ও বংশগতিতে কি শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বাহিরের প্রভাব কিরূপে তাহাদের মনের উপর কাজ করে, এবং তাহাদের মন বাহিরের প্রভাবের প্রতি কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে, কিরূপে তাহারা শিক্ষা করে এবং কিরূপে তাহাদের বিকাশ হয় ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

শিশু-মনোবিজ্ঞান। নিম্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণ সকলেই শিশু, এবং তাহাদিগকে ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহাদিগেরই ব্যবহার অধ্যয়ন করিতে হয়। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, **শিশু কেবল এক-জন ক্ষুদ্র মনুষ্য নহে**। তাহার চিন্তাধারা, ভাবধারা এবং ব্যবহার বা বাহিরের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া বয়স্ক লোকের চিন্তা, ভাব এবং ব্যবহার হইতে ভিন্ন। **শিশুর ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানকেই শিশু-মনোবিজ্ঞান বলে**। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও শিশু-মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটি সকল স্তরের শিক্ষার্থিগণের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করে, দ্বিতীয়টি কেবল শিশু-শিক্ষার্থিগণের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করে।

References :

1. P. Sandeford—Educational Psychology. Introduction.
2. J. Ross—Ground-work of Psychology. Chapter I.
3. O. B. Douglas and B. F. Holland—Fundamentals of Educatiocal Psychology. Chapter I.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বংশগতি ও পরিবেশ

(Heredity and Environment)

বংশগতি ঃ শিশু জন্মের সময় তাহার মাতাপিতার নিকট হইতে যে শারীরিক মানসিক শক্তির বীজ বা বিশেষত্বগুলি প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহার বংশগতি। এই জন্যেই মেধাবী লোকের ছেলেমেয়ে সাধারণতঃ মেধাবী হয় এবং ক্ষীণ-মেধা লোকের ছেলেমেয়ে সাধারণতঃ ক্ষীণ-মেধা হয়।

বংশগতির প্রমাণ ঃ

(১) সচরাচর দেখা যায় যে, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে এবং ভ্রাতাভগ্নীগণের মধ্যে যথেষ্ট শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য থাকে। এমন কি তাহাদের চিন্তাশক্তি, ভাবধারা, কর্মশক্তি এবং কর্মপ্রবৃত্তির মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য থাকে। দুই ভাই বা ভাই-ভগ্নী ঠিক একরূপ না হইলেও তাহাদের মধ্যে যতটা সাদৃশ্য আছে, পৃথিবীর অন্য কোন লোকের সহিত তাহাদের ততটা বা তাহার কাছাকাছি সাদৃশ্যও নাই।

পিতামাতা ও সন্তানগণের মধ্যে বা ভাই-ভগ্নীর মধ্যে এই সাদৃশ্যের একমাত্র কারণ বংশগতি। অর্থাৎ সন্তানগণ পিতামাতার নিকট হইতে কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক বিশেষত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করে বলিয়াই তাহাদের মধ্যে এই সাদৃশ্য দেখা যায়।

(২) অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে এক ক্ষীণ-মেধা দম্পতির ১২০০ বংশধরের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন ক্ষীণ-মেধা হইয়াছিল। অপর দিকে একজন প্রতিভাবান লোকের প্রায় ১৪০০ বংশধরের মধ্যে অধিকাংশই নানা কাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। অনুসন্ধানের ফলে ইহাও জানা গিয়াছে যে, **সন্তান পিতামাতার সম্মিলিত দোষগুণেরই অধিকারী হয়।** একজন ধীসম্পন্ন পুরুষ ও একজন ক্ষীণমেধা স্ত্রীর বংশধরগণের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষীণমেধা হইয়াছিল। সেই পুরুষই পরে একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রী বিবাহ করিলে তাহাদের বংশধরগণ ধীসম্পন্ন হয়। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে

যে **শিশু তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তি বা বিশেষত্বগুলি তাহার পিতামাতার নিকট হইতে বংশগতির ফলে প্রাপ্ত হয়।**

বংশগতির কারণ :

পুরুষের বীজকোষ (Spermatoza) ও স্ত্রীর **ডিম্বকোষ** (Egg-cell or ovum) **মিলিত হইয়াই ভ্রূণের সৃষ্টি হয়।** সুতরাং এই বীজকোষ ও ডিম্বকোষে যে-সকল শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে সেগুলি মিলিত ও বিকশিত হইয়াই একটা নূতন মানুষে পরিণত হয়। এইরূপেই সন্তান পিতামাতার নিকট হইতে তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলি লাভ করে। কাহারও কাহারও মতে **মানবদেহে এই সন্তানোৎপাদক কোষগুলি** (Germ-plasm) **স্বতন্ত্র থাকে,** তাহারা শরীর-পোষণ কার্যে কোন অংশ গ্রহণ করে না। **সকলে সেই কোষগুলি বংশপরম্পরাক্রমেই লাভ করে।** পিতা তাহাদের বাহকমাত্র, উৎপাদক নহে। পিতার যে বীজকোষ হইতে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তিনি সেই বীজকোষ পূর্ব-পুরুষ হইতে পাইয়াছেন। **তাই বলা যায় যে শিশু পিতার সমবয়সী** (Germ-plasm theory)।

বংশগতি নিবারণের উপায় :

(১) খুব অল্প বয়সে শিশুর যে-সকল শারীরিক ও মানসিক বিশেষত্ব দেখা যায় সেইগুলি তাহার বংশগতিরই ফল মনে করিতে হইবে। কেননা তখনও পরিবেশ তাহার উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

(২) বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে বাস করিলেও একই পিতামাতার সন্তান-গণের মধ্যে যে সকল সাধারণ বিশেষত্ব দেখা যায় সেইগুলি তাহারা তাহাদের বংশগতির ফলেই লাভ করিয়াছে।

(৩) অনেক পুরুষ (Generations) পর্যন্ত কোন দম্পতির বংশধরগণের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহাদের বংশগতির বিশেষত্বগুলি ধরা পড়িবে।

বংশগতির নিয়ম :—

(১) গ্যাল্টনের (Galton) মতে সন্তান তাহার স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলির অর্ধেক তাহার পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হয়, $\frac{1}{4}$ ভাগ অংশ

পিতামহ-পিতামহী ও মাতামহ-মাতামহী হইতে প্রাপ্ত হয়, এক-অষ্টমাংশ প্রপিতামহ-প্রপিতামহী ও প্রমাতামহ-প্রমাতামহী হইতে প্রাপ্ত হয়, এইরূপ **জ্যামিতিক অনুপাতে** (Geometrical ratio) **শিশু পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলি লাভ করে।** সময় সময় দেখা যায় যে শিশু তাহার পিতামাতার মত না হইয়া পূর্বপুরুষদের কাহারও অনুরূপ হয়। ইহার দ্বারাও উপরি-উক্ত মত সমর্থিত হয়।

(২) ইহাও দেখা যায় যে একই পিতামাতার সন্তান-সন্ততিগণের শারীরিক মানসিক শক্তি ও প্রকৃতি ঠিক এক নহে। ইহার কারণ **পিতামাতার বীজকোষ ও ডিম্বকোষের মধ্যে আরও সূক্ষ্ম** ক্রমোসোম (chromosomes) **নামক কতকগুলি ক্ষুদ্রতর বীজাণু থাকে। বীজকোষ ও ডিম্বকোষের কতকগুলি** ক্রমোসোমের **সংমিশ্রণে একটা ভ্রূণের সৃষ্টি হইতে পারে, আর কতকগুলি** ক্রমোসোমের **সংমিশ্রণে আর একটা ভ্রূণের সৃষ্টি হইতে পারে।** তাই দুইজন ভাই বা ভগ্নী ঠিক এক নহে। এমন কি দুইজন যমজ ভাই বা ভগ্নীও ঠিক এক নহে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে **ভাই বা ভগ্নীগণের মধ্যে সাদৃশ্য প্রায় ·৫ বা আধাআধি।**

(৩) ইহা ছাড়া বংশগতির ফলে শিশু ঠিক তাহার পিতামাতার অনুরূপ হয় না, কখনও কিছু অধিক ধীসম্পন্ন হয়, কখনও কিছু কম ধীসম্পন্ন হয়। কিন্তু কয়েক পুরুষের গড়-পড়তা (average) নির্ধারণ করিলে দেখা যায় যে তাহা অনেকটা ঠিক থাকে। সুতরাং বলা যায় যে **বংশগতি রক্ষণশীলতার কাজ করে।** শারীরিক ও মানসিক উভয় বংশগতি সম্পর্কেই এই কথা বলা যায়।

(৪) **বংশগতির দ্বারা কেবল যে শিশুর শারীরিক ও মানসিক শক্তির পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয় তাহা নহে, ইহার দ্বারা তাহার শক্তিগুলি বিকাশের গতি** (speed) **এবং সীমাও নির্ধারিত হয়।** পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে একই রকম শিক্ষা পাইলেও ধীশক্তি-সম্পন্ন শিশুর দ্রুত বিকাশ হয় ও অধিকতর বিকাশ হয়, অল্পমেধা শিশুর বিকাশ ধীর হয় এবং কম হয়। তাই প্রতিভাবান্ শিশু প্রতিকূল অবস্থায়ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, খুব অনুকূল অবস্থায়ও অল্পমেধা শিশুর খুব বেশী বিকাশ হয় না।

(৫) পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে **সন্তান পিতামাতার নিকট হইতে বংশগত বিশেষত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়, তাহাদের অর্জিত বিশেষত্ব বা শক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়না।** কোন লোকের জন্মগত অঙ্গ-বৈকল্য থাকিলে তাহার সন্তানগণের মধ্যেও তাহা দেখা যাইতে পারে। কিন্তু কেহ দুর্ঘটনার ফলে বিকলাঙ্গ হইলে তাহার সন্তানগণ বিকলাঙ্গ হয় না। উচ্চশিক্ষিত লোকের সন্তানগণ সকল সময় উচ্চশিক্ষিত হয় না। অপর দিকে একেবারে অশিক্ষিত লোকের ছেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার উদাহরণ বিরল নহে। কোন বিশেষ বিষয়ে অধিকার, যথা,— গণিত, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি, পিতামাতা হইতেই সন্তান লাভ করে বলিয়া যে সাধারণের রিশ্বাস তাহা ভুল বলিয়া অনেকের মত।

পরিবেশ ও তাহার প্রভাব (Environment and its influence) ঃ

শিশু যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও বাস করে, তাহাই তাহার পরিবেশ। ইহাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা,—প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক। শিশুর চতুষ্পার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থাই তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ, সে যে সমাজে বাস করে তাহাই তাহার সামাজিক পরিবেশ, সে যে-সকল উপদেশ শ্রবণ করে বা যে-সকল পুস্তক পাঠ করে সেগুলিই তাহার মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

জন্মের পর হইতেই শিশুর পরিবেশ তাহার উপর কাজ করিতে আরম্ভ করে এবং শিশুও ক্রমশঃ তাহাদের প্রতিক্রিয়া করিতে শিখে ; ইহার ফলেই তাহার বিকাশ হয়। সে যেরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও বাস করে তাহার আকৃতি-প্রকৃতিও তদনুরূপ হয়। সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে তাহার আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়, যে মানসিক পরিবেশের সাহায্যে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার দ্বারা তাহার মানসিক বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক পরিবেশের প্রভাবেই বিভিন্ন দেশের অধিবাসীগণের আকৃতি, প্রকৃতি ও চিন্তাধারা বিভিন্ন হয়। সুতরাং শিশু বংশগতির ফলে যে শারীরিক মানসিক শক্তি লাভ করে পরিবেশের প্রভাবেই তাহাদের সম্যক বিকাশ হয়।

বংশগতি ও পরিবেশ ঃ এখন দেখা প্রয়োজন বংশগতি ও পরিবেশের মধ্যে কোন্‌টি অধিক শক্তিশালী এবং শিশুর উপর কোন্‌টির প্রভাব বেশী। মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, **শিশুর মানসিক শক্তি নির্ধারণে পরিবেশ হইতে বংশগতির প্রভাব অনেক বেশী।** তাঁহাদের মতে আমরা **আমাদের মানসিক শক্তির শতকরা ৮০ ভাগের বেশী বংশগতির ফলে লাভ করি,** শতকরা মাত্র ২০ ভাগের অনধিক পরিবেশের সাহায্যে অর্জন করিতে পারি।

কিন্তু তাই বলিয়া পরিবেশের প্রভাবের বা শিক্ষার কোন মূল্য নাই মনে করিলে নিতান্ত ভুল করা হইবে। **বংশগতির ফলে শিশু যে শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলি লাভ করে, পরিবেশের প্রভাব ব্যতীত তাহারা বিকশিত হইতে পারে না।** বংশগতির ফলে বিভিন্ন শিশুর স্বাভাবিক শক্তির তারতম্য হইলেও, পরিবেশের প্রভাবে সকলের স্বাভাবিক শক্তির যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। অধিক ধীসম্পন্ন শিশুর অধিক উন্নতির সম্ভাবনা থাকিলেও, শিক্ষা বা পরিবেশের সাহায্য ভিন্ন তাহা সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ যেমন খনিগর্ভে নিহিত ধাতুর মূল্য উহার পার্শ্ববর্তী মৃত্তিকাস্তর হইতে বেশী নহে, কিন্তু যখন উহাকে খনিগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া পরিষ্কৃত ও মানুষের ব্যবহারোপযোগী করা হয়, তখনই তাহা মূল্যবান বিবেচিত হয়। সেইরূপ **পরিবেশের প্রভাবে বিকশিত না হইলে বংশগতির ফলে প্রাপ্ত শিশুর স্বাভাবিক শক্তিগুলির কোন বিশেষ মূল্য নাই।** বৈজ্ঞানিক-প্রবর জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও অনেক লোক উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে নিরক্ষর বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যাইতে পারে।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে **বংশগতির পরিবর্তন সম্ভব নহে,** কিন্তু **পরিবেশকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা যায়।** ইহা ছাড়া অনেক মূল্যবান্‌ গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না, পরিবেশের সাহায্যেই শিশু পুনরায় অর্জন করিতে পারে। **কোন বিষয়ের জ্ঞান বা কোন কার্যে দক্ষতা** (skill) **বংশগতিতে পাওয়া যায় না,** পরিবেশের সাহায্যে লাভ করিতে

পদার্থ আছে। কোন বহিঃপ্রভাব জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর কাজ করিলে তথাকার স্নায়ুকোষস্থ **প্রটোপ্লাজমে এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া হয়।** তাহার ফলে তথায় একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সেই উত্তেজনা-প্রবাহ এক শ্রেণীর স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্রে নীত হয়। তথায় ইহার প্রতিক্রিয়া স্থির হয়। অন্য এক শ্রেণীর স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে নির্ধারিত প্রতিক্রিয়া প্রয়োজনীয় মাংসপেশীকে জানান হয় এবং মাংসপেশী তদনুযায়ী কার্য করে। একটা উদাহরণের সাহায্যে ইহাকে আরও বিশদ করা যাইতে পারে। মনে কর একটি বালক আর একটি বালকের গালে একটা চড় মারিল। ইহাতে তথাকার স্নায়ুকোষের প্রটোপ্লাজমে রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। সেই উত্তেজনা-প্রবাহ স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্রে নীত হইল। তথায় ইহার বিচার হইয়া স্থির হইল যে, আঘাতকারী বালকের গালে দুইটি চড় দেওয়া উচিত। অন্য এক শ্রেণীর স্নায়ুর সাহায্যে সেই সিদ্ধান্ত দক্ষিণ হস্তের মাংসপেশীকে জানান হইল। দক্ষিণ হস্ত তৎক্ষণাৎ সেই বালকটির গণ্ডে দুইটি চড় দিল। এক মিনিট বা তাহারও কম সময়ের মধ্যে এই রিপোর্ট-দান, বিচার, আদেশ-দান ও আদেশ-পালন কার্য সম্পাদিত হইল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শরীরের এই কাজের জন্য **চারি প্রকার শারীরিক যন্ত্রের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।** যথা,—

(১) **জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ**—ইহারা বাহিরের প্রভাব গ্রহণ করে।

(২) **স্নায়ুমণ্ডলী**—ইহারা বাহিরের প্রভাবজাত উত্তেজনাপ্রবাহ স্নায়ুকেন্দ্রে লইয়া যায় এবং তথায় নির্ধারিত প্রতিক্রিয়া-প্রবাহ মাংসপেশীতে পৌঁছাইয়া দেয়।

(৩) **স্নায়ুকেন্দ্র**—ইহারা বাহিরের প্রভাবের বিচার করে এবং তাহার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া স্থির করে। মস্তিষ্কেই অধিকাংশ স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত। মেরুদণ্ডের অন্তর্ভাগস্থ স্নায়ুগুচ্ছেও (Spinal cord) কতকগুলি স্নায়ুকেন্দ্র আছে।

(৪) **মাংসপেশী ও গ্লাণ্ডসমূহ**—ইহারাই প্রতিক্রিয়া করে।

১। **জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ ঃ**

(ক) চক্ষু—দর্শনেন্দ্রিয়।

(খ) কর্ণ—শ্রবণেন্দ্রিয় ; ইহার দ্বারা শরীরের স্থিরতাজ্ঞানও (Equilibration sense) হয়।

(গ) নাসিকা—ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

(ঘ) জিহ্বা—স্বাদেন্দ্রিয়।

(ঙ) চর্ম—স্পর্শেন্দ্রিয়।

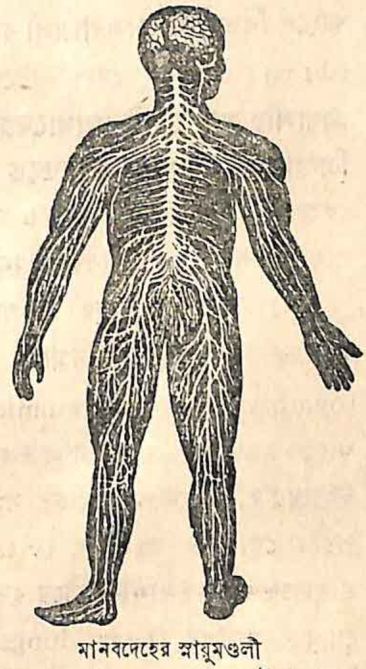
(চ) মাংসপেশী ও অস্থিগ্রন্থি (Joints)—আকর্ষণ ও গতি-ইন্দ্রিয়। উপরিউক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যেই আমরা বাহিরের বিভিন্ন প্রভাব গ্রহণ করিতে পারি বা পরিবেশের জ্ঞান অর্জন করিতে পারি। তাই এই **ইন্দ্রিয়গুলিকে জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ বলা হয়।** এক এক ইন্দ্রিয় এক এক প্রকারের প্রভাব গ্রহণ করিতে পারে, একটি অন্যটির কাজ করিতে পারে না। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ ও কার্যক্ষম না থাকিলে এবং তাহাদের যথাযথ ব্যবহার করিতে না শিখিলে আমরা বাহিরের প্রভাবগুলি ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। তাই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির যথাযথ ব্যবহার শিক্ষাদানও শিশুর শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ।

এস্থলে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন কাজ থাকিলেও অনেক সময় তাহাদের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। দূরত্ব জ্ঞানলাভে অনেক সময় স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় সহযোগিতা করিতে পারে। **কোন জ্ঞানলাভে যত বেশী ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা যায়, সেই জ্ঞান ততই গভীর, সঠিক এবং স্থায়ী হয়।** যথা,—কেবল দেখিয়া, শুনিয়া, বা লিখিয়া কোন বিষয় শিক্ষা করার চেয়ে একসঙ্গে দেখিয়া, শুনিয়া ও লিখিয়া সেই বিষয় শীঘ্র ও ভাল শিক্ষা করা যায়।

(২) **স্নায়ুমণ্ডলী—স্নায়ুমণ্ডলী আমাদের সমস্ত শরীরে জালের মত প্রসারিত আছে।** শরীরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বহির্ভাগে চর্ম পর্যন্ত ইহার শাখা-প্রশাখা ছাইয়া আছে। **যে-সকল স্নায়ু জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের স্নায়ু-কোষের উত্তেজনা-প্রবাহ স্নায়ুকেন্দ্রে লইয়া যায় তাহাদিগকে**

অন্তর্মুখী স্নায়ু (afferent nerves) **বা জ্ঞানদায়িনী স্নায়ু** (sensory nerves) **বলে। অপর যে সকল স্নায়ু স্নায়ুকেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মাংসপেশীতে পৌঁছাইয়া দেয় তাহাদিগকে বহির্মুখী স্নায়ু** (efferent nerves) **বা গতিদায়িনী স্নায়ু** (motor nerves) **বলে।**

একটি স্নায়ু কতকগুলি স্নায়ুকোষের (neuron) **সমষ্টিমাত্র। স্নায়ুকোষের তুই দিকে তুই বা বহু সূতার ন্যায় শাখা** (axon) **থাকে।** তাহারা আবার ক্ষুদ্রতর শাখা-প্রশাখায় (dendron) বিভক্ত হয়। এই সকল সূত্র বা শাখার দ্বারাই স্নায়ুকোষগুলি পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় এবং এইরূপে অনেকগুলি স্নায়ুকোষ মিলিত হইয়া একটা দীর্ঘ স্নায়ুর সৃষ্টি হয়। স্নায়ুকোষের এক দিকের শাখা দ্বারা জীবকোষের উত্তেজনাপ্রবাহ স্নায়ুকোষে প্রবেশ করে এবং অপর দিকের শাখা দ্বারা তাহা বাহির হইয়া যায়। **তুই নিউরন বা স্নায়ুকোষের সঙ্গমস্থলকে স্নায়ুসন্ধি বা সাইনাপ্‌স** (synapse) **বলে।** পূর্বোক্ত প্রবাহ এক স্নায়ুকোষ হইতে অন্য স্নায়ুকোষে যাইবার সময় স্নায়ুসন্ধিতে কিছু বাধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রবাহের বারবার যাতায়াতের ফলে সাইনাপ্সের বাধা দেওয়ার শক্তি কমিয়া যায়। এইরূপে **স্নায়ুকোষের উত্তেজনা-প্রবাহের সহজে যাতায়াতের একটা পথ নির্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ অভ্যাসের সৃষ্টি হয়।**



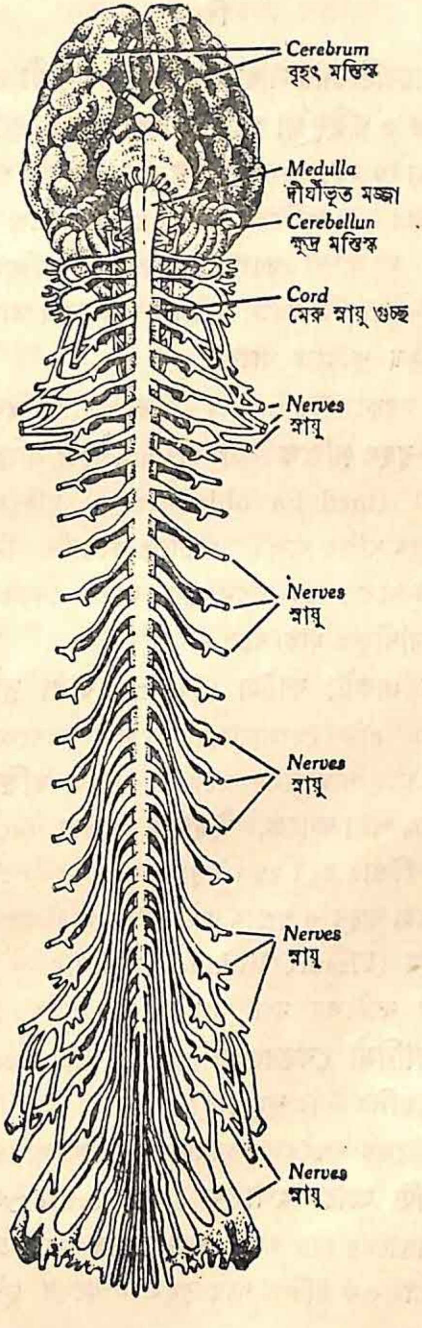
মানবদেহের স্নায়ুমণ্ডলী

স্নায়ুমণ্ডলীকে তুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা,—(ক) **মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডবাহী স্নায়ু-প্রণালী** (cerebro-spinal nerve system) ও (খ) **সহযোগী বা স্বক্রিয়াশীল স্নায়ু-প্রণালী** (sympathetic or autonomic nerve system)।

(ক) **মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডবাহী স্নায়ু-প্রণালী** সমস্ত মস্তিষ্ক ছাইয়া আছে এবং মস্তিষ্কের পিছন দিকে মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া নামিয়া আসিয়াছে। ইহার মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ অংশকে **মেরু-স্নায়ুগুচ্ছ** (spinal cord) বলে। মেরু-স্নায়ুগুচ্ছের প্রত্যেক পার্শ্ব হইতে কতকগুলি স্নায়ু শরীরের সেই পার্শ্বস্থ চর্মে (Periphery) পৌছিয়াছে। সেইজন্য ইহাকে **পেরিফারেল স্নায়ু-প্রণালী** (Peripheral system) বলে। এই প্রণালীর **প্রত্যেক স্নায়ু পুনঃ দুই অংশে বিভক্ত—জ্ঞানদায়িনী বা গতিদায়িনী স্নায়ু** (sensory and motor fibres)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই মস্তিষ্ক-**মেরুদণ্ডবাহী স্নায়ু-প্রণালীর সাহায্যেই আমাদের সমস্ত জ্ঞান সংগ্রহের কার্য এবং প্রতি-ক্রিয়ার কার্য সমাধা হইতেছে।** শুধু তাহা নহে, ইহার সাহায্যে স্নায়ু-কেন্দ্রগুলির বা চিন্তার কাজও চলিতেছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহারই সাহায্যে আমাদের মানসিক জীবন নির্বাহ হইতেছে।

(খ) মেরু-স্নায়ুগুচ্ছের দুই পার্শ্বে তাহার সহিত সমান্তরাল ভাবে দুইটি স্নায়ুগুচ্ছ আছে। **ইহাদিগকে সহযোগী বা স্বক্রিয়াশীল স্নায়ুপ্রণালী** (Sympathetic or autonomic system) বলে। কারণ ইহারা মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রগুলির দ্বারা পরিচালিত হয় না, আপনা হইতে কাজ করে। একদিকে ইহাদের সহিত মেরুস্নায়ুগুচ্ছের সংযোগ আছে, অপর দিকে এইগুলি বিভিন্ন শরীর পোষণের যন্ত্রগুলির (vital organs) ও গ্লাণ্ডগুলির সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। এইগুলিই শরীরে রক্ত-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করে এবং সমস্ত শরীর-পোষক যন্ত্রগুলির (heart, lungs, stomach etc.) কাজ চালায়। সুতরাং **ইহারই সাহায্যে মানুষের শরীর পোষণের কার্য নির্বাহ হয়।**

স্নায়ুকেন্দ্র (Nerve centre)—অন্তর্মুখী স্নায়ু দ্বারা উত্তেজনা-প্রবাহ স্নায়ুকেন্দ্রে পৌছিলে তথায় বহিঃপ্রভাবের ক্রিয়ার বিচার হয়, তাহার কি প্রতিক্রিয়া করা উচিত স্থির হয় এবং বহির্মুখী স্নায়ুর সাহায্যে তাহা মাংস-পেশীকে জানান হয়। সুতরাং **স্নায়ুকেন্দ্রগুলিই মানুষের সমস্ত মানসিক কাজ নিয়ন্ত্রিত করে।** মস্তিষ্কেই প্রধান প্রধান স্নায়ুকেন্দ্রগুলি অবস্থিত। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুগুচ্ছেও কতকগুলি স্নায়ুকেন্দ্র আছে।


Cerebrum
বৃহৎ মস্তিস্ক
Medulla
দীর্ঘীভূত মজ্জা
Cerebellun
ক্ষুদ্র মস্তিস্ক
Cord
মেরু স্নায়ু গুচ্ছ
Nerves
স্নায়ু
Nerves
স্নায়ু
Nerves
স্নায়ু
Nerves
স্নায়ু
Nerves
স্নায়ু

স্নায়ুবৃত্ত—**জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্তর্মুখী স্নায়ু, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট স্নায়ুকেন্দ্র ও বহির্মুখা স্নায়ু লইয়া একটা স্নায়ুবৃত্ত গঠিত হয়।** এই স্নায়ুবৃত্ত খুব ছোটও হইতে পারে, বেশী দীর্ঘও হইতে পারে। যথা, পিঠের চামড়ায় কোন প্রভাব কার্য করিলে মেরুদণ্ডস্থ স্নায়ুকেন্দ্রে তাহার প্রতিক্রিয়া স্থির হইয়া হাতের মাংসপেশী তাহার প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। অথবা পায়ের তলায় কোন অনুভূতি হইলে মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্রে তাহার বিচার হইয়াও হস্ত তাহার প্রতিক্রিয়া করিতে পারে।

মস্তিষ্ক—ইহা নরকরোটির (খুলির) অভ্যন্তরে অবস্থিত ও **তিন ভাগে বিভক্ত**। যথা,—**বৃহৎ মস্তিষ্ক** (cerebrum), **ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক** (cerebellum) এবং দীর্ঘীভূত মজ্জা (medulla oblongata)। মস্তিষ্কের সম্মুখ ও উপরি-ভাগের অংশকে বৃহৎ মস্তিষ্ক বলে। পশ্চাতে করোটির নিম্ন প্রান্তে অবস্থিত অংশকে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বলে ; যে স্থানে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে তাহাকে দীর্ঘীভূত মজ্জা বলে।

বৃহৎ মস্তিষ্ক একটা ফাটল (fissure) **দ্বারা দুই ভাগে বা দুই গোলার্ধে** বিভক্ত। দক্ষিণ গোলার্ধ শরীরের বাম অংশকে এবং বাম গোলার্ধ শরীরের দক্ষিণ অংশকে পরিচালিত করে। **বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরিভাগে ধূসর বর্ণের একটা পর্দা আছে, ইহাকে কর্টেক্স** (cortex) বলে। এই কর্টেক্সেই মানুষের চিন্তার কার্য হয়। বৃহৎ মস্তিষ্কের প্রত্যেক গোলার্ধ পুনঃ একটা ফাটলের দ্বারা সম্মুখ ও পশ্চাৎ এই দুইভাগে বিভক্ত। এই ফাটলকে **রোলাণ্ডিও ফাটল** (Fissure Rolandio) বলে।

বৃহৎ মস্তিষ্কের ফাটলের মধ্য অংশের দুই পার্শ্বে রোলাণ্ডিও ফাটলের সম্মুখভাগে **গতিদায়িনী কেন্দ্রগুলি** (motor centres) অবস্থিত। ইহা শরীরের মাংসপেশীগুলির উপর কর্তৃত্ব করে।

রোলাণ্ডিও ফাটলের পশ্চাদ্ভাগে গতিদায়িনী কেন্দ্রগুলির সহিত সমান্তরাল-ভাবে **স্পর্শ ও গতি জ্ঞানোৎপাদক ক্ষেত্র** (sensory area) অবস্থিত। বৃহৎ মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগের নিম্ন অংশে **দর্শনকেন্দ্র** অবস্থিত। **শ্রবণ কেন্দ্র-গুলি** কর্ণ হইতে প্রায় এক ইঞ্চি উপরে বৃহৎ মস্তিষ্কের দুই পার্শ্বে অবস্থিত।

আস্বাদ ও গন্ধ অনুভূতির কেন্দ্র দুই গোলার্ধের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত মেডুলা অবলঙ্গাটার মধ্যেও কতকগুলি স্নায়ুকেন্দ্র আছে। এইগুলি জিহ্বা, ফেরিংস, লেরিংস ও বক্ষগহ্বর এবং উদর-গহ্বরের যন্ত্রগুলিকে পরিচালিত করে।

শরীরকে স্থিরভাবে রাখা এবং গতির সমতা রক্ষা করাই (co-ordination of movements) **ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কাজ**।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মস্তিষ্ক সমগ্র ভাবে কাজ করে না। ইহার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্র আছে এবং তাহারা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। জ্ঞান-কেন্দ্রগুলি স্নায়ুর দ্বারা নিজ নিজ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত এবং অন্তর্মুখী স্নায়ুর সাহায্যে তাহাদের সংগৃহীত জ্ঞান গ্রহণ করে। বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরের অংশস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রে তাহাদের বিচার হয় এবং প্রতিক্রিয়া স্থির হয়। গতি-দায়িনী কেন্দ্রগুলি হইতে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার আদেশ মাংসপেশীতে প্রেরিত হয়। বহির্মুখী স্নায়ু এই আদেশ মাংসপেশীতে লইয়া যায় এবং মাংসপেশী তদনুযায়ী কাজ করে। এক্ষণে দেশশাসন কার্যের সহিত স্নায়ুমণ্ডলীর কার্যের তুলনা করিয়া এই জটিল বিষয় আরও বিশদ করা যাইতেছে।

বৃহৎ মস্তিষ্কের **উপরের অংশই** (cortex) যেন দেশের সর্বাপেক্ষা **উর্ধ্বতন শাসনকেন্দ্র**। মস্তিষ্কের **জ্ঞানকেন্দ্র ও গতিদায়িনী কেন্দ্রগুলি** যেন ভিন্ন ভিন্ন শাসন বিভাগের **কেন্দ্রীয় কার্যালয়** (Head office); **মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুকেন্দ্র**গুলি যেন শাসন বিভাগের **স্থানীয়** কার্যালয়; সমস্ত শরীরে প্রসারিত **স্নায়ুমণ্ডলী** যেন বার্তাবহ কর্মচারী। **মাংসপেশী**গুলি যেন শাসন-বিভাগের **স্থানীয় কর্মচারী**। **জীবকোষগুলি** যেন মানবদেহরূপ দেশের অগণিত **অধিবাসী**।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্নায়ুকোষগুলির উপর কোন বহিঃপ্রভাবের ক্রিয়া হইলে তাহারা অন্তর্মুখী স্নায়ু নামক বার্তাবহ কর্মচারীকে খবর দেয় এবং সেই বার্তাবহ কর্মচারী মেরু-স্নায়ু-গুচ্ছস্থিত স্থানীয় শাসনকেন্দ্রে তাহার রিপোর্ট করে। সাধারণ বিষয় হইলে এই স্থানীয় শাসনকার্যালয়ে তাহার মীমাংসা হয়। বহির্মুখী স্নায়ু নামক বার্তাবহ কর্মচারী তথাকার সিদ্ধান্ত মাংসপেশী নামক শাসন-বিভাগের স্থানীয় কর্মচারীকে তাহা জানাইয়া দেয় এবং তাহারা সেই

আদেশানুযায়ী কার্য করে। শাসন-বিভাগগুলির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অর্থাৎ মস্তিষ্কে তাহার খবরও পৌঁছে না। ইহাকেই **স্বক্রিয় প্রতিক্রিয়া** (automatic or reflex action) বলে।

কিন্তু ঘটনা যদি কিছু গুরুতর বা জটিল হয়, মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ স্থানীয় শাসন-কার্যালয়গুলি তাহার মীমাংসা না করিয়া মস্তিষ্কের জ্ঞানকেন্দ্ররূপ কেন্দ্রীয় শাসন-কার্যালয়ে তাহার খবর পাঠায়। তখন বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরের অংশস্থ ঊর্ধ্বতন শাসন-কেন্দ্রে ইহার বিচার হয় এবং উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার আদেশ হয়। গতিদায়িনী কেন্দ্ররূপ কেন্দ্রীয় শাসন-কার্যালয় বহির্মুখী স্নায়ুরূপ বার্তাবহ কর্মচারীর সাহায্যে সেই আদেশ মাংশপেশীরূপ স্থানীয় কর্মচারীর নিকট পাঠায়। তাহারা সেই আদেশমত কাজ করে।

References :

1. Peter Sandiford—Educational Psychology. Chap. II-V.

2. G. H. Thompson—Instinct, Intelligence and Character Chap. VI.

3. Sarat Chandra Brahmachari—ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান

4. J. Watson—Psychology from the Standpoint of a Behaviourist. Chap. III-V.

5. O. B. Douglas and B. E. Holland—Fundamentals of Educational Psychology.

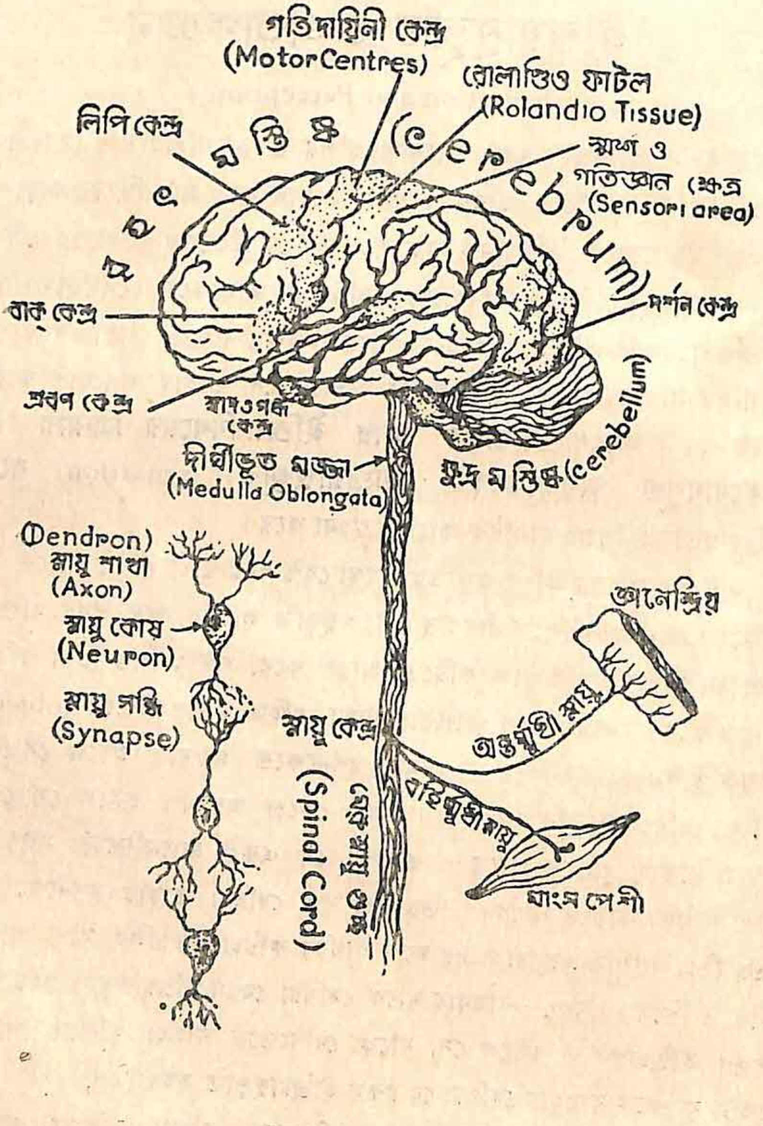
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান

(Sensation and Perception)

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির উপর বহিঃপ্রভাব (external stimuli) ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্নায়ুকোষ-গুলির প্রটোপ্লাজ্‌মে রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া যে উত্তেজনা-প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাহা অন্তর্মুখী স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কস্থ জ্ঞানকেন্দ্রে পৌছিলে শিশু বহিঃপ্রভাবের ক্রিয়া অনুভব করিতে পারে। কিন্তু তখনও তাহার চিন্তাশক্তি জাগরিত না হওয়ায় এবং অভিজ্ঞতার অভাবে সে তাহার অর্থবোধ করিতে পারে না। **জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির উপর ইন্দ্রিয়-বিষয়ের ক্রিয়ার এই অর্থবোধশূন্য অনুভূতিকেই ইন্দ্রিয়ানুভূতি** (sensation) **বলে।** ইন্দ্রিয়ানুভূতিই শিশুর মানসিক কাজের সূচনা করে।

এই অর্থবোধশূন্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির অবস্থা বেশী সময় স্থায়ী হইতে পারে না। মস্তিষ্কের জ্ঞানকেন্দ্রগুলিতে বারবার এই অনুভূতি লাভের ফলে শীঘ্রই মস্তিষ্কের ঊর্ধ্বতন স্নায়ুকেন্দ্রগুলি কাজ করিতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ শিশু চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। প্রথমে সে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সহিত ইন্দ্রিয়-বিষয়ের (objects) সম্পর্ক স্থাপন করিতে শিখে। যেমন, দর্শনকেন্দ্রে অনুভূতি হইলে সে কোন আলো দেখিতেছে বুঝিতে পারে। শ্রবণ-কেন্দ্রে অনুভূতি হইলে সে কোন শব্দ শুনিতেছে বুঝিতে পারে। তারপর সে একই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখিয়া তাহার দর্শনকেন্দ্রে যে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি হয় তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করিয়া বস্তুগুলির মধ্যে পার্থক্য করিতে শিখে। যথা,—বারবার মাকে দেখিয়া যেরূপ ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইয়াছিল, সেরূপ ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইলে সে মাকে দেখিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারে। একটা কুকুরকে বারবার দেখিয়া যে রকম ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইয়াছিল, সেই রকম ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইলে একটা কুকুর দেখিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারে।


গতিদায়িনী কেন্দ্র
(MotorCentres)
রোলাণ্ডিও ফাটল
(Rolandio Tissue)
লিপি কেন্দ্র
বৃহৎ মস্তিষ্ক (cerebrum)
স্পর্শ ও
গতিজ্ঞান কেন্দ্র
(Sensori area)
বাক্ কেন্দ্র
দর্শন কেন্দ্র
শ্রবণ কেন্দ্র
স্বাদ ও গন্ধ
কেন্দ্র
দীর্ঘীভূত মজ্জা
(Medulla Oblongata)
ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (cerebellum)
(Dendron)
স্নায়ু শাখা
(Axon)
স্নায়ু কোষ
(Neuron)
স্নায়ু সন্ধি
(Synapse)
স্নায়ু কেন্দ্র
মেরু স্নায়ু স্তম্ভ
(Spinal Cord)
জ্ঞানেন্দ্রিয়
অন্তর্মুখী স্নায়ু
বহির্মুখী স্নায়ু
মাংস পেশী

এইরূপে অভিজ্ঞতার সাহায্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরীক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্বন্ধে শিশুর যে জ্ঞান হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। সংক্ষেপে বলা যায় যে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে শিশু ইন্দ্রিয়-বিষয়ের যে জ্ঞান লাভ করে তাহাকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে **ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুভবমূলক** এবং **প্রত্যক্ষ জ্ঞান চিন্তামূলক। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত পূর্বস্মৃতিও জড়িত থাকে।** কারণ পূর্ব ইন্দ্রিয়ানুভূতির ফলে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে নূতন ইন্দ্রিয়ানুভূতির অর্থবোধ করা যায়।

প্রথম কয়েক বৎসর **শিশু কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই তাহার পরিবেশের জ্ঞান অর্জন করিতে পারে।** অর্থাৎ চোখে দেখিয়া, কাণে শুনিয়া, হাতে স্পর্শ করিয়া বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে। কৈশোর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্য না লইয়া কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা বা কোন বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা তাহার পক্ষে কঠিন। এই জন্যই প্রথমে সমস্ত বিষয় যতদূর সম্ভব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকারে শিশুর নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে হয়। বয়স্ক লোকেও প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যেই তাহার প্রাকৃতিক বা শারীরিক পরিবেশের জ্ঞান লাভ করে। তবে বয়স্ক লোকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্য না লইয়াও জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। যথা,—একজন লোক শব্দহীন অন্ধকার ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে অনেক গভীর সত্য আবিষ্কার করিতে পারে। অবশ্য পূর্বলব্ধ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সাহায্যেই এরূপ চিন্তা করা সম্ভব হয়।

References :

1. J. Ross—Ground-work of Educational Psychology, Chap. XII.
2. Sarat Ch. Brahmachari—Byabaharik Monobijnan. Chap. V & VI.
3. D. Starch—Educational Psychology. Chap VII-X.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছা

(Knowing, Feeling and Willing)

মানুষের মানসিক কাজকে তিনটি প্রধানভাগে বিভক্ত করা যায়—জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা। শিশুর প্রথম বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে মানসিক কাজ বলা যায় না। কারণ তখন তাহার চিন্তা করিবার শক্তিই জন্মে নাই। পরে সে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে আরম্ভ করে এবং তখনই তাহার মানসিক কাজের সূচনা হয়। সুতরাং **জ্ঞানই শিশুর প্রথম মানসিক কাজ**। কিন্তু কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সুখ বা দুঃখ বোধ হয়। কোনরূপ আঘাত পাইলে তাহার দুঃখ হয় ও সে কান্না করে; মায়ের কোলে তুলিয়া লইলে সে আরামবোধ করে। কুকুর বা কোন হিংস্র জন্তু দেখিলে তাহার ভয় হয়। সুতরাং **জ্ঞানলাভের ফলেই তাহার সুখ, দুঃখ, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব হয় এবং ভাবই তাহার দ্বিতীয় মানসিক কাজ**। কিন্তু এখানেই তাহার মানসিক কার্য সম্পূর্ণ হয় না। কোন বিষয় বা বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান আনন্দদায়ক হইলে তাহা পুনঃ দেখিবার, শুনিবার বা পাইবার ইচ্ছা হয় এবং কষ্টদায়ক হইলে তাহা অপসারিত করিবার বা তাহা হইতে দূরে যাইবার ইচ্ছা হয়; অর্থাৎ কোন কাজ করিবার ইচ্ছা হয়। সুতরাং **কোন কাজ করার ইচ্ছাই শিশুর তৃতীয় মানসিক কাজ**। তাই মানুষের মানসিক কাজকে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

জীবদেহের কাজের দিক্ দিয়া দেখিলে এই তিনটি স্বতন্ত্র কাজ বলিয়া বলা যায় না। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর বাহিরের কোন প্রভাবের ক্রিয়াজনিত উত্তেজনা-প্রবাহ মস্তিষ্কে পৌঁছিলেই তথায় তাহার বিচার হইয়া তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান ও

ভাব হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোন প্রতিক্রিয়া করিবার ইচ্ছা হয়। বস্তুতঃ **আমাদের সমস্ত মানসিক কাজের মধ্যে এই তিনটি বৃত্তি জড়িত থাকে,** একটা হইতে আর একটাকে পৃথক্ করা যায় না।

References :

1. J. Ross—Ground-work of Educational Psychology. Chap. II.
2. Sarat Ch. Brahmchari.—ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সহজ বৃত্তি

(Reflexes and Instincts)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মানবশিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি থাকে না ; প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভের ফলেই তাহার চিন্তাশক্তি জাগরিত হয়। ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইতে আরও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং সে তখন চিন্তা করিয়া বা ইচ্ছা করিয়া কোন কাজ করিতে পারে না। কিন্তু সে কতকগুলি সংস্কার বা স্বাভাবিক কার্য-প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং তাহাদের সাহায্যে জীবন রক্ষা করে। যথা—খাওয়া, হাতেধরা, অনুকরণ করা ইত্যাদি। **পূর্বাভ্যাসের সাহায্য না লইয়া ও ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার না করিয়া স্বভাব বা সংস্কারবশে কোন কাজ করিবার যে প্রবৃত্তি জীবমাত্রেই দেখা যায় তাহাকেই সহজ বৃত্তি বলে। সংক্ষেপে ইহাকে অভ্যাস-নিরপেক্ষ ও চিন্তাবিহীন সহজাত কর্মপ্রবৃত্তি বলা যায়।**

শিশুকে সহজবৃত্তির কাজগুলি শিক্ষা করিতে হয় না, এইগুলি **তাহার সহজাত।** তাহার পিতামাতার নিকট হইতে বংশানুবর্তনের ফলে সে এই

প্রবৃত্তিগুলি লাভ করে। কারণ সে তাহার পিতামাতার নিকট হইতে এক প্রকার স্নায়ুপ্রণালী পাইয়াছে এবং তাহা পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার ফলে এক নির্দিষ্ট আকারে গঠিত হইয়াছে এবং এক নির্দিষ্ট ভাবে কাজ করে বা প্রতিক্রিয়া করে। **স্নায়ুপ্রণালীর এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া-প্রবৃত্তিকেই সহজ বৃত্তি বলে**। এই প্রবৃত্তিমূলক কাজকে পুনঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা,—স্বক্রিয় প্রতিক্রিয়া (reflex) এবং সহজ বৃত্তি (instinct)। শিশু অজ্ঞাতসারে অর্থাৎ মস্তিষ্কের সাহায্য না লইয়া যে প্রবৃত্তিমূলক কাজ করে তাহাকে স্বক্রিয় প্রতিক্রিয়া (reflex) বলে। মেরুস্নায়ুকেন্দ্রের সাহায্যেই এই প্রতিক্রিয়া হয়। আমরা কোন সময়ে চিন্তামগ্ন থাকিলেও হাতে একটা গরম জিনিষ লাগিলে অজ্ঞাতসারে হাতটা সরাইয়া লই। ইহাকেই reflex বলে। চক্ষুর নিমেষই সর্বাপেক্ষা সরল ও ক্ষণস্থায়ী reflex। আমরা জ্ঞাতসারে, অর্থাৎ মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রের সাহায্যে, যে প্রবৃত্তিমূলক কাজ করি তাহাকে সহজ বৃত্তি বলে। ভয় পাইলে আমরা যে পলায়ন করি তাহা **সহজবৃত্তির কাজ**। এই কাজ আমরা **জ্ঞাতসারে করি, কিন্তু চিন্তা করিয়া করি না, প্রবৃত্তির বশে করি**।

সহজ বৃত্তির সংখ্যা ও তালিকা ঃ

Tansley সহজ বৃত্তিগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন,—**আত্ম-প্রবৃত্তি** (ego-instinct), **দল-প্রবৃত্তি** (herd-instinct) এবং **যৌন-প্রবৃত্তি** (sex-instinct)। তাঁহার মতে মানুষের সকল সহজ বৃত্তি উপরিউক্ত তিনটি বৃত্তির অন্তর্গত। চিন্তা-বিশ্লেষণকারী মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ (Psycho-analysts) কেবল দুইটি সহজবৃত্তি স্বীকার করেন। যথা,—**আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা**। Mc. Dougallএর মতে **প্রত্যেক ভাববৃত্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত** (corresponding) **এক একটা সহজবৃত্তি আছে** এবং কোন ভাববৃত্তি জাগরিত হইয়াই তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত সহজবৃত্তিকে কর্মপ্রেরণা দেয়। সুতরাং সহজবৃত্তির সংখ্যা দুই বা তিন হইতে বেশী। যথা—ভয় হইতে পলায়ন প্রবৃত্তি, ক্রোধ হইতে যোধন প্রবৃত্তি, বিতৃষ্ণা হইতে অপসারণ প্রবৃত্তি, বিস্ময় হইতে ঔৎসুক্য প্রবৃত্তি প্রভৃতি জাগে।

Thorndike ও অন্য মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ **সহজবৃত্তিগুলিকে ব্যবহার সম্বন্ধীয়** (behaviouristic) বলিয়া মনে করেন এবং সেই ভাবে তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করেন। M. Thorndike সহজবৃত্তিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যথা—

(১) **খাদ্য খাওয়ার ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি** (Food-getting and protective responses)—মুখে দেওয়া, গলাধঃকরণ করা, খাদ্য সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা, আবাসপ্রিয়তা (domesticity), প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ক্রোধ, ভয়, যোধন প্রবৃত্তি ইত্যাদি।

(২) **অন্য মানুষের ব্যবহার প্রতিক্রিয়া** (responses to behaviour of other human beings)। পিতামাতার প্রতি সমুচিত ব্যবহার, দলবদ্ধ হওয়ার প্রবৃত্তি, মনোযোগ লাভের প্রবৃত্তি, প্রশংসা বা ঘৃণা-লাভের প্রতিক্রিয়া, প্রভুত্ব করিবার বা অধীনতা স্বীকারের প্রবৃত্তি, আত্মপ্রদর্শন, লজ্জা, আত্মবোধ-মূলক ব্যবহার (self-conscious behaviour), স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার (sex behaviour), সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা লোভ, ঈর্ষা, দয়া, অনুকরণ, যন্ত্রণা দেওয়ার প্রবৃত্তি ইত্যাদি।

(৩) **কতকগুলি সাধারণ শারীরিক গতি ও মানসিক কর্মপ্রবৃত্তি** (Minor bodily movements and cerebral connections)। কথা বলা, পর্যবেক্ষণ, হাতে ধরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ঔৎসুক্য, খেলা ও নানা শারীরিক মানসিক কাজ।

সহজবৃত্তিগুলির উন্মেষ ও বিকাশ

সহজবৃত্তিগুলির উন্মেষ এক সঙ্গে হয় না। ভূমিষ্ট হওয়ার পরই খাওয়ার প্রবৃত্তি দেখা দেয়, তাহার পর দেখিবার, শুনিবার, অনুকরণ করিবার, খেলা করিবার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। অপর দিকে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, প্রভৃতি সামাজিক প্রবৃত্তির উন্মেষ আরও বিলম্বে হয়। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের (Biologists) মতে প্রত্যেক মানুষের জীবনে মানবজাতির বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির পুনরাবৃত্তি হয়। তাই মানব সভ্যতার বিকাশের ক্রমে

মানুষের সহজ বৃত্তিগুলির উন্মেষ হয় (The recapitulatory Theory of instincts)।

সহজ বৃত্তিগুলির উন্মেষ যেমন এক সঙ্গে হয় না, সেরূপ তাহারা সম পরিমাণে স্থায়ীও হয় না। অধ্যাপক জেম্‌সের মতে অধিকাংশ সহজ বৃত্তিই **স্বল্পকাল স্থায়ী।** তাহারা যখন সতেজ থাকে, তখন তাহাদের প্রচুর ব্যবহারের ফলে যে অভ্যাসগুলি গঠিত হয় তাহারাই স্থায়ী হয়।

সহজ বৃত্তিগুলির বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ (Modification)

যখন যে সহজ বৃত্তির উন্মেষ হয় তখন তাহার যথেষ্ট ব্যবহার হইলেই তাহার যথাসম্ভব বিকাশ হইতে পারে। অনেক সহজ বৃত্তি ঠিক সময়ে যথেষ্ট ব্যবহৃত না হইলে পরে লোপ পায়। যথা,—বাল্যকালে খেলার প্রবৃত্তি খুব প্রবল থাকে ; তখনই যদি খেলার অভ্যাস গঠন করা না যায় তবে যৌবনেই খেলার প্রবৃত্তি লোপ পায়। গান করা, ছবি আঁকা, সাহিত্য চর্চা করা ইত্যাদি সম্বন্ধে এই কথা সত্য। তবে কাহারও কাহারও মতে ঠিক সময়ে ব্যবহারের অভাবে কোন সহজ বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িলেও একেবারে লোপ পায় না। চেষ্টা করিলে পরে তাহা পুনঃ জাগরিত করা যায়। ইহা অবশ্য কষ্টসাধ্য হয়। সহজ বৃত্তিগুলির বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হয়। যথা,—

(১) **পুনঃ পুনঃ প্রতিক্রিয়ার সুযোগ দান।** কোন সহজ বৃত্তি যে প্রভাবের প্রতিক্রিয়া, শিশুর উপর সেই প্রভাবের যত বেশী কাজ হইতে দেওয়া যায় সে তাহার তত বেশী প্রতিক্রিয়া করে বা সেই সহজ বৃত্তির তত বেশী ব্যবহার করে। ইহার ফলে সেই সহজ বৃত্তির যথাসম্ভব বিকাশ হয় এবং তাহা অভ্যাসে পরিণত হয়।

(২) **আনন্দ বা দুঃখ বোধ।** কোন প্রতিক্রিয়ার ফল আনন্দদায়ক হইলে সেরূপ প্রতিক্রিয়া করার জন্য শিশুর আগ্রহ হয় ; প্রতিক্রিয়ার ফল দুঃখজনক হইলে শিশু তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। কোন প্রতিক্রিয়া করিয়া আনন্দ লাভের সুযোগ দিয়া তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে উৎসাহ দেওয়া যায়, দুঃখ পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্তি করা যায়। প্রশংসা ও নিন্দা, পুরস্কার ও শাস্তির দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

(৩) বিশুদ্ধীকরণ (Sublimation)। প্রথমে প্রকৃতির বশে যে ভাবে প্রতিক্রিয়া করে তাহা হইতে স্বতন্ত্র ও উন্নত ভাবে প্রতিক্রিয়া করিতে শিক্ষা দিয়া কোন সহজবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও উন্নত করা যায়। যথা, কোন খাদ্য দ্রব্য দেখিলে শিশু প্রথমে ছুটিয়া গিয়া তাহা গ্রহণ করিতে চাহে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাইলে সে অপেক্ষা করিতে এবং সংযত ভাবে খাদ্য গ্রহণ করিতে শিখে। সেইরূপ হাতে ধরার প্রবৃত্তিকে মার্জিত করিয়া পর্যবেক্ষণ প্রবৃত্তিতে পরিণত করা যায়; কৌতূহল প্রবৃত্তিকে মার্জিত করিয়া অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা প্রবৃত্তিতে পরিণত করা যায়; আত্মপ্রতিষ্ঠা ও যোধনপ্রবৃত্তিকে মার্জিত করিয়া প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তিতে পরিণত করা যায়; নিজস্ব করার প্রবৃত্তিকে মার্জিত করিয়া সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা, তৈয়ার করা ও উপার্জন করার প্রবৃত্তিতে পরিণত করা যায়।

সহজ বৃত্তি ও শিক্ষা

শৈশবে প্রথমে সহজ বৃত্তিগুলিরই উন্মেষ হয় এবং তাহারা সতেজ থাকে, বিভিন্ন মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশ সময়-সাপেক্ষ। তাই **সহজবৃত্তিগুলিকে ভিত্তি করিয়াই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়।** বস্তুতঃ সহজবৃত্তি-গুলিই শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রচেষ্টার উৎস। সুতরাং তাহাদের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়াই শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায়। মনীষী রুশো বলিয়াছেন, **"প্রকৃতির অনুসরণ কর।" শিশুর সহজবৃত্তিগুলিই তাহার প্রকৃতি নির্দেশ করে** এবং তাহার স্বাভাবিক কর্মস্রোতের খাত (channel) নির্দিষ্ট করে। সুতরাং শিশুর শিক্ষাকার্য এই স্বাভাবিক খাতে পরিচালিত না হইলে ইহার দ্বারা শিশুর বিকাশের সাহায্য না হইয়া বরং তাহার পথে বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। শুধু শৈশবে নহে, আজীবন মানুষ তাহার প্রকৃতি ও অভ্যাস দ্বারা পরিচালিত হয়। সহজ বৃত্তির সাহায্যেই প্রথমটি নির্ধারণ করা যায় এবং দ্বিতীয়টি গঠন করা যায়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন সহজবৃত্তির প্রয়োজন মত উন্মেষ হয়। সুতরাং **সকল স্তরের শিক্ষায় সহজবৃত্তিগুলির সদ্ব্যবহার করা যায়।** ইহা ছাড়া সহজবৃত্তিগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই সহজে অনেক সু-অভ্যাস গঠন করা যায়।

সর্বোপরি সহজ বৃত্তির সাহায্যেই নানা বিষয়ে শিশুর অনুরাগ সৃষ্টি করা যায়। কেননা সহজ বৃত্তির প্রভাবে যে সকল কর্মে শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে সেই সকল কর্ম প্রবৃত্তির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইলে পাঠে শিশুর অনুরাগ জন্মে ও তাহাতে সে মনোযোগ দেয়। যথা,—শিশুর খেলা প্রবৃত্তি খুব প্রবল। সুতরাং খেলার আকারে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহার প্রতি শিশুর প্রবল অনুরাগ জন্মিবে। শিশুর অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি প্রবল। সুতরাং কোন বিষয়ে শিশুর ঔৎসুক্য জাগাইতে পারিলে শিশু প্রবল অনুরাগের সহিত তাহার জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত হইবে। শিশুর অনুকরণ প্রবৃত্তি প্রবল। সুতরাং ভাল আদর্শ তাহার সামনে স্থাপন করিলে তাহার অনুকরণ করিয়া বা অভিনয় করিয়া সে আনন্দের সহিত শিক্ষা করিবে।

শিক্ষাদান কার্যে সহজবৃত্তিগুলির ব্যবহারের জন্য প্রথমে (১) শিশুর কি কি সহজবৃত্তি প্রবল এবং কোন্ বয়সে তাহাদের উন্মেষ হয় তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। তাহার পর (২) যে বয়সে যে যে সহজবৃত্তির উন্মেষ হয় এবং যখন তাহারা সতেজ থাকে তখন তাহাদের সদ্ব্যবহার করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) সহজবৃত্তিগুলি যখন সতেজ থাকে তখন তাহাদের প্রচুর ব্যবহার করিয়া কতকগুলি সু-অভ্যাস গঠন করিতে হইবে। (৪) অপর দিকে প্রত্যেক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় দেখিতে হইবে যে তাহাতে কি কি সহজবৃত্তির ব্যবহার হইতে পারে এবং তাহাদের ব্যবহার করিয়াই সেই বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিশুর প্রধান প্রধান সহজবৃত্তির ব্যবহার ও বিকাশ সাধন

পূর্বে সহজবৃত্তিগুলির তালিকা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলগুলি সমান প্রয়োজনীয় নহে এবং সকলগুলি বিকাশের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য যে সকল সহজবৃত্তির বিশেষ সাহায্য লইতে হয় এস্থলে কেবল তাহাদেরই বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) **অনুকরণ-প্রবৃত্তি—শিশুর অনুকরণ-প্রবৃত্তি খুব প্রবল।** বস্তুতঃ প্রথমে কেবল অনুকরণ-প্রবৃত্তির সাহায্যেই সে জীবন ধারণ করে ও শিক্ষা লাভ করে। **তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত সে কেবল প্রবৃত্তিমূলক** (instinctive) **অনুকরণ করিতে পারে।** সে যাহা দেখে তাহাই যন্ত্রের ন্যায় অনুকরণ করে, ইহাতে তাহার ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার হয় না; সুতরাং এই বয়সে শিশুর যে সকল বিষয় শিক্ষা করা উচিত, শিশুর মাতা বা ধাত্রী তাহার সামনে কেবল সে সকল বিষয় স্থাপন করিবেন। যথা,—তাঁহারা সুস্পষ্টস্বরে ছোট ছোট শব্দ বলিয়া শিশুকে বিশুদ্ধভাবে কথা বলিতে শিক্ষা দিতে পারেন, সুমিষ্ট স্বরে গান করিয়া শিশুর মধ্যে সঙ্গীত-প্রবৃত্তি জাগাইতে পারেন, সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিয়া ও রাখিয়া শিশুর অন্তরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার স্পৃহা জাগাইতে পারেন।

তিন বৎসর বয়সে শিশুর মধ্যে অভিনয় প্রবৃত্তি জাগে এবং তখন হইতে সে **অভিনয়ের আকারেই অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে।** সে অন্যের কথা শুনিয়া বা কাজ দেখিয়া তাহার অভিনয় করে। পিতা বা গুরু মহাশয় সাজিয়া অন্য শিশুদের শাসন করিবার ভান করে; রাজা বা সেনাপতি সাজিয়া সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধ করিবার ভান করে; মেয়েরা মা সাজিয়া সন্তান-পালনের অভিনয় করে। তাই পুতুল-খেলাই এই বয়সের শিশুর প্রধান কাজ হইয়া পড়ে। কেহ কেহ ইহাকে একটা মন্দ অভ্যাস মনে করিয়া ইহা দমন করার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহা করা কিছুতেই উচিত নহে। কারণ এই অভিনয়ের ভিতর দিয়া শিশু অনেক কিছু শিখিতে পারে। সুতরাং ইহা দমনের চেষ্টা না করিয়া বরং তাহাকে নানা অভিনয় করার সুযোগ এবং উৎসাহ দেওয়া উচিত। তবে অজ্ঞতাবশতঃ শিশু যাহাতে খারাপ কাজের অভিনয় না করিয়া সু-শিক্ষাপ্রদ অভিনয় করে তাহাই দেখিতে হইবে।

৫।৬ বৎসর বয়সে ইচ্ছা-শক্তির কিছু বিকাশ হইলেই শিশু তাহার ব্যবহার করিয়া অর্থাৎ **চেষ্টা করিয়া অন্যের কাজ অনুকরণ করিতে পারে** এবং তাহার সাহায্যেই নানা বিষয় শিক্ষা করিতে পারে। সে তখন অনুকরণ করিয়াই সুন্দর লেখা লিখিতে পারে, বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে পারে,

উদাহরণের সাহায্যে অঙ্ক করিতে পারে, অনুকরণ করিয়াই হস্তশিল্প বা চিত্রাঙ্কন করিতে পারে। সুতরাং **এই বয়সে প্রধানতঃ স্বৈচ্ছিক অনুকরণের সাহায্যেই তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে**। এইজন্য কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে তাহা শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা প্রয়োজন। উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষা দিতে গেলে শিশু স্বৈচ্ছিক অনুকরণ করিবে না। কোন বিষয় সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল জাগাইতে পারিলেও সে স্বৈচ্ছিক অনুকরণ করিবে।

১০।১২ বৎসরের পর শিশুর ভাববৃত্তি প্রবল হয়। তাই এই বয়স হইতে **যৌবনোন্মুখ অবস্থা পর্যন্ত সে আবেগের সহিত আদর্শের অনুকরণ করে** এবং তাহাদ্বারা তাহার চরিত্র খুব বেশি প্রভাবিত হয়। সুতরাং এই বয়সে তাহার সামনে যত ভাল আদর্শ ধরা যায় তাহার জীবন ও চরিত্র ততই মহৎ হয়। ইহার পরও যে সে আদর্শের অনুকরণ করে না তাহা নহে। কিন্তু তখন তাহার বিচার-শক্তি বিকশিত হওয়ায়, সে আদর্শেরও বিচার করিয়া কাজ করে এবং তাহা করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। কারণ বেশী বয়সেও অন্ধভাবে অনুকরণ করিতে অভ্যস্ত হইলে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে না।

(২) কৌতূহল

শিশুর কৌতূহল প্রবৃত্তি খুব স্বাভাবিক। সে এই বিচিত্র জগতে নূতন আগন্তুক ; তাহার চারিপার্শ্বস্থ সকল জিনিষই তাহার নিকট কুহেলীপূর্ণ ; সে তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চাহে। তাই সে সর্বদা "এটা কি", "ওটা কি" ব "ইহা কেন" প্রশ্ন করিতে থাকে ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্তিবোধ না করিয়া বরং এইরূপ প্রশ্ন করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং শিশুর বিকাশ অনুযায়ী উত্তর দিয়া তাহার জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত। কারণ কৌতূহলই জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত করে, তাই কৌতূহলকে জ্ঞানের প্রসূতি বলা হয়। কৌতূহল না জন্মিলে কোন বিষয়ে আসক্তি জন্মিতে পারে না এবং আসক্তি না জন্মিলে শিশু তাহাতে মনোযোগ দিতে পারে না। সুতরাং শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য তাহার কৌতূহল প্রবৃত্তির সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যে **বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে** তাহার সম্বন্ধে শিশুর **কৌতূহল জাগরিত** করিতে হইবে। নূতনত্ব

এবং বৈচিত্র্যই কৌতূহলের উদ্রেক করে। সুতরাং নূতন নূতন জিনিষ বা বিষয় শিশুর সামনে স্থাপন করিয়া বা পুরাতন জিনিষ বা বিষয়ের নূতন নূতন দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া শিশুর কৌতূহল সৃষ্টি করিতে হইবে। বৈচিত্র্যের মধ্যেও কিছু-না-কিছু নূতনত্ব থাকে; সুতরাং পাঠে বৈচিত্র্য থাকিলেও কৌতূহলের সৃষ্টি হইবে।

তবে কৌতূহলকে শৃঙ্খলাপূর্ণ করা এবং সুপথে পরিচালিত করা প্রয়োজন। কোন কোন শিশু একটার পর একটা প্রশ্ন করিতে থাকে, কিন্তু তাহার কৌতূহল তৃপ্ত করিতে বা জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করে না। এক বিষয়ে কৌতূহল সম্পূর্ণ চরিতার্থ না করিয়া শিশুকে অন্য বিষয়ে ধাবিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রথম প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা করে নাই ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ভাল নহে। ইহা ছাড়া শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিজ চেষ্টায় তাহার প্রশ্নের উত্তর পাইতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। সকল সময় তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ইঙ্গিতের সাহায্যে তাহাকে সমস্যার সমাধান করিতে সাহায্য করা উচিত। সর্বশেষ কৌতূহলকে বিকশিত ও মার্জিত করিয়া প্রবল অনুসন্ধিৎসা বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবৃত্তিতে পরিণত করিতে পারিলে সারাজীবনই তাহা জাগরিত রাখা যায় এবং তাহার সাহায্যে শিক্ষালাভ করা যায়। বস্তুতঃ যাহার কৌতূহল প্রবৃত্তি প্রবল তাহার নিকট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা অফুরন্ত জ্ঞানের উৎস। যাহার কৌতূহল নাই সে চোখ থাকিতেও অন্ধ, কান থাকিতেও বধির।

(৩) **ক্রীড়া-প্রবৃত্তি**—শিশুগণ স্বভাবতঃই চঞ্চল। কেবল নিদ্রার সময় ব্যতীত তাহারা এক মুহূর্তও চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের এই স্বাভাবিক চঞ্চলতা সাধারণতঃ খেলার ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। হাঁটিতে শিখিবার পূর্বেও শিশুগণ হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতে থাকে। হাঁটিতে শিখিলেই তাহারা সর্বদা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করিয়া খেলা করিতে চাহে। তাহাদের এই স্বাভাবিক ক্রীড়া প্রবৃত্তিকে দমন করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। কারণ ইহা তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের যথেষ্ট সাহায্য করে। বরং মনীষী রুশোর উপদেশ মত প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া

শিক্ষা দিতে হইলে অল্প বয়সের শিশুগণকে প্রধানতঃ খেলার ভিতর দিয়াই শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাই ফ্রোবেল ও ডাঃ মন্তেসরী নানাবিধ খেলার সাহায্যে ছোট ছোট শিশুগণকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে কেবল লাফালাফি ছুটাছুটি করিলেই শিশুর শিক্ষালাভ হইবে না। কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া খেলিতে দিলেই শিশুর যথেষ্ট শিক্ষা হইবে। পরে দলবদ্ধ হইলে নিয়মানুযায়ী খেলিলে অধিকতর শিক্ষালাভ করিবে। অপর দিকে খেলার আকারে বিভিন্ন কাজ করিতে বা বিষয় শিক্ষা করিতেও দেওয়া যাইতে পারে। যথা,—শব্দ-গঠন (word-building), কাগজ কাটা ও কাগজের জিনিষ নির্মাণ, দ্রব্যের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগের সমস্যা পূরণ, কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত সহ নৃত্য, ঐতিহাসিক অভিনয় ইত্যাদি। (খেলার সাহায্যে শিক্ষা সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা হইবে)।

(৪) আত্মবোধ, আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মাবমাননা প্রবৃত্তি (Self-consciousness, Self-assertion and Self-abasement)।

শিশু স্বভাবতঃই স্বার্থপর। সে কেবল নিজের সুখ-সুবিধা ও আরাম লাভের জন্য কার্য করে। তাহার মায়ের উপর সে তাহার একান্ত অধিকার দাবী করে। তাহার নিজের সুন্দর জামায় একটু ময়লা লাগিলে সে কাঁদিয়া আকুল হয়, কিন্তু তাহার ভাই-এর জামাটি ছিন্ন হইলেও সে বিশেষ দুঃখবোধ করে না; শিক্ষক শিশুর এই আত্মবোধ বা আমিত্ব জ্ঞানকে দমনও করিতে পারেন না, অবহেলাও করিতে পারেন না। ইহা তাহার স্বভাব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার সদ্ব্যবহার করিয়াও তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। কেননা নিজের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্য তাহার সামনে ধরিয়া শিশুকে অনেক কঠিন কাজেও নিয়োজিত করা যায়। পরে ক্রমশঃ তাহার আমিত্বের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া তাহাকে পরের জন্যও ভাবিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। যথা,—তাহাকে ক্রমশঃ নিজ পিতামাতা, ভাইবোন, সহপাঠী, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী প্রভৃতিকে আপনার বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা দেওয়া যায়; এইরূপে আত্মবোধ প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা যায়।

শিশুর আত্মবোধ বা আমিত্ব জ্ঞানই পরে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকার ধারণ করে। শিশু নিজেকে অন্য হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং অন্যের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে। শিশুর এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকেও দমন করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত নহে। কারণ **আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি হইতেই আত্ম-বিশ্বাস জন্মে** এবং আত্ম-বিশ্বাস না থাকিলে সে কোন কাজে সফলতা লাভ করিতে পারে না। আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি প্রভাবেই শিশু অন্যের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয় এবং প্রতিযোগিতার দ্বারাই তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হইতে পারে। সুতরাং শিক্ষক শিশুর এই আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির সুযোগ লইয়া অন্যের সহিত নানা বিষয়ে তাহার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিবেন। শিশুকে **আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির সাহায্যে আত্মনির্ভরতা এবং আত্মসম্মানবোধও শিক্ষা দেওয়া যায়।** শিশুকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে সে যদি আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তবে সে অন্যের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারে না বা নিজের পদমর্যাদার হানিকর কোন কাজ করিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির সদ্ব্যবহার করিয়া শিশুকে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়।

আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি যেমন শিশুর যথেষ্ট উপকার করিতে পারে, তেমন অপকারও করিতে পারে। কারণ **আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির আতিশয্য হইলে তাহা আত্মাভিমান বা আত্মশ্লাঘায় পরিণত হয়।** ইহাতে শিশু বৃথা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া শিক্ষক ও গুরুজনের অবাধ্য হইতে পারে এবং নিজের উন্নতি সাধনের জন্য যত্ন না করিতে পারে। শিক্ষককে চতুরতার সহিত ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বালকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দিয়া শিক্ষক তাহার শক্তির সীমা সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিতে পারেন। ইহা ছাড়া **শিশুর যেমন আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি আছে তাহার সেরূপ আত্মাবমাননা প্রবৃত্তিও আছে।** সে যখন বুঝিতে পারে যে অন্য কেহ প্রকৃতই তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ তখন সে তাহার নিকট নত হয় এবং তাহার নেতৃত্বে কাজ করিতে প্রস্তুত হয়। এই প্রবৃত্তির প্রভাবেই শিশু তাহার সঙ্গীদের মধ্যে যে শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ তাহাকে

নেতা নির্বাচন করে এবং স্বেচ্ছায় পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্যান্য গুরুজনের আদেশমত কার্য করে। বস্তুতঃ **আত্মাবমাননা প্রবৃত্তিই শিশুকে অন্যের নিকট শিক্ষা করিতে প্রস্তুত করে** এবং এইরূপে তাহার যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করে। সুতরাং একদিকে যেমন শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া তাহাকে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত, সেরূপ তাহার আত্মাবমাননা প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া তাহাকে অন্যের নেতৃত্বে কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তবে **আত্মাবমাননা প্রবৃত্তির আতিশয্য** হইলেও শিশুর অনিষ্ট হয়। কারণ, ইহা হইলে সে **আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে** এবং আপনাকে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অকর্মণ্য বলিয়া ভাবিতে শিখে। এইরূপ মনোভাব লইয়া শিশু কোন কার্যে সফলকাম হইতে পারে না। ইহার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শিশুর কতকগুলি ভাল গুণের প্রশংসা করিয়া এবং তাহা হইতে নিকৃষ্ট শিশুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দিয়া তাহার আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

(৫) ভয় ও যোধন প্রবৃত্তি

নিজের কোন অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা হইতেই ভয়ের উদ্রেক হয়। সুতরাং আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির সহিত ভয় প্রবৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এত অল্প বয়সে ভয়োদ্রেকের প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইহাকে সহজাত বলিতে হয়। কেহ হঠাৎ কোন শব্দ করিলে, নাড়িলে বা বিছানা ধরিয়া টানিলে নবজাত শিশুও ভয় পায়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের কারণের পরিবর্তন হয়।

ভয় প্রবৃত্তির অপকারিতা

ভয়োদ্রেক হইলে স্নায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় ও চিন্তাশক্তি হ্রাস পায়। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিলে শিশু আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং আত্মচেষ্টায় কোন কাজ করিতে সাহস করে না। ভয়ের প্রভাবে শিশু মিথ্যা, ছলনা, কপটতা প্রভৃতির আশ্রয় নেয় এবং ফলে তাহার নৈতিক অবনতি হয়। অতিরিক্ত ভয়োদ্রেক হইলে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রের কার্য বাধা পায় এবং মানুষের কার্যশক্তি প্রায় লোপ পায়। এমন কি ইহার দ্বারা অনেক গুরুতর পীড়ারও সৃষ্টি হইতে দেখা যায়।

ভয়ের প্রতিকার

ভয়ের সাহায্যে কোন কার্যে প্রবৃত্ত করা বা শাসন করা সহজ হইলেও ইহার অপকারিতার কথা চিন্তা করিয়া শিক্ষকের পক্ষে সহজে ইহার সাহায্য গ্রহণ করা উচিত নহে, বরং ইহা যাহাতে বিকশিত না হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে। যথা,—

(১) ভয় প্রবৃত্তি জাগরিত হওয়ার কারণগুলি দূর করাই ইহার প্রথম ও প্রধান প্রতিকার। শারীরিক দোষে শিশু ভীরু হইলে, চিকিৎসা, পুষ্টিকর খাদ্য ও ব্যায়ামের দ্বারা শারীরিক দুর্বলতা দূর করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

(২) কোন জিনিষ বা প্রাণী দেখিয়া অকারণে ভয় পাইলে, একটু একটু করিয়া তাহার সহিত সুপরিচিত হইতে দিলে অকারণ ভয় চলিয়া যাইবে। যথা,—কুকুর বা বিড়াল দেখিয়া ভয় পাইলে ক্রমশঃ শিশুকে বিড়াল বা কুকুর দেখিতে, তাহার নিকট যাইতে, তাহাকে হাতে ধরিতে অভ্যস্ত করিলে তাহার অকারণ ভয় চলিয়া যাইবে।

(৩) অল্প বয়সে ভয় প্রদর্শন বা ভয়োদ্দীপক ইঙ্গিত যত কম করা যায় ততই ভাল।

(৪) কোন প্রকার অন্ধ সংস্কার বা অজ্ঞতা হইতে ভয়োদ্রেক হইলে তাহা দূর করিলেই ভয়ও দূর হইবে।

(৫) সাহসী লোকের উদাহরণের প্রভাবেও ভয়-প্রবণতার কিছু প্রতিকার হয়।

(৬) শিশুকে প্রয়োজনাতিরিক্ত আশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। বরং সাহসের সহিত শারীরিক বিপদের সম্মুখীন হইতে উৎসাহ দিয়া এবং তাহা করার জন্য পুরস্কার দিয়া ভয়-প্রবৃত্তি দুর্বল করা যায়।

(৭) ভয়োদ্দীপক জিনিষ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জন্মাইতে পারিলেও ক্রমশঃ ভয় দূর হয়। ইহা ছাড়া অন্যের সেবা, অন্যকে রক্ষা করা ইত্যাদি মহৎ কাজে প্রবৃত্তি জন্মাইলে তাহাদের জন্য শারীরিক ভয়ও উপেক্ষা করিতে শিক্ষা হয়।

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন ভয় প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায় না। তাহা ছাড়া কেহ কেহ বলেন যে ছোট শিশুকে শাসন করিবার জন্য এবং সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজনও আছে। তাই ভয়-প্রবৃত্তি নির্মূল করার অসম্ভব প্রয়াস না পাইয়া তাহারা ভয়কে নিয়ন্ত্রিত ও মার্জিত করিতে পরামর্শ দেন। যথা,—শিশুর শারীরিক কষ্টের ভয়কে মার্জিত করিয়া পিতামাতা ও শিক্ষকের ভালবাসা হারাইবার ভয়, কোন প্রিয় বস্তু হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়, সম্মান হানির ভয়, ধর্মভয় ইত্যাদিতে পরিণত করিলে ইহার দ্বারা অপকার না হইয়া যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।

যোধন-প্রবৃত্তি। সুস্থ সবল শিশুমাত্রেরই অন্য শিশুর সহিত মারামারি করিতে, এমন কি কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি হয়, ইহাকেই যোধন প্রবৃত্তি বলে।

ইহাও আত্ম-রক্ষা প্রবৃত্তি-প্রসূত। কোন শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা হইলে একদিকে যেমন ভয়ের উদ্রেক হয় এবং পলায়ন প্রবৃত্তি হয়, অপর দিকে **যোধন প্রবৃত্তির**ও উদ্রেক হয়। অবশ্য ভয়ের কারণ ছাড়াও যোধন প্রবৃত্তি হইতে পারে। কোন **প্রবৃত্তিমূলক কার্যে বাধা পাইলেও যোধন প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়**। ইহার দ্বারা শিশুর আত্ম-বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, শারীরিক প্রতিযোগিতায় উৎসাহ পায়, শারীরিক শক্তি অর্জনে প্রবৃত্তি জন্মে, অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিতে আগ্রহ হয় এবং শিশু জয়ের আনন্দ ভোগ করিতে শিখে। সুতরাং এই প্রবৃত্তিও দমনের চেষ্টা করা উচিত নহে। কারণ অল্প বয়সে শিশুর এই প্রবৃত্তি দমন করিলে পরিণত বয়সে সে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া নৈতিক, সামাজিক বা জাতীয় কর্তব্য পালন করিতে পারে না। এই প্রবৃত্তির পুষ্টি সাধনের জন্য শিশুকে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাহার সমান শক্তি-সম্পন্ন বালকের সহিত **শারীরিক প্রতিযোগিতা** করিতে দেওয়া উচিত। নানা প্রকার **প্রতিযোগিতামূলক খেলার দ্বারাও** ইহা সংযত ও পুষ্ট হয়। তবে এই প্রবৃত্তিবশে শিশু যেন তাহার সহপাঠী দুর্বল বালকের গুরুতর শারীরিক

ক্ষতি না করে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কোন কোন শিশুর যোধন প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠার কারণ তাহার শারীরিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ না পাওয়া বা তাহার প্রবৃত্তিমূলক কার্যে সর্বদা বাধা পাওয়া। সুতরাং এই দুই কারণ দূর করিয়াও তাহাকে সংযত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করা বলবানের অকর্তব্য ও মর্যাদা হানিকর এই কথা শিশুকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিলে সে সংযত হইবে। এই প্রবৃত্তিকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য উদারতার সহিত নিজের অধিকার নির্ধারণ করিতে, কেবল নিজের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যুদ্ধ না করিয়া অন্যের অধিকারের জন্যও যুদ্ধ করিতে, দলগত স্বার্থের জন্য নিজ অধিকার ছাড়িয়া দিতে শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে।

(৬) কর্মপ্রবৃত্তি

শিশুমাত্রেরই একটা প্রবল স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তি আছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই শিশু হাত পা নাড়িতে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বেশী শক্তি লাভ করে এবং অধিকতর অঙ্গ-সঞ্চালন করিতে থাকে। শিশুর এই অঙ্গ-সঞ্চালন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত এবং ইহার দ্বারাই তাহার শারীরিক বিকাশ হয়। সুতরাং শিশুকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অনিষ্টকর। ক্ষুদ্র শিশুকে পূর্ণ মানুষ করিয়া তুলিতে চাহিলে শুধু যে শৈশবের মাধুর্য ও আনন্দ নষ্ট হইবে তাহা নহে, তাহার জীবনীশক্তি হ্রাস পাইবে এবং তাহার বিকাশের প্রবল বাধা হইবে।

তবে শিশুর অঙ্গ-সঞ্চালন প্রথমে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন ও অনিয়ন্ত্রিত থাকে। শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রয়োজনীয় মানসিক বিকাশ হইলে সে ক্রমশঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে এবং অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করিতে শিখে। এই সময়ে অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ কার্যে মা, ধাই বা শিক্ষক যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। সে যখন দৌড়াইতে বা লাফাইতে শিখে তখন তাহার জন্য নানারূপ খেলার ব্যবস্থা করিয়া তাহার অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সহজ সহজ নৃত্য শিক্ষা দিলেও এই কার্যে যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে। **উদ্দেশ্যমূলক অঙ্গ-সঞ্চালনই ইহার পরের সোপান।** খেলার মধ্য দিয়া

ইহারও সূচনা করা যায়। তাহার পর সহজ সহজ শারীরিক কাজ করিতে বা **হস্তশিল্প** শিক্ষা দিলে **উদ্দেশ্যমূলক অঙ্গ-সঞ্চালন** কার্যে সে অধিকতর দক্ষতা **অর্জন করিবে**। অবশ্য শিশুর বিকাশের সহিত মিল রাখিয়াই তাহাকে অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ কার্য শিক্ষা দিতে হইবে।

(৭) হাতে ধরিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি

অঙ্গ-সঞ্চালনের ন্যায় শিশু প্রত্যেক জিনিষ হাতে ধরিতে, টানিতে, টিপিতে, চাপ দিতে, ঘুরাইতে, বা ছুঁড়িয়া ফেলিতে চাহে। তাহার এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরও বাধা না দিয়া যখনই সম্ভব তাহাকে কোন জিনিষ **হাতে ধরিয়া** দেখিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে তাহার হাতের ব্যবহার শিক্ষা হইবে এবং বিভিন্ন জিনিষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। কাহারও তত্ত্বাবধানে তাহাকে এই কাজ করিতে দিলে, সে জিনিষটি নষ্ট না করিয়া তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে ও জ্ঞান অর্জন করিতে পারিবে। পাঠদানের সময় যে সকল জিনিষ ব্যবহার করা যায় যতটা সম্ভব বালক-বালিকাগণকে সে-গুলি হাতে ধরিয়া দেখিতে দিলে তাহারা পাঠে অধিকতর সহযোগিতা করিবে।

(৮) নিজস্ব করার প্রবৃত্তি (Ownership)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে **শিশুর আমিত্ব জ্ঞান খুব বেশী**। ইহার প্রভাবে সে অন্য বস্তু, প্রাণী বা মানুষকে নিজস্ব করিতে চাহে। "আমার মা," "আমার জামা," "আমার পুতুল" প্রভৃতি কথা সর্বদা তাহার মুখে শুনা যায়। তাহার এই নিজস্ব করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার সাহায্যেও তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায়। কতকগুলি জিনিষ তাহার নিজস্ব বলিয়া ঘোষণা করিলে সে তাহাদের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করে এবং তাহাদের অধিকতর যত্ন করে। সেইজন্য প্রত্যেক শিশুর কাপড়, জামা, খেলনা, পুতুল, পুস্তক প্রভৃতি স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া ভাল। ২।৩ জন শিশুকে একটা খুব চিত্তাকর্ষক খেলনা বা পুতুল দিলেও তাহারা তাহার বিশেষ যত্ন করিবে না। কিন্তু কোন জিনিষ নিজস্ব বলিয়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর উপর তাহা **যত্নপূর্বক রক্ষা করার দায়িত্বও** দিতে হইবে।

তাহার পর তাহাকে কোন জিনিষ নিজস্ব বলিয়া পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। প্রথমে সে কোন ভাল কাজ করিয়া বা ব্যবহার করিয়া পুরস্কার স্বরূপ কোন জিনিষ পাইবার চেষ্টা করিতে পারে। তাহার পর সে নানা জিনিষ সংগ্রহ করিয়া নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে। প্রকৃতি পাঠ ও প্রাথমিক ভূগোল শিক্ষায় নানা জিনিষ সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে। নিজস্ব করার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া **সংগ্রহ করার প্রবৃত্তি** জন্মে এবং তাহা আজীবন বলবৎ থাকিতে পারে। সে ক্রমশঃ সুন্দর সুন্দর জিনিষ, টিকেট, ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করাকে নিজের একটা অত্যন্ত প্রিয় কার্য (Hobby) করিতে পারে। পরে সে বস্তু সংগ্রহ ছাড়িয়া দিয়া **মানসিক খাত্ত সংগ্রহ কার্যেও প্রবৃত্ত হইতে পারে।** যথা,—সুন্দর সুন্দর কবিতার উদ্ধৃত অংশ (Quotation), ধারণা বা চিন্তা, উপদেশ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার মানসিক সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে পারে।

সংগ্রহ করা ছাড়া কোন **জিনিষ তৈয়ার করিয়াও নিজস্ব** করা যায় এবং শিশুকে তাহা করিতেও উৎসাহ দেওয়া যায়। শিশুকে প্রথমে মাটির জিনিষ, কাঠের জিনিষ প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া নিজস্ব করিতে দেওয়া যায়। তাহার পর সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা, বাক্য রচনা করা, কবিতা রচনা করা ইত্যাদি কাজে উৎসাহ দিয়া তাহার সৌন্দর্যানুরাগ, চিন্তাশক্তি ও রচনাশক্তি বৃদ্ধি করা যায়। এইরূপ তৈয়ার করার কাজ করিয়া সে যে কেবল নিজস্ব করার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার **সৃষ্টি করার প্রবৃত্তিও পুষ্ট হইবে** এবং সে সৃষ্টি করার আনন্দও উপভোগ করিতে পারিবে। কারণ নিজস্ব করার ন্যায় সৃষ্টি করাও শিশুর একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং প্রথম হইতে দ্বিতীয়টা শ্রেষ্ঠতর প্রবৃত্তি। সুতরাং যখনই সম্ভব শিশুকে নানা জিনিষ তৈয়ার করিতে দিতে হইবে, ইহাতে সে আনন্দও পাইবে এবং তাহার শিক্ষাও হইবে।

সর্বশেষ নিজ অর্জিত অর্থে ক্রয় করিয়াও নিজস্ব করা যায়। খুব অল্পবয়স্ক শিশু অর্থোপার্জন করিতে পারে না। তাহার পিতামাতা পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে সময় সময় কিছু অর্থ দিতে পারেন এবং সেই অর্থ দিয়া সে জিনিষ কিনিতে পারে। তবে শিশুর নিজহস্তে অর্থ দেওয়া ভাল নহে। সে

তাহার অপব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু একটু বয়স্ক হইলেই তাহাকে সহজ সহজ কাজ করিয়া কিছু অর্থোপার্জন করিতে এবং তাহার দ্বারা কোন জিনিষ ক্রয় করিয়া নিজস্ব করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

অল্পবয়স্ক শিশুদের ব্যক্তিগত মালিক হওয়ার প্রবৃত্তির উৎসাহ দিলেও, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের মধ্যে **দলগত মালিক** হওয়ার প্রবৃত্তিও জাগাইতে হইবে। পরিবারের বালক-বালিকাদিগকে যেমন স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের নিজস্ব করিয়া কতকগুলি জিনিষ দিতে হইবে, সেরূপ তাহাদের সকলের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি জিনিষও দেওয়া উচিত। যথা,—দলগত খেলার জিনিষ, ফুল-বাগান ইত্যাদি। তাহাদিগকে এই সকল জিনিষ মিলিত ভাবে যত্ন করিতে ও রক্ষা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। বিদ্যালয়ে পঠনের সময়ে এক এক শ্রেণীর নিজস্ব কতকগুলি জিনিষ দিয়া সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমস্ত ছাত্রের উপর দেওয়া যাইতে পারে।

কোন জিনিষে নিজের বা দলের অধিকার স্থাপন করিতে উৎসাহ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে **শিশুকে অন্যের অধিকার মানিয়া চলিতেও শিক্ষা দিতে হইবে**। সে যেমন নিজের জিনিষটিকে সম্পূর্ণ নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে চাহে, অন্যেও যে তাহাদের জিনিষের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে চাহে, এই কথা তাহাকে অল্প বয়সেই বুঝাইয়া দিতে হইবে। পূর্ববর্ণিত কোন উপায়ে সে যে জিনিষ নিজস্ব করিতে পারে নাই, সেই জিনিষে তাহার অধিকার নাই, ইহা তাহাকে যত শীঘ্র সম্ভব হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে। তাহা হইলেই সে কখনও অন্যের জিনিষে লোভ করিবে না, তাহা আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিবে না।

(৯) মনোযোগ, অনুমোদন বা প্রশংসালাভের প্রবৃত্তি

খুব ছোট শিশুর মধ্যেও মনোযোগ, অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের প্রবৃত্তি দেখা যায়। সে প্রথমে নানা ভাবে তাহার মাতার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে এবং মা তাহার প্রতি মনোযোগ দিতেছেন দেখিলে সন্তোষ লাভ করে। আরও বয়স হইলে সে তাহার মাতার বা পরিবারস্থ অন্য বয়স্ক লোকের **অনুমোদন বা প্রশংসা লাভ** করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। সে কোন নূতন কথা

বলিয়া, নূতন জিনিষ দেখাইয়া বা নূতন কাজ করিয়া তাহাদের অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের চেষ্টা করে। বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে সে প্রথমে শিক্ষকের অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের জন্য লালায়িত হয়, পরে **যৌবনোন্মুখ বয়সে সে নিজ দলের বা দলের নেতার অনুমোদন ও প্রশংসা-লাভের জন্যও ব্যগ্র হয়।**

শিশুর সহজাত এই অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের প্রবৃত্তিও তাহার শিক্ষা কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। মাতার বা শিক্ষকের অনুমোদন বা প্রশংসা-সূচক মৃদুহাসি বা 'বেশ,' 'চমৎকার,' 'সুন্দর' প্রভৃতি একটা প্রশংসা-বাচক শব্দ তাহাকে যতটা কর্মপ্রেরণা দেয় আর কিছুই তাহা করিতে পারে না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অননুমোদন বা নিন্দার ভয়ে সে অনেক মন্দ কাজ হইতে বিরত হয়। সুতরাং ইহা তাহাকে যেমন কর্মপ্রেরণা দেয় সেরূপ সংযতও করে। এইরূপে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণের সহিত স্নেহ ও ভক্তির বন্ধন স্থাপন করিয়া **অনুমোদন লাভের প্রবৃত্তি ও নিন্দার ভয়ের সাহায্যে তাহাদিগকে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া যায়।** বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তাহাদের সঙ্গী বা সহপাঠিগণের অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের জন্যও লালায়িত হয় এবং তাহার লোভেও যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়। ইহার পরে তাহাদিগকে **সমাজের অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের জন্য প্রস্তুত করিলে,** তাহারা যশ অর্জনের জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া খুব কঠিন কার্যেও আত্ম-নিয়োগ করিতে প্রস্তুত হইবে।

(১০) প্রতিযোগিতা

ছোট ছোট শিশুও একা কাজ না করিয়া সমবয়স্ক শিশুদের সহিত কাজ করিতে ভালবাসে। **এই স্বাভাবিক সঙ্গ-প্রবৃত্তি এবং পূর্ববর্ণিত আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি হইতে পরে প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়।** অন্য হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিবার বা কোন বিষয়ে অন্যকে অতিক্রম করিবার ইচ্ছাই প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তি। কারণ এক সঙ্গে কাজ করিতে গিয়া শিশু অন্যের কাজের সহিত নিজের কাজের তুলনা করিতে শিখে এবং অন্য হইতে ভাল কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে উৎসাহিত হয়। এইরূপে প্রতিযোগিতা

প্রবৃত্তির সৃষ্টি হইলে তখন এই প্রবৃত্তির সাহায্যেই শিশুকে সর্বাপেক্ষা বেশী কর্মপ্রেরণা দেওয়া যায় এবং ইহার প্রভাবেই তাহার সর্বাপেক্ষা বেশী উন্নতি হইতে পারে। বস্তুতঃ মানব সমাজ বা মানব সভ্যতার বর্তমান উন্নতির জন্য আমরা **প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তির** নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণী।

শিক্ষাক্ষেত্রে নানা কার্যে **প্রতিযোগিতার সুযোগ** দিয়া বা ব্যবস্থা করিয়াই আমরা **শিশুগণের দ্রুত বিকাশের** সাহায্য করিতে পারি। কি জ্ঞানলাভ, কি কোন কার্যে দক্ষতা অর্জন, কি খেলা, কি নৈতিক ব্যবহার সমস্ত কার্যেই প্রতিযোগিতার দ্বারা শিশুর যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। প্রতিযোগিতার সুযোগ দেওয়া ছাড়া ইহার **বিশুদ্ধীকরণের বা উন্নতি সাধনের** চেষ্টা করাও দরকার। প্রথমে শিশু শারীরিক কার্যেই বেশী প্রতিযোগিতা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং খেলার মধ্য দিয়াই ইহা প্রকাশ পায়। কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদিগকে নানা মানসিক, নৈতিক ও ধর্ম বিষয়ক কার্যেও প্রতিযোগিতা করিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

অপর দিকে প্রথমে শিশু **ব্যক্তিগতভাবে প্রতিযোগিতা** করিতে পারে। পরে ক্রমশঃ তাহাকে **দলগত ভাবেও** প্রতিযোগিতা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। বিভিন্ন খেলা বা কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া প্রতিযোগিতা করিবার সুযোগ দিতে হইবে। ৭৷৮ বৎসর পর্যন্ত শিশু কেবল ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। তাহার পরই ক্রমশঃ তাহাকে দলগত প্রতিযোগিতা শিক্ষা দেওয়া যায়।

অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার খারাপ ফল

প্রতিযোগিতা যেমন শিশুর যথেষ্ট উপকার করিতে পারে, সেরূপ তাহার অপকারও করিতে পারে। সদ্ভাবে অন্যকে অতিক্রম করিবার (to surpass) জন্য চেষ্টা না করিয়া সে ফাঁকি দিয়া বা অসৎ উপায়ে নিজের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে পারে। ইহা ছাড়া অন্যের কার্যে বাধা দিয়া বা তাহার অনিষ্ট সাধন করিয়াও সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিতে পারে। এইরূপেই প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয় এবং ইহার দ্বারা মানব সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হয়। সুতরাং কোন কার্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার সময়

যেন জয়লাভের জন্য অসদুপায় অবলম্বন করিতে না পারে বা প্রতিপক্ষের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা না করে তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেহ এইরূপ অন্যায় প্রবৃত্তির পরিচয় দিলে তাহাকে প্রতিযোগিতার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে।

প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তির আর একটা মন্দ ফল এই হইতে পারে যে ইহা শিশুকে অন্যের সহিত সহযোগিতা না করিতে উৎসাহ দিতে পারে। কিন্তু দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার প্রয়োজন হয় এমন কার্যে নিয়োগ করিলে এবং **দলগত প্রতিযোগিতা** করিতে শিক্ষা দিলে ইহার প্রতিকার হয়। কারণ সে তখন বুঝিতে পারে যে অন্যের সহিত সহযোগিতা না করিয়া অনেক কাজ করা যায় না এবং নিজ দলের সহিত সহযোগিতা না করিয়া দলগত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে পারে না।

(১১) দলবদ্ধ হওয়ার প্রবৃত্তি

মানব-শিশু মাত্রেরই দলবদ্ধ হওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। খুব অল্প বয়স্ক শিশুকেও কোন ঘরে একা রাখিলে সে কাঁদিতে থাকে। ৪।৫ বৎসর বয়স হইতেই শিশু তাহার সমবয়স্কদের সহিত থাকিতে ভালবাসে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আরও প্রবল হয়। পূর্ণবয়স্ক লোকও দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালবাসে বলিয়া মানুষ সামাজিক জন্তু নামে অভিহিত হয়।

ছোট ছোট শিশুদের দলবদ্ধ হইয়া খেলিতে, নাচিতে, গান করিতে বা কোন কাজ করিতে দিলে তাহারা সেই সকল কাজে অধিকতর উৎসাহ ও আনন্দ পায়। ইহা ছাড়া দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে দিলে তাহারা পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে শিখে, দলের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করিতে শিখে এবং দলের সঙ্গে ভালভাবে মিশিবার জন্য নিজকে অনেকটা সংযত করিতেও বাধ্য হয়।

প্রথমে শিশুরা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া প্রবৃত্তিবশেই দলবদ্ধ হইয়া কাজ করে। ৯।১০ বৎসর হইতে তাহাদিগকে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কাজের

জন্য স্কুলের ছাত্রগণকে লইয়া নানা সংঘ গঠন করা উচিত। বিভিন্ন খেলার জন্য ছাত্রগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য। তাহা ছাড়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে লইয়া সেবা-সংঘ, সাহিত্য-সংঘ, ইতিহাস-সংঘ, ভূগোল-সংঘ, সঙ্গীত-সংঘ, চিত্রবিদ্যা-সংঘ, আমোদ-প্রমোদ-সংঘ, প্রভৃতি গঠন করা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়রূপ একটা প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে তাহার স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার জন্য সহযোগিতা করিয়া কাজ করিতে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হইবে। **ছাত্রজীবনে এইরূপ সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে শিখিলেই তাহারা ভবিষ্যতে সামাজিক জীবন** যাপনের জন্য ও সামাজিক কর্তব্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে।

References

1. Sandiford—Educational Psychology. Chap. VI.
2. Daniel Starch—Educational Psychology. Chap. II.
3. G. H. Thompson—Instinct, Intelligence and Character. Chaps. III, VIII, XVI.
4. Norseworthy and Whitley.—The Psychology of Childhood Chaps. III, IV, V.
5. James S. Ross—Ground-work of Educational Psychology. Chap. IV.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাববৃত্তি

(Feelings)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কোন জ্ঞান হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুখ, দুঃখ, বিস্ময় বা বিরক্তি বোধ হয়। **এই সুখ বা দুঃখ, বিস্ময়, বিরক্তি বোধকেই ভাববৃত্তি বলে।** প্রথমে শিশু কেবল সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে। তাহার পর আত্মরক্ষা ও শরীরপুষ্টির সহিত সম্পর্কযুক্ত ভাববৃত্তিগুলির বিকাশ হয়। যথা,—ভয়, ক্রোধ, বিরোধ, ঈর্ষা ইত্যাদি। সর্বশেষ সুকুমার ভাববৃত্তিগুলি (sentiments) জাগে ; যথা,—প্রেম, সহানুভূতি, সৌন্দর্যজ্ঞান, [illegible]নুরাগ, দেশানুরাগ, ধর্মানুরাগ ইত্যাদি।

আমাদের সকল কাজের সঙ্গেই কোন না কোন ভাববৃত্তি জড়িত থাকে। তাহার ফলে আমাদের মন কখনও সন্তুষ্ট ও শান্ত থাকে, কখনও অসন্তুষ্ট ও অশান্ত হয়। ইহাকেই **মনের সাময়িক অবস্থা** (mood) বলে। কাহারও মনের সাময়িক অবস্থার গড় লইয়াই তাহার **মেজাজ বা মানসিক প্রকৃতি** (temperament) নির্ধারণ করা যায়।

মানুষের মেজাজ বা মানসিক প্রকৃতি কেবল বাহিরের অবস্থার সৃষ্টি নহে। একই অবস্থায় কাহারও মন সন্তুষ্ট ও শান্ত থাকিতে পারে, অপর কাহারও মন অসন্তুষ্ট ও অশান্ত হইতে পারে। কারণ আমাদের মেজাজ বা মানসিক প্রকৃতি আমাদের স্নায়ুপ্রণালীর প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে। সুতরাং আমাদের স্নায়ুপ্রণালী যেমন সহজাত, আমাদের মানসিক প্রকৃতিও সেইরূপ সহজাত বলা যায়।

সহজবৃত্তি ও ভাববৃত্তি

সহজবৃত্তি ও ভাববৃত্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোন অভিজ্ঞতা লাভের ফলে আমাদের যে সুখ বা দুঃখবোধ হয় তাহাই ভাববৃত্তি এবং তাহার ফলে স্নায়ুপ্রণালীর যে স্বাভাবিক ও স্বক্রিয়াশীল কার্য-প্রবৃত্তি বা

প্রতিক্রিয়া প্রবৃত্তি হয় তাহাই সহজবৃত্তি। সুতরাং **উভয়েই স্নায়ুপ্রণালীর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এবং উভয়েই সহজাত**। Mc. Dougallএর মতে প্রত্যেক সহজবৃত্তির সহিত কোন না কোন ভাববৃত্তি জড়িত থাকে এবং বস্তুতঃ **ভাববৃত্তিই স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তির সৃষ্টি করে।**

শিক্ষা ও ভাববৃত্তি—সহজবৃত্তির ন্যায় ভাববৃত্তিও শিক্ষাদান কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করে। শিশুর যাহা ভাল লাগে, যে কাজে সে আনন্দ পায়, সেই কাজ সে আগ্রহের সহিত সম্পাদন করে। সে ফলাফল চিন্তা করিয়া কাজ করে না, আনন্দ লাভের জন্যই কাজ করিতে চাহে। সুতরাং **কোন না কোন ভাববৃত্তি জাগাইয়াই শিশুকে সহজে কোন কর্মে নিযুক্ত করা যায়।** অল্প বয়সে আনন্দ লাভের প্রবৃত্তিই সর্বাপেক্ষা প্রবল থাকে বলিয়া সেই ভাববৃত্তি জাগাইয়া শিশুকে অধিক কর্মরত করা যায়। বিস্ময়, ঔৎসুক্য প্রভৃতি ভাববৃত্তি জাগাইয়াও শিশুকে জ্ঞানার্জনে রত করা যায়। কিছু বয়স হইলে, প্রেম, সহানুভূতি, সৌন্দর্যবোধ, দেশানুরাগ, ধর্মানুরাগ প্রভৃতি সুকুমার ভাববৃত্তিগুলি জাগাইয়া মানুষকে যে কোন কঠিন বা কষ্টদায়ক কাজেও প্রবৃত্ত করা যায় এবং দীর্ঘকাল কার্যরত রাখা যায়। বস্তুতঃ ভাববৃত্তিগুলিই শিশুকে সর্বাপেক্ষা অধিক কর্মপ্রেরণা দেয়। সুতরাং ভাববৃত্তিগুলির সাহায্যে শিক্ষা দিলেই তাহাতে শিশুর পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাইবে। যথা,—পাঠ আনন্দদায়ক হইলে শিশু তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে এবং পাঠে একাগ্র মনোযোগ দিবে। শাস্তির ভয় জাগাইয়াও শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায়, কিন্তু তাহা করা উচিত নহে। কারণ শাস্তির ভয়ে শিক্ষালাভে শিশুর আগ্রহ জন্মে না, বরং বিতৃষ্ণা জন্মে। সুতরাং সে শিক্ষালাভের চেষ্টা না করিয়া শাস্তি এড়াইবার চেষ্টাই করিবে।

ঈর্ষার ভাবকে প্রতিযোগিতায় পরিণত করিয়াও শিশুকে ভাল শিক্ষা দেওয়া যায়। জয়ের গর্ব অনুভব করিতে শিক্ষা দিয়া শিশুকে গুরুতর বাধা অতিক্রম করিতেও উৎসাহিত করা যায়। ভালবাসা ও সহানুভূতির সাহায্যেই শিশুকে সর্বাপেক্ষা বেশী আয়ত্ত করা যায় ও শিক্ষা দেওয়া যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশানুরাগ ও ধর্মানুরাগ জাগাইয়াই তাহাকে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিতে ও নৈতিক জীবন যাপন করিতে উৎসাহ দেওয়া যায়। প্রথমে শিশু কেবল

সুখদায়ক কাজ করিতে চাহে। ক্রমশঃ তাহাকে অন্যের অনুমোদিত কাজ করিতে এবং পরিশেষে নিজের বিবেকের অনুমোদিত কাজ করিতেও শিক্ষা দিয়া তাহার ভাববৃত্তিকে মার্জিত করা যায়। কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয় বিকাশ হইবার পূর্বে তাহার সামনে নৈতিক উদ্দেশ্য স্থাপন করিলে সে তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইবে না।

ভাববৃত্তির শ্রেণীবিভাগ—ভাববৃত্তিগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা,—**সাধারণ ভাববৃত্তি, অবাঞ্ছনীয় ভাববৃত্তি ও সুকুমার ভাববৃত্তি।** সুখ, দুঃখ, বিরাগ প্রভৃতি **সাধারণ ভাববৃত্তি**। এইগুলি স্বাভাবিক ভাবেই জন্মে, তাহাদের বিকাশের জন্য কোন বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না।

ভয়, ক্রোধ, অহঙ্কার, ঈর্ষা ইত্যাদি **অবাঞ্ছনীয় ভাববৃত্তি**। এইগুলি বিকাশের চেষ্টা না করিয়া বরং সংযত করিবার চেষ্টাই করিতে হয়। এই সকল অবাঞ্ছনীয় ভাববৃত্তি কম বেশী সকলেরই থাকে। তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা যায় না, তাহাদের আতিশয্যই অনিষ্টকর। তাহা নিবারণের উপায় মানসিক আবেগের অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। প্রেম, দয়া, ভক্তি, সৌন্দর্যানুরাগ, দেশানুরাগ, সত্যানুরাগ প্রভৃতিই **সুকুমার ভাববৃত্তি**। কেবল এইগুলির বিকাশের জন্যই বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ ভাববৃত্তিগুলিকে অন্য তিন শ্রেণীতেও বিভক্ত করেন; যথা,—(১) **নিজ সম্বন্ধীয়** (self-regarding), (২) **অন্য সম্বন্ধীয়** (Other-regarding) এবং (৩) **আদর্শমূলক** (ideal) **ভাববৃত্তি**, এবং কেবল আদর্শমূলক ভাববৃত্তিগুলিকেই সুকুমার ভাববৃত্তি বলেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীবিভাগে অন্য সম্বন্ধীয় ভাববৃত্তিগুলিকেও সুকুমার ভাববৃত্তির অন্তর্গত করা হইয়াছে।

সুকুমার ভাববৃত্তি (Sentiments)

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, **পর সম্বন্ধীয় ও আদর্শমূলক ভাববৃত্তিগুলিকেই সুকুমার ভাববৃত্তি বলে**। যথা—**সহানুভূতি, প্রেম, ভক্তি, দয়া, দেশানুরাগ, সৌন্দর্যানুরাগ, সাহিত্যানুরাগ, ন্যায়পরতা, ধর্মানুরাগ, সত্যানুরাগ ইত্যাদি**। এই ভাববৃত্তিগুলি মানুষকে উচ্চ, উদার ও মহৎ করে এবং মানুষের প্রভূত মঙ্গল সাধন করে।

সুকুমার ভাববৃত্তিগুলির সহিত বুদ্ধিবৃত্তিও সংমিশ্রিত থাকে। কারণ এই ভাববৃত্তিগুলি জাগরিত করিবার জন্য কিছু জ্ঞান ও চিন্তার প্রয়োজন। যথা—অন্যের দুঃখে প্রকৃত সহানুভূতি অনুভব করিতে হইলে সেই দুঃখের কিছু জ্ঞান থাকা চাই এবং সেই দুঃখ যেন নিজের হইয়াছে বা হইতে পারে এইরূপ কল্পনা করা প্রয়োজন। অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তির কাজ প্রচ্ছন্ন থাকে এবং ইহা অনেকটা অজ্ঞাতসারে কাজ করে। কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে তাহার সম্বন্ধে অবহিত থাকা প্রয়োজন। কারণ প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিয়া এবং ঠিকভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াই শিক্ষক কোন সুকুমার ভাববৃত্তি জাগরিত করিতে পারেন। যথা,—সৌন্দর্যজ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াও সৌন্দর্য উপভোগ করিতে শিক্ষা দিয়াই সৌন্দর্যানুরাগ জাগরিত করা ও বৃদ্ধি করা যায়। অবশ্য সকল সময় যে প্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞানদানের এবং নির্দিষ্টভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহা নহে। অবস্থার প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেও সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে এবং কোন সুকুমার ভাববৃত্তি জাগিতে পারে।

ব্যবহারের সুযোগ ও উৎসাহ দানই সুকুমার ভাববৃত্তিগুলির বিকাশের একমাত্র উপায়। যথা,—ছোট বেলা হইতে শিশুগণকে অন্যের সুখে সুখবোধ ও দুঃখে দুঃখবোধ করিতে শিক্ষা দিলে ও উৎসাহ দিলে সহানুভূতি বৃত্তির বিকাশ হয়। ভাইবোন, পিতামাতা, সঙ্গী, সহপাঠী ও প্রতিবেশী প্রভৃতিকে ভালবাসিতে শিক্ষা দিলে ও উৎসাহ দিলেই প্রেমবৃত্তির বিকাশ হয়। গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করিতে, সুন্দর জিনিষ দেখিয়া আনন্দ বোধ করিতে, মধুর সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইতে, মহত্ত্ব ও উদারতা দেখিলে প্রশংসা করিতে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বা গুরুজনের সম্মান করিতে, নিজ জন্ম-ভূমিকে ভালবাসিতে, ভগবানকে ভক্তি করিতে ও পূজা করিতে শিক্ষা দিলেই বিভিন্ন সুকুমার ভাববৃত্তিগুলি বিকশিত হইবে।

(নৈতিক শিক্ষার অধ্যায়ে এই বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা হইবে)।

মানসিক আবেগ (Emotions)

আকস্মিক প্রবল ভাববৃত্তিকেই মানসিক আবেগ বলে। যে-কোন ভাববৃত্তির আতিশয্য হইলে বা তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে তাহা মানসিক আবেগে

পরিণত হয়। কি সাধারণ ভাববৃত্তি, কি অবাঞ্ছনীয় ভাববৃত্তি, কি সুকুমার ভাববৃত্তি, সকলগুলিই তীব্র আকার ধারণ করিয়া মানসিক আবেগে পরিণত হইতে পারে। আমরা আনন্দে অধীর হইতে পারি, দুঃখে অভিভূত হইতে পারি বা ক্রোধে উন্মত্ত হইতে পারি। এমন কি সৌন্দর্যানুরাগ, দেশপ্রেম, ধর্মানুরাগ প্রভৃতি মহৎ ভাববৃত্তিগুলির আতিশয্যেও আমরা সম্পূর্ণ অন্ধ, বিচারহীন হইয়া পড়িতে পারি।

মানসিক আবেগ উৎপত্তির কারণ

কোন কারণে প্রবল উত্তেজনার ফলেই মানসিক আবেগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইহার শারীরিক প্রতিক্রিয়া হওয়ার পূর্বে শরীরের অভ্যন্তরেও যথেষ্ট কাজ হয়। এই কাজ সম্বন্ধে নানামত আছে। কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিদ্ মনে করেন যে, মানুষের শরীরে হরমোন (Hormones) নামক কয়েকটি রস আছে। ইহাদের কতকগুলি মাংসপেশীকে উত্তেজিত করে, অন্য কতকগুলি শান্ত করে। এই দুই প্রকার রসের অনুপাত ঠিক থাকিলে মানুষ শান্ত থাকে, তাহার ব্যতিক্রম হইলেই মানুষ উত্তেজিত হয়। কিন্তু অনেক মনোবিজ্ঞানবিদের মত যে, কোন আকস্মিক কারণে মনে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে সেই উত্তেজনা-প্রবাহ স্বক্রিয়াশীল স্নায়ুপ্রণালীতে সঞ্চারিত হয় এবং তাহার ফলে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্ত্র ও মুখবিহীন গ্লাণ্ডসমূহ উত্তেজিত হইয়া একপ্রকার উগ্ররস ক্ষরণ করে। সেই রস রক্তের সহিত মিশিয়া সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হইলে সমস্ত শরীর উত্তেজিত হইয়া প্রবল, উদ্দাম প্রতিক্রিয়া করে। এই জন্যই সকলে সমান উত্তেজনা-প্রবণ নহে। যাহাদের মুখবিহীন গ্লাণ্ডসমূহ বেশী কাজ করে ও বেশী রস ক্ষরণ করে তাহারাও বেশী উত্তেজনা-প্রবণ।

সহজবৃত্তি ও মানসিক আবেগ

সহজবৃত্তি ও মানসিক আবেগ উভয়েই চিন্তাবিহীন কার্য-প্রবৃত্তি এবং উভয়েই সহজাত। কিন্তু সহজবৃত্তিগুলি স্নায়ুর সরল, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া; মানসিক আবেগ সমস্ত শরীরের জটিল, প্রবল ও উদ্দাম প্রতিক্রিয়া। সহজ্-বৃত্তির কাজে মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডবাহী স্নায়ুপ্রণালীই প্রধান অংশ গ্রহণ করে, মানসিক আবেগ সৃষ্টির কাজে সহযোগী বা স্বক্রিয়াশীল স্নায়ুপ্রণালী ও মুখবিহীন গ্লাণ্ডসমূহ

প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া সহজবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে, তাহারা আমাদের শরীর ও মনকে বিশেষ প্রভাবিত করে না ; মানসিক আবেগ আমাদের সমস্ত শরীর ও মনকে আলোড়িত করে এবং আমাদিগকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া ফেলে।

প্রধান প্রধান মানসিক আবেগ

প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই শিশুর আনন্দ, ভয়, ক্রোধ এবং ভালবাসা এই ৪টি মানসিক আবেগের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে ক্রমশঃ আরও কতকগুলি মানসিক আবেগ প্রকাশ পায় ; যথা,—দুঃখ, লজ্জা, ঘৃণা, ঈর্ষা, হিংসা, গর্ব, বিস্ময়, বিরক্তি, দয়া, প্রতিশোধ, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি।

মানসিক আবেগের সুফল ও কুফল

মানসিক আবেগের একমাত্র সুফল এই যে ইহা মানুষকে প্রবল কর্ম-প্রেরণা দেয় এবং সাময়িক ভাবে তাহার **কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে।**

কিন্তু ইহার কুফল এত বেশী যে তাহার তুলনায় পূর্বোক্ত সুফল উপেক্ষণীয়। ইহার দ্বারা আমাদের শরীরের রক্তপ্রবাহ, শ্বাসক্রিয়া ও হজম কার্য বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং মুখবিহীন গ্লাণ্ডগুলি হইতে যে উগ্ররস ক্ষরিত হয় তাহা রক্তে মিশ্রিত হইয়া রক্ত দূষিত করে। ইহার দ্বারা আমরা সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়ি, সাময়িক ভাবে বিচার-শক্তি ও নিজের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলি। কারণ ইচ্ছা ও জ্ঞানের সমবেত শক্তি অপেক্ষাও মানসিক আবেগ অধিক শক্তিশালী। সুতরাং ইহার প্রভাবে আমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া গুরুতর অন্যায় কাজও করিতে পারি। তাহা ছাড়া ইহার দ্বারা আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় হয়। সেই জন্যই প্রবল মানসিক আবেগের পর আমাদের শরীর ও মন উভয়ই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

মানসিক আবেগ দমন বা সংযম

মানসিক আবেগের গুরুতর কুফলের কথা চিন্তা করিলে ইহা দমনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুইমত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবল **ইহার বাহ্যিক অভিব্যক্তি বন্ধ করিলেই ইহার কুফল নিবারিত হয় না, বরং ইহাতে তাহার ক্রিয়া অন্তর্মুখী হয় এবং তাহার ফলে**

শরীর ও মনের যথেষ্ট অপকার হইতে পারে, এমন কি গুরুতর ব্যাধিরও সৃষ্টি হইতে পারে। ক্রোধ, দুঃখ ইত্যাদির বাহিক দমনের ফলে যে গুরুতর মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

মানসিক আবেগ নিবারণ ও সংযমের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে :

(১) **কারণ দূর করা**। উত্তেজনার কোন কারণ ব্যতীত মানসিক আবেগের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং সেই কারণগুলি দূর করিতে পারিলে মানসিক আবেগের সঞ্চার হইবে না। যথা,—ক্রোধের কোন কারণ না থাকিলে খুব উগ্র প্রকৃতির লোকও ক্রোধান্ধ হইতে পারে না এবং ক্রমশঃ তাহার প্রকৃতি শান্ত হইয়া আসে।

(২) **স্বাভাবিক প্রকাশের সুযোগ দেওয়া**। অন্যের অনিষ্ট না হয় এমনভাবে মানসিক আবেগ প্রকাশ করিতে দিলে তাহার উপশম হয়। যথা,—ক্রন্দন করিলে প্রবল দুঃখেরও উপশম হয়।

(৩) **ভাষায় প্রকাশ করিতে দেওয়া**। কাহারও দুঃখের বা ক্রোধের কারণ তাহাকে বর্ণনা করিতে দিলে ও সহানুভূতির সহিত শুনিলে তাহার দুঃখ বা ক্রোধের তীব্রতা অনেক কমিয়া যায়। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের উত্তেজনা নিবারণের জন্য ইহাই অনেক সময় যথেষ্ট হয়।

(৪) **কিছুক্ষণ কার্যবিরত থাকা বা বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করা।** উত্তেজনা বশে কোন কার্য না করিয়া কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিলে মানসিক আবেগ অনেকটা হ্রাস পায়। কিছুক্ষণ অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেও উত্তেজনা কমিয়া যায়। যথা,—ক্রোধান্ধ ব্যক্তি ১০, ২০, ৫০, ১০০ পর্যন্ত গণনা করিলে, একটা কবিতা আবৃত্তি করিলে বা পাঠ করিলে, একটা সুন্দর ছবি পর্যবেক্ষণ করিলে, একটা গান শুনিলে, তাহার ক্রোধের অনেক উপশম হয়। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইতে পারিলে তাহার মন সম্পূর্ণ শান্ত হয়।

(৫) **কারণ ও কুফল বিচার**। কোন মানসিক আবেগের কারণ বিচার বা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে এত বেশী উত্তেজিত হওয়ার কারণ নাই। অপর দিকে উত্তেজনা বশে কোন কাজ করার পরিণাম চিন্তা করিলেও মন অনেকটা সংযত হইবে। অবশ্য প্রবল উত্তেজনার সময় বিচার-শক্তি অনেকটা

লোপ পায়। তবে অন্য কেহ কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারে যে তাহা তত গুরুতর নহে এবং কুফলের দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে অনিষ্টকর কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। সর্বদা বিচার করিয়া কাজ করিবার অভ্যাস করিলে উত্তেজনার সময়ও বিচারশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইবে না। অবশ্য ছোট শিশুর পক্ষে ইহা করা সম্ভব নহে।

(৬) উত্তেজিত ব্যক্তিকে কিছুক্ষণ একাকী থাকিতে দেওয়া। কোন ছাত্রকে উত্তেজিত হইতে দেখিলে শিক্ষক ও অন্য ছাত্রগণ কিছুক্ষণ তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবেন এবং তাহাকে একা থাকিতে দিবেন। ইহাতেও শান্ত না হইলে তাহাকে কিছুক্ষণ বাহিরে বেড়াইয়া আসিতে বলিবেন।

(৭) শারীরিক পরিশ্রম ও স্নান। উত্তেজনার সময় কিছুক্ষণ কোন সাধারণ শারীরিক পরিশ্রম করিলে বা ব্যায়াম করিলে উত্তেজনা কমিয়া যায়। ঠাণ্ডাজল পান করিলে, হাত, মুখ, মাথা ধুইলে উহার উপশম হয়। ছোট ছোট ছেলেদের উত্তেজিত হইতে দেখিলে তাহাকে কিছুক্ষণ দৌড়াইতে দিলে, অথবা তাহাদের মাথা, হাত, মুখ ধুইয়া দিলে তাহারা শান্ত হইয়া পড়িবে।

References

1. P. Sandiford—Educational Psychology, Chap. VII.
2. Norseworthy and Whitley.—The Psychology of Childhood. Chap. III.
3. James Ross—Ground-work of Educational Psychology. Chap. IV.
4. W. Mc. Dougall—Social Psychology. Chaps. III-VII

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সমবেক্ষণ

(Apperception)

পাঁচজন লোকে একই সময়ে, একই অবস্থায় কোন একটি জিনিষ দেখিলে, শুনিলে বা অবগত হইলেও সকলে তাহা একই ভাবে গ্রহণ করে না বা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না। ইহার কারণ তাহারা তাহাদের **পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যেই নূতন জ্ঞান গ্রহণ করে** এবং তাহাদের মানসিক ভাণ্ডার ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই তাহারা একই জিনিষকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। একটা উদাহরণের সাহায্যে ইহাকে আরও বিশদ করা যাইতে পারে। এক সময়ে একজন বৈজ্ঞানিক, একজন ইঞ্জিনিয়ার ও একজন কবি পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ক দেখিয়া তাহার কারণ নির্দেশের চেষ্টা করেন। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করেন যে, চন্দ্রে অনেক পর্বত ও উপত্যকা আছে। উপত্যকাগুলিতে আলোকপাত না হওয়ায় তাহারা কালদাগের মত দেখাইতেছে। ইঞ্জিনিয়ার বলেন যে, চন্দ্রের অধিবাসীরা পূর্তবিদ্যায় নিপুণ, তাহারা বড় বড় খাল খনন করিয়াছে এবং পুল নির্মাণ করিয়াছে। সেইগুলিই কাল দাগের মত দেখাইতেছে। কবি মন্তব্য করেন যে, চন্দ্র হতাশ প্রেমিকের দেশ। তাহাদের অসংখ্য কবরগুলিই কাল দাগের মত দেখাইতেছে।

যে মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা আমরা আমাদের পূর্বার্জিত জ্ঞান বা পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে নূতন জ্ঞান অর্জন করিতে পারি তাহাকে সমবেক্ষণ (apperception) **বলে**। সমবেক্ষণ ক্রিয়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা,—(১) মনের উপর বাহ্য প্রভাবের বা নূতন জ্ঞানের ক্রিয়া। (২) পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা ও সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নূতন জ্ঞানকে শ্রেণীবদ্ধ করা।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা কেবল একটা পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে নূতন জ্ঞান গ্রহণ করি না, **অনেকগুলি অভিজ্ঞতা যুক্তভাবে আমাদিগকে**

নূতন জ্ঞানলাভে সাহায্য করে। কারণ, আমাদের মানসিক ভাণ্ডারে প্রত্যেক অভিজ্ঞতার ফল (engrams) সঞ্চিত হইলেও তাহা স্বতন্ত্র থাকে না। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলগুলি মিলিত হইয়া এক একটা গুচ্ছের সৃষ্টি হয়। যে অভিজ্ঞতাগুলি এক সঙ্গে লাভ করা যায়, কিংবা যেগুলি কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত, তাহাদের ফলগুলি মিলিত হইয়া এক একটা গুচ্ছ হয়। কোন নূতন জ্ঞানের সহিত সম্পর্কযুক্ত পূর্বোক্ত এক একটা অভিজ্ঞতা-গুচ্ছের সাহায্যেই আমরা সেই জ্ঞানলাভ করিতে পারি। **যে যে অভিজ্ঞতার ফলগুলি বা সংস্কারগুচ্ছ আমাদিগকে কোন নূতন বিষয় উপলব্ধি করিতে বা নূতন জ্ঞান অর্জন করিতে সাহায্য করে তাহাদিগকে সমবেক্ষণ মণ্ডল** (apperception mass) **বলে।** তবে হার্বার্ট-বর্ণিত সমবেক্ষণ মণ্ডল কেবল বুদ্ধিমূলক, কেবল পূর্বজ্ঞান দ্বারা তাহা গঠিত। কিন্তু কোন জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে একটা না একটা ভাবেরও উদয় হয়। কোন অভিজ্ঞতার গুচ্ছ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাবগুচ্ছেরও সৃষ্টি হয় এবং তাহাও নূতন বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রভাবিত করে। **যে ভাব-গুচ্ছের দ্বারা কোন বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রভাবিত হয় তাহাকে ভাবমণ্ডল** (complex) **বলে।** সুতরাং ভাবমণ্ডলকেও সমবেক্ষণ মণ্ডলের অন্তর্গত না করিলে কোন নূতন বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোভাবের সম্পূর্ণ কারণ নির্ধারিত হয় না।

শিক্ষাকার্যে সমবেক্ষণের প্রয়োগ

দেখা যাইতেছে যে, **সমবেক্ষণ মণ্ডলের সাহায্য ব্যতীত আমরা নূতন জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারি না।** কিন্তু কোন বিশেষ জ্ঞানলাভে সকল সমবেক্ষণ মণ্ডলের বা সমস্ত পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্য লাগে না। নূতন জ্ঞানের সহিত যে সমবেক্ষণ মণ্ডলের সম্পর্ক আছে তাহারই সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সুতরাং **কোন নূতন জ্ঞান দানের পূর্বে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত সমবেক্ষণ মণ্ডল জাগরিত করিয়া সেই জ্ঞান দিলেই ছাত্রগণ তাহা সহজে ও ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারে।** এইজন্য নূতন পাঠ দেওয়ার পূর্বে প্রশ্নের সাহায্যে সেই বিষয়ে ছাত্রের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিতে হয় এবং

তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াই নূতন জ্ঞান দিতে হয়। শুধু পাঠদানের প্রারম্ভে নহে, যে কোন সময় কোন নূতন জ্ঞান দান করিতে হইলে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত (ছাত্রের) সমবেক্ষণ মণ্ডল ও ভাবমণ্ডল জাগরিত করিয়াই তাহা দেওয়া উচিত।

References

1. James Ross—Ground-work of Educational Psychology, Chap II.

2. S. C. Brahmachari—ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান—১৬শ অধ্যায়।

3. G. H. Thompson—Instinct, Intelligence and Character, Chap. XV.

নবম পরিচ্ছেদ

জাতিজ্ঞান

(Concepts)

কোন জিনিষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলেই তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। কারণ ইহাতে কেবল সেই জিনিষের ছবি মনে অঙ্কিত হয় এবং সেই ছবির সহিত জিনিষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; ইহার ফলেই একটা বস্তু, জীব বা গুণের জ্ঞান হয়। কিন্তু বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে বা তাহাদের মানসিক ছবিগুলির মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। জাতিজ্ঞানই এই সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ করে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও জাতিজ্ঞান

কোন বিশেষ বস্তু, জীব, ধারণা, কাজ বা গুণের ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। যথা,—রাম, যদু, চন্দ্র, সূর্য, বিশেষ কোন গাছ, লতা, ইত্যাদির জ্ঞান।

শ্রেণী বা জাতি হিসাবে কোন বস্তু, জীব, ধারণা, কাজ বা গুণের জ্ঞানই জাতিজ্ঞান। যথা—মানুষ, গরু, কুকুর, বিড়াল, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, নদী ইত্যাদির জ্ঞান।

কতকগুলি বস্তু, জীব বা ধারণার মধ্যে যে যে বিশেষত্বগুলি সাধারণ (common) থাকে, তাহাদের সাহায্যেই জাতি নিরূপণ করা যায়। অথবা যে সকল বস্তু, জীব, ধারণা বা গুণের অধিকাংশ বিশেষত্বগুলি সাধারণ (common) থাকে, তাহাদিগকে একজাতিভুক্ত করা যায়। যথা,—অনেকগুলি সাধারণ বিশেষত্ব আছে বলিয়া এক প্রকারের জীবগুলিকে মানুষ বলা হয়; আর এক প্রকারের জীবগুলিকে কুকুর বলা হয়; অন্য এক প্রকারের জীবগুলিকে বিড়াল বলা হয়।

সুতরাং জাতিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কতকগুলি জীব বা বস্তুর আকার বা গুণগুলি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। তাহার পর বিসদৃশ গুণগুলি হইতে সদৃশ গুণগুলি পৃথক করিয়া সদৃশ গুণগুলির ভিত্তিতেই এক একটা জাতি নিরূপণ করিতে হইবে। সর্বশেষে যে সকল বস্তু বা জীবের মধ্যে সে সকল সাদৃশ্য আছে তাহাদিগকে একশ্রেণী বা জাতিভুক্ত করিতে হয়। অনেকগুলি কুকুরকে সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য বা সাধারণ বিশেষত্ব আছে তাহা নিরূপণ করা যায় এবং সেইগুলি যে সকল জীবের মধ্যে বর্তমান দেখা যায় তাহাদিগকে কুকুর বলা যায়। এইরূপে প্রায় সমস্ত জীব, বস্তু, গুণ বা কাজকে এক এক জাতিভুক্ত করিয়া জাতি হিসাবে তাহাদের জ্ঞান লাভ করা যায়।

অসম্পূর্ণ জাতিজ্ঞানের কারণ

(১) প্রত্যক্ষ জ্ঞান অস্পষ্ট হইলে জাতিজ্ঞানও অস্পষ্ট হয়।

(২) গুণগুলি বা বিশেষত্বগুলি ভালরূপে বিশ্লেষণ করিয়া সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সঠিক ভাবে নিরূপণ করিতে না পারিলে সঠিক জ্ঞান হয় না।

(৩) অল্প কতকগুলি বস্তু বা জীব পর্যবেক্ষণ করিয়াই জাতি নির্দেশ করিলে জাতিজ্ঞান ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনা।

(৪) বিস্মৃতির জন্যও জাতিজ্ঞান ভ্রমাত্মক হইতে পারে।

জাতিজ্ঞান লাভের উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা—

(১) ইহার দ্বারা মানসিক শক্তির অপচয় নিবারিত হয়। কেননা, কোন জাতীয় একটা জীব বা জিনিষকে পর্যবেক্ষণ করিলেই সেই জাতীয় সমস্ত বস্তু বা জীবের সাধারণ জ্ঞান লাভ হয়।

(২) ইহার দ্বারা জ্ঞান শ্রেণীবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়।

(৩) ইহার দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তির বিকাশ হয়। কেননা জাতিজ্ঞান লাভে এতদুভয়ের যথেষ্ট ব্যবহার হয়।

জাতিজ্ঞান ও ভাষা

ভাষাকে আমাদের জাতিজ্ঞানের সমষ্টি বলা যায়। কারণ প্রধানতঃ বিভিন্ন জাতীয় বস্তু, জীব, ধারণা, গুণ বা কাজের নাম লইয়াই আমাদের ভাষা গঠিত হয়। অপর দিকে **ভাষা জাতিজ্ঞান বৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করে।** কারণ এক এক জাতীয় জিনিষ, জীব, ধারণা ইত্যাদি এক এক নামে অভিহিত বলিয়া আমরা কতকগুলি নামের সাহায্যেই বিভিন্ন জাতীয় অগণিত বস্তু, জীব, ধারণা ইত্যাদির জ্ঞান লাভ করিতে পারি। সকলে ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্লেষণ ও সংমিশ্রণ পদ্ধতির সাহায্যে জাতি নিরূপণ না করিয়াও নামের সাহায্যেই জাতি নিরূপণ করিতে পারে। বিশেষতঃ বস্তু-সম্পর্ক-শূন্য (abstract) বিষয়ে জাতিজ্ঞান লাভে ভাষা খুব বেশী সাহায্য করে। ইহা ছাড়া আমরা ভাষার সাহায্যেই আমাদের জাতিজ্ঞান স্মৃতি-ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিতে পারি ও অন্যকে দান করিতে পারি।

References

1. J. Ross.—Ground-work of Educational Psychology. Chap. XII.
2. O. B. Douglas and B. T. Holland—Fundamentals of Educational Psychology. Chap. XIV.

দশম পরিচ্ছেদ

চেতনা ও মনোযোগ

(Consciousness and Attention)

চেতনা—জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মন কখনও সম্পূর্ণ শূন্য থাকে না, কোন না কোন চিন্তা বা ভাব মানুষের মনকে অধিকার করিয়া থাকে। হয়ত সে পারিপার্শ্বিক পদার্থ বা অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে, অথবা কোন পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকে, অথবা কোন সুখ-দুঃখের ভাবে বিভোর থাকে, অথবা কোন কাজ করিবার ইচ্ছা অনুভব করে। **মনের যে অবস্থায় মানুষ পারিপার্শ্বিক পদার্থের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, অথবা কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে, অথবা সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে, অথবা কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করিতে পারে, তাহাকে চেতনা বলে**। কিন্তু এই চেতনার প্রকৃতি বা অবস্থা সকল সময় এক রকম থাকে না। যখন আমরা জাগিয়া থাকি তখন আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত থাকিতে পারি। কিন্তু যখন অর্ধ-নিদ্রিত বা তন্দ্রাগ্রস্ত থাকি তখন আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত থাকিতে পারি না, অথচ তখনও আমাদের কিছু মানসিক অভিজ্ঞতা হইতে পারে। যথা, তখনও পার্শ্বে একটা শব্দ হইলে আমরা তাহা শুনিতে পারি, কেহ গায়ে হাত দিলে আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি। মনের এই অবস্থাকে **অর্ধ-চৈতন্য অবস্থা** (Half-conscious state) বলে। যখন আমরা গভীর নিদ্রামগ্ন বা অচৈতন্য হই তখন আমরা কোন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি না। কিন্তু তখন আমাদের মন একেবারে শূন্য থাকে না। আমাদের কতকগুলি স্বপ্ন যে পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতারই ফল তাহা সকলে স্বীকার করে। অর্থাৎ আমাদের অচৈতন্য অবস্থায়ও আমরা আমাদের পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার বিষয় অবগত থাকিতে পারি। সুতরাং ইহাকে অচৈতন্য অবস্থা না বলিয়া **নিম্নচৈতন্য বা অবচেতন অবস্থা** (Sub-consciousness) বলাই ঠিক।

আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার ফল বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইলেও **নিম্ন-চৈতন্য স্তরে** সঞ্চিত থাকে এবং তাহারাই আমাদের মানসিক প্রবৃত্তি (disposition) বা সমবেক্ষণ মণ্ডলের সৃষ্টি করিয়া নূতন জ্ঞান লাভে সাহায্য করে। সুতরাং আমাদের মানসিক জীবনের উপর তাহাদের প্রভাব কম নহে।

সচেতন অবস্থায় অভিজ্ঞতা লাভের কার্যকে দুই দিক দিয়া বিবেচনা করা যায়—যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে তাহার দিক হইতে এবং যে বস্তু বা বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ হইতেছে তাহার দিক হইতে। কোন অভিজ্ঞতা লাভের সময়ে **অভিজ্ঞতা লাভকারী যে মানসিক কার্য করিতেছে তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানকে কর্তার আত্মবিষয়ক (subjective) জ্ঞান বলা হয়।** তাহার নিজ কাজের বিষয় উপেক্ষা করিয়া কেবল **বস্তুর বা বিষয়ের প্রকৃতি বা গুণাগুণ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হইতেছে তাহাকে বস্তুবিষয়ক (objective) জ্ঞান বলা হয়।** যথা,—শিশু একটা সুন্দর জিনিষ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। শিশু জিনিষটা দেখিতে ও মুগ্ধ হইতে যে মানসিক কাজ করিল তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানকে কর্তার আত্ম-বিষয়ক (subjective) জ্ঞান বলা হয়। বস্তুটি সম্বন্ধে শিশুর যে জ্ঞান হইল তাহাকে বস্তুবিষয়ক (objective) জ্ঞান বলা হয়।

মনোযোগ—আমাদের সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়ও আমরা পারিপার্শ্বিক সকল পদার্থ বা বিষয় সম্বন্ধে সমভাবে সচেতন থাকিতে পারি না। আমাদের চেতনার ক্ষেত্রে যুগপৎ অনেক জিনিষ থাকিতে পারে এবং আমরা একই সঙ্গে অনেক বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। যথা,—একজন লোক একই সময়ে কোন লোকের সঙ্গে কথা বলিতে পারে, পার্শ্বে দণ্ডায়মান অন্য লোককে দেখিতে পারে, বায়ুর উত্তাপ বা শৈত্য অনুভব করিতে পারে এবং নিকটস্থ মন্দিরের বাদ্যধ্বনি বা মস্‌জিদের আজানও শুনিতে পারে। কিন্তু কেহ যদি আগ্রহের সহিত পার্শ্বস্থ লোকটির সঙ্গে কথা বলে তবে সে তাহার সম্বন্ধে যতটা সচেতন থাকিবে অন্য কোন বিষয়ে ততটা সচেতন থাকিতে পারে না। ইহার কারণ সে লোকটি তখন তাহার চেতনার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করিতেছে, অন্য সমস্ত বস্তু বা বিষয় চেতনার প্রান্তদেশে সরিয়া গিয়াছে। পরমুহূর্তে

ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্তনও হইতে পারে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসিলে, কুকুরটিই তাহার চেতনার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিবে এবং পূর্বোক্ত লোকটি ও অন্য সমস্ত বস্তু চেতনার প্রান্তদেশে সরিয়া যাইবে। **কোন একটা বিষয়কে চেতনার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া মনের সমস্ত ক্রিয়া তাহাতে সীমাবদ্ধ করাকে মনোযোগ দান বলে। অথবা কোন বস্তু বা বিষয়ের উপর মন বা মনের সমস্ত ক্রিয়া কেন্দ্রীভূত** (focus) **করাকে মনোযোগ দান বলে।** মনোযোগ দান কার্যেও পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে। পূর্বোক্ত উদাহরণ হইতে দেখা যাইবে যে, কেহ কোন বিষয়ে মনোযোগ দিয়াও অন্য পদার্থ বা বিষয় সম্বন্ধে কিছু সচেতন থাকিতে পারে। কিন্তু সে কোন বিষয়ে একাগ্র মনোযোগ দান করিলে অন্য কোন বিষয়ে সচেতন থাকিতে পারে না। সুতরাং কোন বিষয়ে মনোযোগ দানের সময় যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে যত কম সচেতন থাকিবে তাহার মনোযোগ তত বেশী গভীর হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

মনোযোগ দুই প্রকার—যথা, (১) **প্রবৃত্তিমূলক বা চেষ্টাবিহীন** (২) **ইচ্ছামূলক বা চেষ্টাপ্রসূত।**

একটা উজ্জ্বল রংএর বস্তু বা চিত্র শিশুর সম্মুখে স্থাপন করিলে শিশু প্রবৃত্তিবশে (instinctively) তাহার দিকে আকৃষ্ট হইবে এবং মনোযোগের সহিত তাহা দেখিবে। ইহার জন্য তাহাকে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হইবে না বা ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করিতে হইবে না। **চেষ্টা না করিয়া বা ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার না করিয়া, কেবল বস্তু বা বিষয়ের চিত্তাকর্ষক গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রতি যে মনোযোগ দেওয়া যায় তাহাকে প্রবৃত্তিমূলক** (instinctive) **বা চেষ্টাবিহীন মনোযোগ বলে।**

গণিতের একটা অঙ্ক কষিতে হইলে তাহার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হয়। কিন্তু শিশুর নিকট অঙ্কটির কোন চিত্তাকর্ষক গুণ নাই। কেবল অঙ্কশিক্ষার উদ্দেশ্যেই চেষ্টা করিয়া বা ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করিয়া তাহাতে মনোযোগ দিতে হইবে। **কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়া বা**

ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করিয়া কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি যে মনোযোগ দেওয়া যায় তাহাকে ইচ্ছামূলক মনোযোগ বলে।

শিশুর ইচ্ছাশক্তি খুব কম। তাহার ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং **শিশু প্রথমে ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতে পারে না, সে কেবল স্বাভাবিক বা প্রবৃত্তিমূলক** (instinctive) **মনোযোগ দিতে পারে।** সুতরাং অল্প বয়সের শিশুকে কোন বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে বিষয়টিকে যেরূপেই হউক চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। তাহা হইলেই শিশু তাহাতে মনোযোগ দিবে এবং বিষয়টি যতবেশী চিত্তাকর্ষক হইবে তাহার প্রতি শিশুর মনোযোগ তত বেশী গভীর হইবে।

কিন্তু স্বাভাবিক মনোযোগ দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। কারণ একটা জিনিষ বা বিষয় যতই চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, তাহার আকর্ষণশক্তি কোন লোকের উপর দীর্ঘকাল কাজ করিতে পারে না। সুতরাং স্বাভাবিক মনোযোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে **হইলে শিশুকে কিছু কিছু চেষ্টা করিয়া বা ইচ্ছা** শক্তির ব্যবহার করিয়া তাহা স্থায়ী করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপে **স্বাভাবিক মনোযোগকে ক্রমশঃ ইচ্ছামূলক মনোযোগে পরিণত করিয়াই দীর্ঘস্থায়ী করা যায়।** শিশুর ইচ্ছাশক্তি খুব দুর্বল বা অবিকশিত বলিয়া সে প্রথমে মনোযোগ দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য বেশী চেষ্টাও করিতে পারিবে না। কিন্তু শিক্ষক অধৈর্য হইলে চলিবে না, শিশুকে চেষ্টা করিতে উৎসাহ দিয়া তাহার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ করিতে হইবে এবং তাহার প্রবৃত্তিমূলক মনোযোগকে ইচ্ছামূলক মনোযোগে পরিণত করিতে হইবে।

ইচ্ছাশক্তির যথেষ্ট বিকাশ হইলেই বালক যে বিষয় কিছুমাত্র চিত্তাকর্ষক নয় তাহাতেও চেষ্টা করিয়া মনোযোগ দিতে পারিবে এবং তখনই তাহার মনোযোগ **বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক** হইবে। কিন্তু বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দেওয়ার শক্তি লাভ করিতে যথেষ্ট সময় দরকার। সুতরাং **বিশুদ্ধ মনোযোগ দানের শক্তিলাভ করা পর্যন্ত প্রবৃত্তিমূলক ও ইচ্ছামূলক মনোযোগের সংমিশ্রণে শিক্ষা দিতে হইবে।**

অপর দিকে **ইচ্ছামূলক মনোযোগ দান কার্যে যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম হয়।** কি শিশু, কি বয়স্ক লোক কেহই বিনা কারণে পরিশ্রম করিতে চাহে না। সুতরাং কোন বিষয়ে **ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য সেই বিষয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা শিক্ষার্থীর সামনে ধরিতে হইবে।** যথা,—বালকগণকে লাভ-ক্ষতির অঙ্ক শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে বলা যাইতে পারে যে বাণিজ্যের সাহায্যেই লোক খুব ধনী হইতে পারে। কিন্তু লাভ-ক্ষতির হিসাব করিতে না জানিলে কেহই বাণিজ্য করিয়া লাভবান্ হইতে পারে না। সুতরাং লাভ-ক্ষতির হিসাব শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। ইহার পর বালকের নিজ অভিজ্ঞতার সহিত সম্পর্কযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে লাভ-ক্ষতির অঙ্ক শিক্ষা দিলে বালকগণ তাহা শিখিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহাতে ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিবে।

মনোযোগ দান সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত ঃ—

(১) প্রত্যেক মানুষের শারীরিক ও মানসিক কার্যশক্তি সীমাবদ্ধ। সুতরাং যে ভাবেই মনোযোগ দানে প্রবৃত্ত করা হউক না, শিশু তাহার শক্তির বেশী মানসিক কাজ করিতে পারিবে না।

(২) কোন বিষয়ে একটানা অনেকক্ষণ মনোযোগ দেওয়া যায় না, **থামিয়া থামিয়া** (in spurts) **মনোযোগ দিতে হয়।**

(৩) এক সঙ্গে দুই বিষয়ে একাগ্র মনোযোগ দেওয়া যায় না, পাল্টাক্রমেই দিতে হয়।

(৪) মনোযোগ দানের সময় কিছু কিছু বাধার সৃষ্টি হওয়া আপত্তি-জনক বা অনিষ্টকারক নহে। কারণ তাহা হইলে মনোযোগ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হয় এবং তাহার ফলে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয় ও মনোযোগ গভীরতর হয়।

(৫) দুই প্রকারের (types) মনোযোগ দানের শক্তি দেখা যায়। কেহ অনেক বিষয়ে মনোযোগ প্রসারিত করিতে পারে, অন্য কেহ কেহ এক বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিতে পারে। প্রথম শ্রেণীর লোক সাংসারিক

কাজ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারে, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক গবেষণার কাজ করিতে পারে।

(৬) বিভিন্ন বয়সের বালক-বালিকারা নিম্নলিখিত সময়ের জন্য কোন এক বিষয়ে একটানা মনোযোগ দিতে পারে।

বয়স	সময়
৬ বৎসর	১৫ মিনিট
১০ ,,	২০ ,,
১২ ,,	২৫ ,,
১৬ ,,	৩০ ,,

শিশুকে মনোযোগ দান শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(১) প্রথম প্রথম **বিষয়টি যতটা সম্ভব চিত্তাকর্ষক** করিয়া শিশুর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। তাহা হইলে সে উহার প্রতি স্বাভাবিক বা প্রবৃত্তিমূলক মনোযোগ দিবে।

(২) **নূতন নূতন আকর্ষণের সৃষ্টি** করিয়া অথবা বস্তুর বা বিষয়ের বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বাভাবিক মনোযোগ বেশীক্ষণ স্থায়ী করা যাইতে পারে।

(৩) একটানা বেশীক্ষণ কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে না দিয়া **মধ্যে মধ্যে মনোযোগের বস্তু অপসারিত করিলে** মনোযোগ শিথিল হইবে না।

(৪) বস্তুর চিত্তাকর্ষক গুণে আকৃষ্ট হইয়া কিংবা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন আগ্রহের সহিত স্বাভাবিক বা ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতেছে, তখন **কিছু কিছু বাধার সৃষ্টি** করিলে সে মনোযোগ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে এবং ফলে তাহার মনোযোগ গভীর হইবে।

(৫) স্বাভাবিক মনোযোগকে ক্রমশঃ ইচ্ছামূলক মনোযোগে পরিণত করিবার জন্য একটু একটু চেষ্টা করিয়া **বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে** উৎসাহ দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে একই বিষয়ে কে কত বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে পারে তাহা দেখিবার জন্য শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(৬) ইচ্ছাশক্তির কিছু বিকাশ হইলে বালক-বালিকাদের সামনে তাহাদের বয়সের উপযোগী **কোন উদ্দেশ্য স্থাপন** করিয়া তাহা সাধনের জন্য কাজ করিতে দিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহারা ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিবে।

(৭) **এক এক বিষয়ে অনুরাগ বা জ্ঞান-তৃষ্ণা জাগাইয়া** দিতে পারিলে ছাত্রেরা নিজ হইতে ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিয়া তাহাদের জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিবে।

(৮) ইচ্ছাশক্তির যথেষ্ট বিকাশ হইলে **নানা প্রকার বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও কোন বিষয়ে মনোযোগ দান** করিতে দেওয়া যাইতে পারে এবং সেই বিষয়ে প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অমনোযোগিতার কারণ—

(১) **অনুরাগের অভাব**। যে বিষয়ের প্রতি শিশু আকর্ষণ বোধ করে না বা তাহার অনুরাগ জন্মে না সে সেই বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না।

(২) **অন্য বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ**। সাধারণতঃ অন্য বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষিত হয় বলিয়াই শিশু কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে পারে না।

(৩) **বেশীক্ষণ এক বিষয়ে মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখা**। যে বয়সের শিশু যতক্ষণ কোন এক বিষয়ে একটানা মনোযোগ দিতে পারে, তাহা হইতে বেশী সময়ের জন্য সে বিষয়ে তাহার মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিলে সে অমনোযোগী হইবে।

(৪) **ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা**। স্বাভাবিক মনোযোগও বেশীক্ষণ স্থায়ী করিতে হইলে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতে হইলে ইচ্ছাশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার করিতে হয়। সুতরাং ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হইলে স্বাভাবিক মনোযোগ বেশীক্ষণ স্থায়ী করিতে পারে না এবং বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতে পারে না।

(৫) **আগ্রহের অভাব**। কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভের আগ্রহ না থাকিলে, ছাত্র তাহাতে মনোযোগ দেয় না। সাধারণতঃ কিছু বেশী বয়সের ছাত্রই এই কারণে মনোযোগ দেয় না।

(৬) **মানসিক অবসাদ।** মন অবসাদগ্রস্ত হইলে শিশু কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। এই অবস্থায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করিলে শিশুর স্বাস্থ্যহানি হইবে।

(৭) **শারীরিক অবসাদ বা অসুস্থতা।** শরীর অবসন্ন হইলে বা অসুস্থ হইলে শিশু কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। সেই অবস্থায় মনোযোগ দানের জন্য বাধ্য করিলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হইবে।

References

1. J. Ross—Ground-work of Educational Psychology. Chap. X.
2. Norseworthy and Whitley—The Psychology of childhood. Chap. VII
3. Pramatha Nath Das Gupta—নূতন শিক্ষা-প্রণালী।
4. W. Mc Dougall—Psychology. Chap. II.

একাদশ পরিচ্ছেদ

অনুরাগ

(Interest)

কোন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়া তাহার জ্ঞান লাভের প্রবৃত্তিকেই অনুরাগ বলে। কেহ কোন বিষয়ে আকর্ষণ বোধ করার অর্থ এই যে, সেই বিষয় সম্পর্কে তাহার সুখ, আনন্দ, বিস্ময়, প্রশংসা, ঔৎসুক্য, স্বার্থ প্রভৃতি কোন ভাব জাগরিত হয়। সুতরাং কোন বিষয়ে কাহারও অনুরাগ সৃষ্টি করিতে হইলে সেই বিষয় সম্পর্কে তাহার পূর্বোক্ত কোন ভাব জাগাইতে হইবে। তাহা হইলেই সে-বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে তাহার প্রবৃত্তি হইবে, বা সে-বিষয়ে তাহার অনুরাগ জন্মিবে। যথা,—একটা সুন্দর ফুল বা চিত্র দেখিলে, মধুর শব্দ শুনিলে, অথবা বিচিত্র জিনিস দেখিলে, শিশু তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাহা কি জানিতে চাহে।

অনুরাগ ও মনোযোগ। **অনুরাগ ও মনোযোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।** কোন বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করাকেই মনোযোগ বলে। কিন্তু কি কারণে শিশু কোন বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করিবে? কোন বিষয়ে আকর্ষণ বোধ করিয়া তাহার জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি হইলেই বা তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলেই শিশু সেই বিষয়ে তাহার মনকে কেন্দ্রীভূত করিবে বা তাহার প্রতি মনোযোগ দিবে। সুতরাং **অনুরাগ ও মনোযোগের মধ্যে অনেকটা কারণ ও ফল সম্পর্ক রহিয়াছে।**

অনুরাগ দুই প্রকার—স্বাভাবিক ও অর্জিত। **স্বাভাবিক অনুরাগ প্রধানতঃ বস্তু বা বিষয়ের চিত্তাকর্ষক গুণের উপরই নির্ভর করে।** যথা,—উজ্জল রং-'এর ছবি চিত্তাকর্ষক বলিয়াই শিশু সহজে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় বা তাহার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ হয়। ভয়, বিস্ময়, ঔৎসুক্য প্রভৃতি ভাবোদ্দীপক গল্পও শিশুর চিত্তাকর্ষণ করে; তাই তাহার প্রতিও শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ হয়।

অর্জিত অনুরাগ বিষয়ের চিত্তাকর্ষক গুণের উপর নির্ভর করে না। শিশুর ইচ্ছাশক্তির কিছু বিকাশ হইলে তাহার সাহায্যে, কিছুমাত্র চিত্তাকর্ষক নহে এমন বিষয়েও অনুরাগের সৃষ্টি করা যায়। তিন উপায়ে তাহা সৃষ্টি করা যায়।—

(১) কোন বিষয় চিত্তাকর্ষক না হইলেও তাহাদ্বারা কোন উপকার বা স্বার্থ সাধিত হইতে পারে বুঝিলে তাহার প্রতি একটা কৃত্রিম অনুরাগ জন্মে। ইহাকে **পরোক্ষ অনুরাগ** বলে। যথা,—লেখার ও পড়ার কাজ শিশুর নিকট তেমন চিত্তাকর্ষক নহে, কিন্তু লিখিতে ও পড়িতে শিখিলে তাহার দাদার নিকট পুতুল আনিতে লিখিতে পারিবে ও গল্পের বই পড়িতে পারিবে জানিলে তাহার প্রতি শিশুর পরোক্ষ অনুরাগ জন্মে।

(২) কোন বিষয় প্রথমে চিত্তাকর্ষক না হইলেও কিছুকাল অভ্যাস বা চর্চা করায় তাহার প্রতি একপ্রকার অনুরাগ জন্মে। অবশ্য অন্তরের সহিত কাজটা করিলেই তাহাতে অনুরাগ জন্মিতে পারে। যথা,—গণিতের অঙ্ক প্রথমে চিত্তাকর্ষক না হইলেও কিছুকাল ধৈর্য সহকারে গণিতের অঙ্ক কষিতে থাকিলে তাহার প্রতি একটা অনুরাগের সৃষ্টি না হইয়া পারে না।

(৩) নানা প্রদীপনের সাহায্যে চিত্তাকর্ষক গুণহীন বিষয়কেও চিত্তাকর্ষক করা যায় এবং তাহার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা যায়। (প্রদীপনের ব্যবহার অন্য অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে)

পাঠে শিশুর অনুরাগ-সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা

পাঠে শিশুর মনোযোগ লাভ করিতে না পারিলে তাহাকে কিছু শিক্ষা দেওয়া যায় না। কিন্তু পাঠের প্রতি শিশুর অনুরাগ না জন্মিলে সে তাহাতে মনোযোগ দিবেনা। কেননা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মনোযোগ ও অনুরাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে,; বস্তুতঃ মনোযোগদান অনুরাগেরই স্বাভাবিক ফল। সুতরাং শিক্ষাদান কার্য ফলপ্রসূ করিতে হইলে যে কোন উপায়েই হউক পাঠে বা পাঠ্য বিষয়ে শিশুর স্বাভাবিক বা অর্জিত অনুরাগ সৃষ্টি করিতে হইবে।

কিন্তু শিশুর ইচ্ছাশক্তি দুর্বল বলিয়া প্রথমে তাহার কেবল স্বাভাবিক অনুরাগ হইতে পারে। সুতরাং তাহাকে কোন বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে বিষয়টি চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রথমে তাহাতে শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মাইতে হইবে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইতে থাকিলেও পাঠ্যবিষয় চিত্তাকর্ষক করার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় না। যৌবনোন্মুখ বয়স পর্যন্ত শিশু বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের শক্তিলাভ করে না। সুতরাং তখন পর্যন্ত স্বাভাবিক ও অর্জিত উভয় প্রকার অনুরাগের সাহায্যে ও সংমিশ্রণে পাঠে ছাত্রের মনোযোগ লাভ করিতে হয়।

ইহাছাড়া বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দান কার্যে যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম হয়, সুতরাং যৌবনোন্মুখ বয়সের পরেও বিষয় চিত্তাকর্ষক করিয়া স্বাভাবিক অনুরাগের সাহায্যে প্রবৃত্তিমূলক মনোযোগ লাভ করিতে পারিলে তাহার মানসিক শক্তির মিতব্যয়িতা হইবে।

References :

1. J. Ross—Ground-work of Educational Psycholgy. Chap. X,
2. Norseworthy and Whitley—The Psychology of Childhood. Chap. VI.
3. Pramatha Nath Das Gupta—নূতন শিক্ষা-প্রণালী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্মৃতি

মানুষের জীবনে যাহা কিছু অভিজ্ঞতা হয় তাহা কোন সময়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। মনের এমন একটা শক্তি আছে, যাহার সাহায্যে মন আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার ফলগুলি জমা করিয়া রাখিতে পারে। Mr. Nunn ইহাকে **নিমি** (Mneme) নাম দিয়াছেন। **অভিজ্ঞতার ফলগুলি ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া আমাদের মানসিক ভাণ্ডার গঠন করে।** কাহারও কাহারও মতে, এমন কি আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার ফলগুলিও আমাদের মানসিক ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিত পারে। কিন্তু মানসিক ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকা এক কথা, আর স্মরণ থাকা আর এক কথা। যাহা কিছু আমাদের মানসিক ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে তৎসমুদয়ই যে আমাদের স্মরণ আছে তাহা নহে কারণ মানসিক ভাণ্ডারে গচ্ছিত সমস্ত অভিজ্ঞতার ফলগুলি চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকে না, কালক্রমে তাহারা চেতনার প্রচ্ছন্নদেশে (subconscious region) চলিয়া যায় এবং তথায় জমা থাকে। তবে আমরা চেষ্টা করিয়া কোন অভিজ্ঞতার ফলকে পুনঃ চেতনার কেন্দ্রস্থলে লইয়া আসিতে পারি এবং তাহার সম্বন্ধে সচেতন (conscious) হইতে পারি। **যে মানসিক শক্তির সাহায্যে আমরা চেতনার প্রচ্ছন্নদেশে গচ্ছিত কোন অভিজ্ঞতার ফলকে পুনঃ চেতনার কেন্দ্রস্থলে লইয়া আসিয়া তাহার সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারি ও চিন্তা করিতে পারি তাহাকে স্মৃতি বলে।** সুতরাং স্মরণ রাখার কাজকে **তিন ভাগে বিভক্ত** করা যায়। যথা,—(১) কোন অভিজ্ঞতা লাভ, (২) তাহার ফল মানস-ভাণ্ডারে জমা রাখা ও (৩) তাহা পুনঃ চেতনার কেন্দ্রস্থলে আনয়ন করা।

ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে অভিজ্ঞতাগুলিই আমাদের মানসিক ভাণ্ডারে জমা থাকে না, তাহাদের ফলগুলি (engrams) জমা থাকে। তাহারাও স্বতন্ত্রভাবে থাকে না, **পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলগুলির সহিত মিলিত হইয়া**

এক-একটা ভাব-সংহতি বা ভাব-গুচ্ছের (complex) **সৃষ্টি হয়** এবং সেই আকারেই জমা থাকে।

এই **ভাব-সংহতি গঠনে তিনটা জিনিষ সাহায্য করে।** যথা,—(১) **সামীপ্য,** (২) **সাদৃশ্য** এবং (৩) **কোন একটা বিষয়ের সহিত সম্পর্ক।**

সামীপ্য দুই প্রকার—(১) সাময়িক ও (২) স্থানীয়। যে সকল ঘটনা এক সময়ে বা পর পর ঘটে তাহাদের মধ্যে সাময়িক সামীপ্য থাকে এবং যে সকল ঘটনা একই স্থানে ঘটে তাহাদের মধ্যে স্থানীয় সামীপ্য থাকে। যে সকল ঘটনার মধ্যে স্থানীয় বা সাময়িক সামীপ্য থাকে অর্থাৎ একই সময়ে বা পর পর ঘটে বা একই স্থানে ঘটে, তাহাদের অভিজ্ঞতার ফলগুলি মিলিত হইয়া মানস ভাণ্ডারে এক-একটা ভাব-সংহতির সৃষ্টি হয়।

যে সকল বস্তু, বিষয় বা ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য আছে তাহাদের অভিজ্ঞতার ফলগুলি মিলিত হইয়াও এক এক একটা ভাব-সংহতির সৃষ্টি হইতে পারে।

ইহা ছাড়া যে সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক থাকে তাহারা মিলিয়াও একটা ভাব-সংহতির সৃষ্টি হয়। যথা,—একটা দীর্ঘকালব্যাপী মহোৎসবের ঘটনাগুলি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে ঘটিয়া থাকিলেও তাহাদের অভিজ্ঞতার ফলগুলি মিলিয়া একটা ভাব-সংহতি গঠিত হইবে।

মানসিক ভাণ্ডারে গচ্ছিত অভিজ্ঞতার ফলগুলিই আমাদের **মানসিক প্রবৃত্তির** (disposition) সৃষ্টি করে এবং অজ্ঞাতসারে আমাদের চিন্তাধারা প্রভাবিত করে।

শাব্দিক স্মৃতি ও যৌক্তিক স্মৃতি (Rote memory and rational memory)।

কোন বিষয় পড়িয়া বা শুনিয়া তাহা অক্ষরশঃ মনে রাখার ক্ষমতাকে শাব্দিক স্মৃতি বলে। ইহার সহিত অর্থবোধের সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। এই শক্তি মানব-মস্তিষ্কের সহজাত উপাদানের বা স্নায়ু প্রণালীর উপর নির্ভর করে। সুতরাং সকলের শাব্দিক স্মৃতি সমান নহে এবং উহা বৃদ্ধি করাও যায় না। অল্পবয়সেই শাব্দিক স্মৃতিশক্তি প্রবল থাকে এবং

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাব্দিক স্মৃতি হ্রাস পায়। ১০।১১ বৎসর বয়সেই শাব্দিক স্মৃতি সর্বাপেক্ষা সতেজ থাকে, ১৫।১৬ বৎসর পর্যন্ত অনেকটা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার পর হ্রাস পায়। ২৫ বৎসরের পর অনেকটা লোপ পায় বলা যায়। তবে চর্চার ফলে ইহার ব্যতিক্রম হইতেও দেখা যায়।

কোন বিষয় পড়িয়া বা শুনিয়া তাহা অক্ষরশঃ মনে না থাকিলেও তাহার ভাব বা ধারণা মনে থাকিতে পারে। ভাব বা ধারণা মনে রাখিবার জন্য বিষয়টির অর্থবোধের প্রয়োজন। তাহার পর বিভিন্ন ভাব বা ধারণাগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও ভাব-সংহতি গঠন করিয়াই কোন বিষয়ের ভার বা ধারণা মনে রাখা যায়। এই প্রণালীতে **কোন বিষয়ের ভাব বা ধারণা মনে রাখার শক্তিকে যৌক্তিক স্মৃতি বলে ইহা স্বভাবজাত নহে, অর্জিত।** সুতরাং ইহার বিকাশ সাধন করা যায়।

অর্থবোধহীন শাব্দিক স্মৃতি চর্চার দোষ।

না বুঝিয়া মুখস্থ করার ন্যায় অনিষ্টজনক আর কিছুই নাই। কারণ অর্থের বা ভাবের অনুসরণ না করিয়া কোন বিষয়ের ভাষা মুখস্থ করিলে বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, বাগিন্দ্রিয়ের ব্যবহার বা কতকগুলি শব্দের উচ্চারণ শিক্ষা হইতে পারে মাত্র। অর্থানুসরণ না করিলে চিন্তার কাজও হয় না বলিয়া ইহার দ্বারা চিন্তাশক্তিরও বিকাশ হয় না। সুতরাং না বুঝিয়া মুখস্থ করিলে ছাত্রের জ্ঞানবৃদ্ধি বা মানসিক বিকাশ কিছুই হইতে পারে না, সে কেবল বাক্‌সর্বস্ব (verbose) হইতে পারে। শুধু তাহা নহে, অর্থবোধহীন শাব্দিক স্মৃতিচর্চার ফলে বোধশক্তি ও বিচারশক্তি হ্রাস পায়। এমন কি সাধারণ বিষয়জ্ঞান (common sense) পর্যন্ত লোপ পায়। তাই দেখা যায় যে কেহ কেহ সমস্ত বিষয় আবৃত্তি করিতে পারিলেও একটা কঠিন বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না, এমন কি বিচার করিয়া সাধারণ কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না।

অল্প বয়সে শাব্দিক স্মৃতি প্রবল থাকে বলিয়া অনেকে শিশুকে কেবল শাব্দিক স্মৃতির সাহায্যেই শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে শিশুর কত অনিষ্ট হয় তাহা চিন্তা করিয়া এই অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে **অর্থ বা ভাব অনুসরণ করিয়া অক্ষরশঃ মুখস্থ করা**

কিছুমাত্র খারাপ নহে। **অর্থবোধহীন শাব্দিক স্মৃতি চর্চার অভ্যাসই সর্বথা বর্জনীয়।**

শিক্ষাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি—অনেকের ধারণা যে শিক্ষা করার শক্তি ও স্মরণ রাখার শক্তি এক ; তাহা ঠিক নহে। **একটা বিষয় কয়েকবার পড়িয়া তখনই তাহা পুনরাবৃত্তি করার শক্তিকে শিক্ষাশক্তি বলা হয়, কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া কিছু সময় পরে তাহা পুনরাবৃত্তি করার শক্তিকে স্মৃতিশক্তি বলে।**

শিক্ষাশক্তি ও স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা

কতকগুলি অর্থহীন বাক্যাংশ কয়েকবার পড়িয়া একই ক্রমে পুনরাবৃত্তি করিতে বলা যায়। যে যত কমবার পড়িয়া পুনরাবৃত্তি করিতে পারে তাহার শাব্দিক শিক্ষা ততই প্রবল।

একটা পরিচ্ছেদ বা ছোট কবিতা কয়েকবার পঠনের পর তাহার সারমর্ম বর্ণনা করিতে বলা যায়। যে যত কমবার পড়িয়া তাহার সম্পূর্ণ ভাব গ্রহণ করিতে পারে ও বর্ণনা করিতে পারে তাহার যৌক্তিক শিক্ষাশক্তি ততই প্রবল।

কতকগুলি অর্থহীন বাক্যাংশ একবার শিক্ষা করার পর যত বেশী সময় অতিবাহিত হইলে, সেগুলি যে পুনঃ না পড়িয়া বা পূর্বাপেক্ষা যত কমবার পড়িয়া পুনরাবৃত্তি করিতে পারে তাহার শাব্দিক স্মৃতি ততই প্রবল। কোন একটা বিষয় শিক্ষা করিয়া যত বেশী সময় ব্যবধানে যে পুনঃ না পড়িয়া বা পূর্বাপেক্ষা যত কমবার পড়িয়া তাহার সম্যক্ মর্মগ্রহণ ও বর্ণনা করিতে পারে তাহার যৌক্তিক স্মৃতি ততই প্রবল।

স্মরণ রাখিবার উপায় বা নিয়ম (Laws of remembering)। সহজাত স্মরণশক্তি যেরূপই হউক না কেন কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়া স্মরণ রাখার কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করা যায়। ঠিক ভাবে কোন বিষয় শিক্ষা করার উপর তাহা স্মরণ রাখা অনেকটা নির্ভর করে। তাই শিক্ষার নিয়ম ও স্মরণ রাখার নিয়ম প্রায় সমরূপ বোধ হইবে। নিম্নে তাহাদের আলোচনা করা হইল।

(১) **প্রভাবের শক্তি।** প্রভাব যতই প্রবল হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া বা অভিজ্ঞতা তত বেশী স্মরণ থাকে। সেই জন্যই যে শিশু একবার আগুনে হাত পুড়িয়াছে সে চিরকাল আগুনকে ভয় করে।

(২) **মনের সতেজ অবস্থায় শিক্ষালাভ।** আমরা মানস-পটে যে বিষয়ে যত উজ্জ্বল ছবি গ্রহণ করি তাহা তত বেশী স্মরণ থাকে। মন যখন সতেজ থাকে তখনই কোন বস্তু বা বিষয়ের উজ্জ্বল ছবি মানস-পটে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং মনের সতেজ অবস্থায় জ্ঞান লাভ করিলেই তাহা বেশী স্মরণ থাকে। অল্প বয়সে মন সতেজ থাকে বলিয়া বালক-বালিকাদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর হয়। রাত্রির বিশ্রামের পর ভোর হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত মন সতেজ থাকে এবং তাহার পর ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত হয়। মানসিক বিশ্রাম বা শারীরিক পরিশ্রম ও খাদ্যের দ্বারা অবসাদ দূর করিয়া মনকে পুনঃ সতেজ করা যায়।

(৩) **বেশী ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার।** যত বেশী ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করিয়া জ্ঞান অর্জন করা যায় তাহা তত বেশী স্মরণ থাকে। যথা,—কেবল শুনিয়া বা পড়িয়া মনে রাখা হইতে, দেখিয়া, পড়িয়া, শুনিয়া ও লিখিয়া কোন বিষয় শিক্ষা করিলেই তাহা বেশী স্মরণ থাকিবে।

(৪) **গভীর মনোযোগ দান।** আমরা যে বিষয়ে যত বেশী মনোযোগ দিই সেই বিষয় তত বেশী স্মরণ থাকে। কোন বিষয় আমাদের চেতনার ক্ষেত্রে স্থান পাইলেও যদি আমাদের মনোযোগ লাভ না করে তাহা আমাদের স্মরণ থাকে না। সেই জন্যই দৈনন্দিন সমস্ত ঘটনা বেশী দিন আমাদের মনে থাকে না, কেবল যেই যেই ঘটনা আমাদের বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে সেইগুলিই বেশী দিন মনে থাকে। অতএব **যে বিষয় আমরা মনে রাখিতে ইচ্ছা করি তাহার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।**

(৫) **আনন্দদায়ক ফল ও অনুরাগ স্থষ্টি** (Resultant Satisfaction and Creation of Interest)। পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে যে অনুরাগ ও মনে রাখিবার ইচ্ছা স্মরণ রাখার কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করে। কারণ কোন বিষয়ে অনুরাগ না জন্মিলে এবং তাহা মনে রাখিবার জন্য আগ্রহ না হইলে তাহার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া হইবে না এবং তাহার

পুনঃ পুনঃ ব্যবহার বা আবৃত্তি হইবে না। অপরদিকে কোন কাজ করার বা কোন বিষয় শিক্ষা করার ফল আনন্দদায়ক হইলেই তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিবে বা মনোযোগ দেওয়া হইবে এবং তাহার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার বা আবৃত্তি করা হইবে। সুতরাং যেই বিষয় শিক্ষার ফল আনন্দদায়ক হয় তাহা বেশী স্মরণ থাকে।

(৬) **ভাবসংহতি গঠন**—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের অভিজ্ঞতার ফলগুলি ভাবসংহতি বা ভাবগুচ্ছের আকারেই আমাদের মানসপটে সঞ্চিত হয়। এক এক ভাবগুচ্ছের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন বিষয়ে পুনঃ অভিজ্ঞতা হইলে সেই ভাবগুচ্ছের অন্তর্গত সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের স্মরণ হয়। সুতরাং আমরা যখন কোন নূতন জ্ঞান লাভ করি তখন তাহাকে যদি আমাদের মানস-ভাণ্ডারে সঞ্চিত পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলগুলির সহিত মিলাইয়া একটা ভাবসংহতি গঠন করিতে পারি, তাহা হইলেই তাহা স্মরণ করা সহজ হয়।

(৭) **পৌনঃপুন্য** (Repetition)—কোন লেখা বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত না দেখিয়া তাহার সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা বার বার পাঠ করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইলে বিষয়টি একবার নির্ভুল ভাবে আবৃত্তি করিতে পারিলেই পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা যাইবে না। তাহার পরেও কয়েকবার আবৃত্তি না করিলে স্মরণ থাকিবে না। লেখা বিষয়ের ন্যায় অন্য বিষয় বা কাজ শিক্ষা করিতে এবং স্মরণ রাখিতেও পৌনঃপুন্যের সাহায্য লইতে হয়।

কোন কাজ বা বিষয় একবার খুব ভালরূপে শিক্ষা করিলেও চিরকাল স্মরণ থাকে না। তাহার পরেও মাঝে মাঝে তাহার চর্চা করিতে হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে কোন বিষয় একসঙ্গে অনেকক্ষণ শিক্ষা না করিয়া কিছু সময় পর পর, বার বার শিক্ষা করিলে ভাল স্মরণ থাকে; তবে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়ার পূর্বে পুনঃ শিক্ষা করিতে হয়। প্রথমে অল্প সময় পর পর পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। পরে বেশী সময় পর পর পুনরাবৃত্তি করিলেও স্মরণ থাকে। প্রথম শিক্ষার এক বা দুই দিন পরে পুনঃ শিক্ষা করিলেই ভাল স্মরণ থাকে।

(৮) **আবৃত্তি ও অভিনয়** (Recitation and Acting)—সাধারণভাবে পড়া হইতে আবৃত্তি বা অভিনয়ের আকারে পাঠ করিলেই বেশী স্মরণ থাকে।

(৯) **এক সঙ্গে সমগ্র শিক্ষা**। এক এক অংশ শিক্ষা করার চেয়ে এক সঙ্গে সমগ্র শিক্ষা করিলেই ভাল স্মরণ থাকে। যথা,—কোন কবিতার এক এক স্তবক শিক্ষা না করিয়া এক সঙ্গে সমগ্র কবিতাটি বার বার পড়িয়া শিক্ষা করিলেই ভাল স্মরণ থাকে। অথবা এক এক বাক্য মুখস্থ না করিয়া এক সঙ্গে সমগ্র অনুচ্ছেদ (Paragraph) বার বার পড়িয়া শিক্ষা করিলে ভাল মনে থাকে। তবে কবিতা বা অনুচ্ছেদ খুব দীর্ঘ হইলে তাহাকে ২।৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগ শিক্ষা করা যায় এবং পরিশেষে সমস্ত বিষয় একসঙ্গে শিক্ষা করা যায়।

(১০) **কল্পনার সাহায্যে শিক্ষা**। কল্পনাও স্মরণ রাখার কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করে। কোন বিষয়ের বর্ণনা পড়ার বা শুনার সঙ্গে সঙ্গে যদি কল্পনার সাহায্যে তাহার জীবন্ত মানসিক ছবি গঠন করা যায় তবেই বর্ণনা ঠিক ভাবে অনুসরণ করা যায় এবং বর্ণিত বিষয় দীর্ঘকাল মনে রাখা যায়। বস্তুতঃ সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় কল্পনার সাহায্য ব্যতীত ভালরূপে শিক্ষা করাও যায় না, স্মরণ রাখাও যায় না।

(১১) **ভাষা**—Mr. Watsonএর মতে ভাষার সহিত স্মরণ রাখা কার্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আমরা যে-কোন উপায়েই যে-কোন জ্ঞান লাভ করি না কেন তাহা যদি ভাষায় বর্ণনা করি তাহা হইলেই তাহা বেশী স্মরণ থাকে। সুতরাং কোন বিষয় মনে রাখিতে হইলে তাহা শিক্ষার পর তাহার মৌখিক বা লিখিত বর্ণনা দিতে বলা ভাল। তবে ভাষার সাহায্য না লইয়া কিছুই স্মরণ রাখা যায় না-তাহা সকলের মত নহে। কারণ ভাষার সাহায্য না লইয়া কোন কাজ করিয়াও স্মরণ রাখা যায়।

(১২) **কার্যের ভিতর দিয়া শিক্ষা বা কার্যে প্রয়োগ**। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে **পঠিত বা শ্রুত অভিজ্ঞতা হইতে হস্তের সাহায্যে বা কাজের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা বেশী দিন স্মরণ থাকে।** সুতরাং পাঠদানের সময় সম্ভব হইলে ছাত্রকে নিজ হস্তে কাজ করিতে দেওয়া উচিত

এবং অর্জিত জ্ঞান কোন কাজে প্রয়োগ করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই তাহা অধিক দিন স্মরণ থাকিবে।

(১৩) **বিচার—যৌক্তিক স্মৃতি প্রধানতঃ বিচার কার্যের উপর নির্ভর করে।** দোষ-গুণ সমালোচনা, সমরূপ অন্য বিষয়ের সহিত তুলনা, কার্যকারণ সম্পর্ক-স্থাপন প্রভৃতির সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিলে তাহা বেশী দিন স্মরণ থাকে। বস্তুতঃ লোকের পক্ষে বিচারকার্যই স্মরণ রাখার সর্বপ্রধান উপায়। কারণ তাহাদের শাব্দিক স্মৃতি লুপ্তপ্রায় হওয়ায় তাহাদিগকে যৌক্তিক স্মৃতির সাহায্যেই স্মরণ রাখিতে হয়।

(১৪) **অর্থবোধ**—অর্থহীন হইতে অর্থযুক্ত কথা বেশী মনে থাকে। সুতরাং অর্থযুক্ত বাক্যের আকারে শব্দ ইত্যাদি শিক্ষা করিলে এবং অর্থের অনুসরণ করিয়া পড়িলে বেশী মনে থাকিবে।

(১৫) **সরব পঠন ও নীরব পঠন**—কোন বিষয় অক্ষরশঃ মনে রাখিতে হইলে সরব পঠনের প্রয়োজন, কোন বিষয়ের ভাব মনে রাখিতে হইলে নীরব পঠনই বেশী উপযোগী।

ভুলিয়া যাওয়ার কারণ বা নিয়ম (Laws of Forgetting)।

(১) দুর্বল প্রভাবের প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকাল স্মরণ থাকে না। তাই কোন বিষয়ের ধারণা সুস্পষ্ট ও গভীর না হইলে তাহা স্মরণ থাকে না।

(২) অর্থহীন বিষয় খুব ভালরূপে শিক্ষা করিলেও দীর্ঘকাল স্মরণ থাকে না। সেরূপ অর্থানুসরণ না করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা করিলে তাহা স্মরণ থাকে না।

(৩) কোন বিষয় শিক্ষা করার পরও কয়েক বার পুনরাবৃত্তি না করিলে এবং ভুলিয়া যাওয়ার পূর্বে পুনঃ অভ্যাস না করিলে তাহা স্মরণ থাকে না।

(৪) কোন বিষয় খুব ভালরূপ শিক্ষা করা হইলেও দীর্ঘকাল তাহার পুনরাবৃত্তি বা অভ্যাস না করিলে তাহা বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হয়।

(৫) Freudএর মতে কোন বিষয় শিক্ষার ফল বা কোন অভিজ্ঞতা অপ্রীতিকর হইলে তাহা স্মরণ থাকে না। কারণ তাহার স্মৃতি কষ্টকর বলিয়া সকলে তাহা লোপ-সাধন (Repression) করিতে চাহে।

(৬) Watsonএর মতে কোন বিষয়ে শিক্ষা ভাষার সাহায্যে না লইলে তাহা স্মরণ থাকে না। তিনি বলেন যে ভাষার অভাবেই শিশু প্রথম ৩।৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখিতে পারে না।

(৭) শিশু অবসাদগ্রস্ত হইলে অনেক সুপরিজ্ঞাত বিষয়ও স্মরণ করিতে পারেনা। তাই একটানা দীর্ঘ সময়ব্যাপী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে শেষের দিকে ভাল উত্তর দিতে পারে না।

(৮) কোন একটা প্রবল ভাব বা চিন্তা মনকে অধিকার করিয়া থাকিলে তাহার সহিত সম্পর্ক-শূন্য অন্য বিষয়ের স্মৃতি জাগরিত করা যায় না। সেই জন্য একটা প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া ২।১ মিনিট বিশ্রামের পর অন্য প্রশ্নের উত্তর লেখা ভাল।

References

1. Sandiford—Educational Psychology, Chap. XII.
2. J. Ross—Ground-work of Educational Psychology, Chap. XI.
3. P. Noun—Education: Its Data and First Principles, Chapts. IV-V.
4. Norseworthy and Whitley—The Psychology of Childhood, Chap. IX.
5. Sarat Ch. Brahmachari—ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, Chap. IX.
6. Dumville—Child Mind, Chap. X.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কল্পনা

আমরা যখন কোন একটা জিনিষ দেখি তখন তাহার ছবি আমাদের মানস-পটে অঙ্কিত হয়। পরে জিনিষটা আমাদের চোখের সামনে না থাকিলেও আমরা একটু চেষ্টা করিয়া তাহার ছবি মনে জাগরিত করিতে পারি। **যে মানসিক শক্তির সাহায্যে আমরা যে বস্তু বা বিষয় আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের সমীপে উপস্থিত নাই তাহার মানসিক ছবি গঠন করিতে পারি তাহাকেই কল্পনা বলে।** কল্পনার সাহায্যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-বিষয়ের মানসিক ছবি গঠিত হইতে পারে। যথা,—দর্শনবিষয়ক ছবি (Visual Image), শ্রবণবিষয়ক ছবি, (Auditory Image), ঘ্রাণবিষয়ক ছবি (Olfactory Image), স্পর্শবিষয়ক ছবি (Tactual Image) ইত্যাদি। অর্থাৎ আমরা কল্পনার সাহায্যে যে-কোন ইন্দ্রিয়বিষয়ের অভিজ্ঞতার মানসিক ছবি জাগরিত করিতে পারি।

কল্পনা তিন প্রকার—

(১) **পুনরুৎপাদনকারিণী কল্পনা** (Reproductive)—যে কল্পনার সাহায্যে আমরা পূর্বজ্ঞাত কোন বস্তু বা বিষয়ের ছবি পুনঃ পুনঃ মানস-পটে অঙ্কিত করিতে পারি তাহাকে **পুনরুৎপাদনকারিণী** (Reproductive) **কল্পনা** বলে। এই শ্রেণীর কল্পনা স্মৃতিশক্তিরই নামান্তর মাত্র। কারণ ইহাতে আমরা পূর্বলব্ধ মানসিক ছবিকেই পুনঃ পরিস্ফুট করি মাত্র। তবে পার্থক্য এই যে কোন মানসিক ছবির সাহায্য না লইয়াও স্মৃতির কাজ হইতে পারে, কিন্তু কল্পনার কাজ হইতে পারে না।

(২) **প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনা** (Constructive or Receptive)—কোন বস্তু, বিষয়, স্থান বা ঘটনার বর্ণনা পড়িয়া বা শুনিয়া আমরা কল্পনাবলে তাহার ছবি মানস-পটে অঙ্কিত করিতে পারি। ইহাকে **প্রত্যক্ষকারিণী**

কল্পনা বলে। কারণ ইহার সাহায্যে বর্ণিত বিষয় যেন আমাদের প্রত্যক্ষানুভূতির ক্ষেত্রে আসে।

(৩) **উদ্ভাবনী বা সৃষ্টিকারিণী কল্পনা** (Creative)—কোন অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা কল্পনার সাহায্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন বস্তু বা বিষয়েরও ধারণা করিতে পারি বা মানসিক ছবি গঠন করিতে পারি। এই প্রকারের কল্পনাকেই **উদ্ভাবনী বা সৃষ্টিকারিণী কল্পনা** বলে। যথা,—পাখী বায়ু হইতে ভারী হইলেও যতক্ষণ শূন্যে উড়িতে থাকে ততক্ষণ ভূপতিত হয় না দেখিয়া একজন বৈজ্ঞানিক মনে করিলেন যে, যদি একটা কোনরূপ হাল্‌কা যানকে পাখীর ন্যায় শূন্যপথে বেগে চালিত করা যায় তবে তাহা ভূপতিত হইবে না এবং তাহার সাহায্যে মানুষ পাখীর ন্যায় শূন্যপথে বিচরণ করিতে পারিবে। এইরূপ কল্পনার ফলেই বর্তমান এরোপ্লেনের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি কোনদিন এরোপ্লেন না দেখিয়া থাকিলেও পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে ও সংমিশ্রণে বর্তমান এরোপ্লেনের ন্যায় একটা যানের মানসিক ছবি গঠন করিতে পারিয়াছিলেন ; কাজেই কালক্রমে এরোপ্লেন তৈয়ার করা সম্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ **উদ্ভাবনী বা সৃষ্টিকারিণী কল্পনাকেই মৌলিক কল্পনা বা বিশুদ্ধ কল্পনা বলা যায়**। কারণ ইহাতে পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে হইলেও ইহার ফলে যে নূতন জিনিষ বা বিষয়ের ছবির সৃষ্টি হয় তাহা পূর্ব অভিজ্ঞতার বস্তু বা বিষয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পূর্ব অভিজ্ঞতার বা বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য কোন মানসিক ছবি গঠন করাই যায় না। যাহাকে খেয়াল বা আকাশকুসুম বলা হয় তাহাও বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য নহে। তাহা অসম্ভব কল্পনা বলিয়াই তাহাকে অবাস্তব বা আকাশকুসুম কল্পনা বলা হয় এবং তাহার নিন্দা করা হয়।

কল্পনা-শক্তির প্রভাব বা গুরুত্ব

অনেকে খেয়াল বা আকাশকুসুম ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য না করিয়া কল্পনার অযথা নিন্দা করেন। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে কল্পনার সাহায্য লইতে না শিখিলে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার নিতান্ত সংকীর্ণ থাকিয়া যাইত এবং উন্নতির ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িত। কেননা, কল্পনার সাহায্য না

লইয়া আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞান-ক্ষেত্রের বাহিরের কোন বিষয় সম্বন্ধে ধারণা করিতে বা চিন্তা করিতে পারি না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় সকল সময় আমাদের নিকট উপস্থিত থাকিতে পারে না। সুতরাং পুনরুৎপাদিনী কল্পনার সাহায্য ব্যতীত আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার চিত্রগুলিও পরে পুনঃ জাগরিত করিতে পারিতাম না এবং ভবিষ্যতে কোন কাজে তাহাদের সাহায্য লইতে পারিতাম না। প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার সাহায্য ব্যতীত আমরা পুস্তক পড়িয়া বা বর্ণনা শুনিয়া বর্ণিত বিষয়ের মানসিক ছবি গঠন করিতে পারিতাম না। সকল লোকের উদ্ভাবনী বা সৃষ্টিকারিণী কল্পনাশক্তি সমান না থাকিলেও এবং দৈনন্দিন জীবনে সকল সময়ে তাহার প্রয়োজন না হইলেও, তাহার স্থান সর্বাপেক্ষা উচ্চে। কারণ কাহারও এই কল্পনাশক্তি না থাকিলে আমরা কোন নূতন সত্য বা নূতন জিনিষ আবিষ্কার করিতে পারিতাম না। আমাদিগকে সম্পূর্ণ অবস্থার দাস হইয়া থাকিতে হইত, তাহার কোন পরিবর্তন করা বা কোন উন্নতি করা সম্ভব হইত না। যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানবজাতি আজ উন্নতির এত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, একমাত্র উদ্ভাবনী কল্পনার সাহায্যেই তাহা সম্ভব হইয়াছে।

কল্পনার সাহায্যেই সরল, ভাবপূর্ণ ও চিত্তমুগ্ধকর সাহিত্য ও সঙ্গীত রচনা করিয়া এবং সুন্দর মনোমুগ্ধকর চিত্র অঙ্কিত করিয়া মানুষকে অপরিসীম আনন্দ দেওয়া যায়; শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া মানুষকে সম্পদশালী করা যায়; নানা আশ্চর্যজনক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়া এবং তাহাদের দ্বারা প্রকৃতিকে মানুষের কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে কল্পনা-শক্তির ব্যবহার ও বিকাশের সুযোগ

বিভিন্ন প্রকারের কল্পনা-শক্তির ব্যবহার করিবার সুযোগ ও উৎসাহ দিয়াই শিশুর কল্পনা-শক্তির বিকাশ করা যায়।

৪ বৎসর হইতে ৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু সম্ভব-অসম্ভব বিচার না করিয়া অদ্ভুত পরীর গল্প ও দৈত্যদানবের গল্প প্রভৃতি শুনিতে ভালবাসে। শৈশবের এইরূপ অবাস্তব কল্পনাও তাহার কল্পনা-শক্তিকে পুষ্ট করে এবং

ভবিষ্যতে সৃষ্টিকারিণী কল্পনার জন্য শিশুর মনকে প্রস্তুত করে। কিন্তু ইহাতে আকাশকুসুম সৃষ্টির অভ্যাস গঠিত হইতে পারে এবং শিশু তাহার জীবনে বাস্তব জগতের সহিত মিল রাখিতে অসমর্থ হইতে পারে। এইজন্য Dr. Montessori শিশুদের পরীর গল্প শিক্ষা দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে তাহার পরিবর্তে মানুষের দুঃসাহসিক কাজের কাল্পনিক গল্পও শিক্ষা দেওয়া যায়।

৯।১০ বৎসর বয়সে বালক-বালিকারা সম্ভব-অসম্ভব বিচার করিতে শিখে; সুতরাং এই সময়ে তাহাদিগকে পুনরুৎপাদিনী ও প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার সাহায্যে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়। প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের যাহা কিছু অভিজ্ঞতা হয় পরে তাহার বর্ণনা দিতে ও সময়ে সময়ে অতীত ঘটনার বর্ণনা দিতে বলিলে তাহাদের পুনরুৎপাদিনী কল্পনা-শক্তির চর্চা ও বিকাশ হইবে। স্মৃতির সাহায্যে কোন জীব বা জন্তুর ছবি আঁকিতে দিলেও এই কল্পনা-শক্তির বিকাশ হইবে। কল্পনার সাহায্যে বর্ণিত বিষয়ের মানসিক ছবি গঠন করিয়া সুন্দর সুন্দর বর্ণনামূলক কবিতা, ইতিহাসের গল্প, ভৌগোলিক বর্ণনা প্রভৃতি পড়িতে শিক্ষা দিলে তাহাদের জ্ঞান সুস্পষ্ট ও সঠিক হইবে এবং প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনা-শক্তির চর্চা ও বিকাশ হইবে। বর্ণনা পড়িবার বা শুনিবার পরই **নিজ ভাষায়** বর্ণনা দিতে বলিলে তাহাদের মনে বর্ণিত বিষয়ের ছবি গঠিত হইয়াছে কিনা বুঝা যাইবে। প্রশ্নের সাহায্যেও ইহা পরীক্ষা করা যায়। অঙ্কনবিদ্যায় কিছু দক্ষতা অর্জন করিলে বর্ণিত বিষয়ের ছবি আঁকিতেও দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার সাহায্যে শিক্ষা না করিলে ছাত্র কবিতা পড়িয়া তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে না; ভৌগোলিক বর্ণনা পড়িয়া বিভিন্ন স্থান বা প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারে না; ঐতিহাসিক কাহিনী তাহার নিকট বাস্তব আকার ধারণ করে না।

সৃষ্টিকারিণী কল্পনার বিকাশের জন্য শিশুগণকে প্রথমে কাদামাটি দিয়া নানা প্রকার জিনিষ তৈয়ার করিতে দেওয়া যাইতে পারে; কাগজ কাটিয়া বা কাঠের টুকরার সাহায্যে ঘর, পুল, জন্তু ইত্যাদি তৈয়ার করিতে পারে, কাল্পনিক

মনোরম চিত্র আঁকিতে পারে ; কতকগুলি প্রাণী, মানুষ ও স্থানের নাম বলিয়া তাহাদের সাহায্যে কবিতা ও গল্প রচনা করিতে দেওয়া যাইতে পারে ; সমস্যামূলক পদ্ধতিতে নানা প্রকার কাজ করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তবে দেখিতে হইবে যে তাহারা যেন কেবল অনুকরণ করিয়া কাজ না করে, চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে এই সমস্ত কাজ করে।

যৌবনোন্মুখ বয়সে বালক-বালিকারা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয় এবং তাহাদের কল্পনা নিজ বিষয়ক ও আদর্শমূলক হয়। তাহারা এই সময়ে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নে বিভোর থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে এই সময়ে আদর্শমূলক কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টির, কবিতা রচনার ও চিত্র অঙ্কনের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। খ্যাতনামা মনীষিগণের জীবনী শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের আদর্শে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা (Plan) তৈয়ার করিতে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে।

যৌবনোন্মুখ বয়সের পর কল্পনা-শক্তি হ্রাস পায়, কিন্তু লোপ পায় না। তখন মানুষ কোন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই কল্পনার আশ্রয় লইয়া থাকে। কিন্তু তখন ভাবপ্রবণতা কমিয়া যায় এবং ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় বলিয়া তাহারা ধৈর্যের সহিত কোন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে ও সংমিশ্রণে নূতন জিনিষ সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর থাকিতে পারে। সুতরাং এই বয়সেই প্রকৃত উদ্ভাবনী কল্পনার বেশী চর্চা হইতে পারে। ভাববৃত্তির সাহায্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিলেই উদ্ভাবনী কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, **বিভিন্ন কল্পনা-শক্তির ব্যবহার করিয়া নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া গেলে কল্পনা-শক্তিরও বিকাশ হইবে এবং শিক্ষাদান কার্যও অধিকতর ফলপ্রসূ এবং আনন্দদায়ক হইবে।**

References

1. Norseworthy and Whitley—Psychology of Childhood, Chap. XI.
2. J. Ross—Ground-work of Educational Psychology, Chap. XII.
3. Sarat Chandra Brahmachary.—ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, একাদশ অধ্যায়।
4. Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study, Chap. XVI.
5. Dumville—Child Mind, Chap. V.
6. Douglas and Holland—Fundamentals of Educational Psychology, Chap. XVI.

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

যুক্তি ও বিচার

(Reasoning & Judgment)

দুই বা বহু বস্তু বা বিষয়ের তুলনা করিয়া তাহাদের মধ্যে কি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে, কি সম্বন্ধ আছে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ ইত্যাদি নির্ধারণ করিবার জন্য যে মানসিক কাজ করিতে হয় তাহাকে বিচার বলে। বিচার-কার্যকে **দুই ভাগে বিভক্ত** করা যায়—**তুলনা ও সিদ্ধান্ত**। অবশ্য ভালরূপে তুলনা করিবার জন্য বস্তু বা বিষয়কে বিশ্লেষণ করিয়াও দেখিতে হয়। বস্তুতঃ **তুলনাই বিচারের ভিত্তি।** দুইটি বস্তু, কাজ বা ধারণার তুলনা করিয়াই আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি। কেবল একটা বস্তু বা বিষয়ের বিচার করিতে হইলে তাহার ভাল দিক ও খারাপ দিকের তুলনা করিয়াই আমরা তাহা ভাল কি মন্দ সিদ্ধান্ত করি। অথবা সেই জাতীয় ভাল বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যে আদর্শ আছে তাহার সহিত তুলনা করিয়াই সিদ্ধান্ত করি। যে ধারণা বা আদর্শের সাহায্যে আমরা একটা বস্তু বা বিষয়ের বিচার করি তাহাকে **বিচারের মাপকাঠি** (Standard) বলে। অপর দিকে **সিদ্ধান্ত করাই বিচারের ফল বা পরিণতি।** যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বিচার-কার্য সম্পূর্ণ হয় না।

যুক্তির সাহায্যে বিচার

ইহা ছাড়া আরও এক প্রকারের বিচার-কার্য করিতে হয়। যুক্তির সাহায্যেই এই বিচার-কার্য সম্পাদিত হয়। যুক্তি **দ্বিবিধ—আরোহী** (Inductive) ও **অবরোহী** (Deductive)। **কতকগুলি উদাহরণ হইতে একটা সিদ্ধান্ত করাকে আরোহী প্রণালী বলে। তাহার পর সেই সিদ্ধান্তের প্রয়োগ করিয়া নূতন নূতন উদাহরণের বিচার করাকে**

অবরোহী প্রণালী বলে। যথা,—রাম মরিয়াছে, শ্যাম মরিয়াছে, যদু মরিয়াছে, সুতরাং মানুষ মরণশীল (আরোহী-প্রণালী)। মানুষ মরণশীল ; রাম, শ্যাম ও যদু মানুষ ; সুতরাং তাহারা সকলে মরিবে (অবরোহী প্রণালী)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যুক্তি ও বিচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে, **যুক্তি বিচার-কার্যেরই অংশ**। তুলনা বা যুক্তি ও সিদ্ধান্ত দুইটা লইয়াই বিচার-কার্য সম্পূর্ণ হয়।

বিচার-শক্তির বিকাশের প্রয়োজনীয়তা

বিচারের সাহায্য ব্যতীত আমরা কোন বস্তুর বা বিষয়ের সঠিক জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। কেননা তাহার ভালমন্দ দুই দিক বিচার করিয়া না দেখিলে তাহার সঠিক জ্ঞান লাভ হয় না। সেরূপ অন্য বস্তুর সহিত তাহার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলনা করিয়া না দেখিলে তাহার সম্বন্ধে জাতিজ্ঞানও হয় না। শুধু তাহা নহে, দুইটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা জাতিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও বিচার-শক্তির সাহায্য লইতে হয়। জ্ঞানলাভের জন্য যেমন বিচারের প্রয়োজন **জ্ঞান ঠিক ভাবে ব্যবহার করিয়া কাজ করিবার জন্যও বিচারের সাহায্য লইতে হয়**। কেননা, কোন্ কাজ ভাল এবং কোন্ কাজ মন্দ তাহা বিচার করিয়াই আমরা ভাল কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি এবং মন্দ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি। সুতরাং **শিশুর চরিত্রগঠনের জন্যও তাহার বিচার-শক্তির বিকাশের একান্ত প্রয়োজন**। বস্তুতঃ ভাল-মন্দ ঠিক ভাবে বিচার করিয়া কাজ করার শক্তিদানই প্রকৃত চরিত্রগঠন।

বিচার-শক্তির বিকাশের উপায়

(১) **প্রত্যক্ষজ্ঞান ও জাতিজ্ঞান বৃদ্ধি**। প্রত্যক্ষজ্ঞান ও জাতিজ্ঞান বৃদ্ধির ফলে যতবেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় ততই প্রয়োজনমত বিশ্লেষণ ও তুলনা করিয়া ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার শক্তি জন্মে। ভাল প্রত্যক্ষজ্ঞান ও জাতিজ্ঞান না থাকিলে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিবার সম্ভাবনা বেশী।

(২) **প্রত্যেক বিষয় বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে উৎসাহ-দান ও অভ্যাস-গঠন**। কি শারীরিক, কি মানসিক সমস্ত শক্তিই ব্যবহার বা চর্চার

ফলেই বিকশিত হয়। সুতরাং বিচার করিয়া কাজ করিলেই বিচার-শক্তিরও বিকাশ হয়।

(৩) **বিনাবিচারে অন্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস ত্যাগ।** অবশ্য শিশুরা প্রথমে বিচার করিয়া কাজ করিতে পারে না, পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের নির্দেশমত তাহাদিগকে চলিতে হয়। কিন্তু বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিনাবিচারে বা অন্ধভাবে অন্যের নির্দেশমত কাজ করার অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই নহে যে, তাহাদিগকে সকল সময় গুরুজনের অবাধ্য হইতে হইবে। গুরুজন তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং তাহাদের বিচার-ক্ষমতা বেশী, এই দুই কথা স্মরণ রাখিয়া তাহাদের আদেশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, গুরুজন ন্যায্য ও মঙ্গলজনক আদেশই দিয়াছেন। তবুও সন্দেহ থাকিলে বিনীতভাবে তাহা প্রকাশ করিতেও পারে, বরং তাহা করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। তবে সম্পূর্ণ বয়োপ্রাপ্তির পরে নিজের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া অন্য কাহারও সিদ্ধান্ত মানিয়া চলা উচিত নহে।

(৪) **প্রবৃত্তি বা ভাবপ্রবণতা দমন করিতে শিক্ষাদান।**

প্রবৃত্তিবশে বা ভাবাবেগে নিজ প্রীতিকর কাজ করিতে গেলে ভুল করিবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। ভাল লাগিতেছে বলিয়াই কোন কাজ করা উচিত নহে, ভাল লাগিতেছে না বলিয়া কোন কাজ অবহেলা করাও উচিত নহে। বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, যে কাজ ভাল বোধ হইতেছে তাহা প্রকৃতই ভাল বা মঙ্গলকর কিনা, যাহা খারাপ বোধ হইতেছে তাহা প্রকৃতই খারাপ বা অনিষ্টকর কিনা।

(৫) **তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিবার অভ্যাস ত্যাগ।**

যথাযথরূপে বিশ্লেষণ ও তুলনা না করিয়া তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিলে ভুল সিদ্ধান্ত করিবার সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং ছাত্রগণকে ধীর-স্থির ভাবে বিচার করিয়া কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

(৬) **ভাল আদর্শের সাহায্যে বিচার।** শিশুদের সাম্‌নে সর্বদা ভাল ভাল আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহাদের সহিত তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে শিক্ষা দিতে হইবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিচার-শক্তির ব্যবহারের ও বিকাশের সুযোগ

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বিচার-শক্তির ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া বিচার-শক্তির বিকাশ করা যায়। প্রকৃত শিক্ষাদান করিতে হইলে প্রত্যেক বস্তু, বিষয় বা কাজ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার প্রবৃত্তি জাগাইতে হয় ও সুযোগ দিতে হয়। কারণ বিচার করিয়া গ্রহণ না করিলে জ্ঞান ছাত্রের নিজস্ব হইতে পারে না। সমস্ত শিক্ষাকার্যের সহিত বিচার-কার্যের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে যে, বিচার-শক্তির চর্চা বা বিকাশের জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। **বিচার-শক্তির ব্যবহার ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিলেই ছাত্রের বিচার-শক্তির বিকাশ হইবে।** কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) কিণ্ডারগার্টেন ও মণ্টেসরী প্রণালীতে যে-সমস্ত খেলা বা কাজের ব্যবস্থা আছে তাহা ঠিকভাবে সম্পাদন করিলে বিচার-শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার হয়। যথা,—বিভিন্ন আকারের বা বর্ণের জিনিষগুলি ঠিকভাবে সাজাইতে হইলে যথেষ্ট বিচার করিতে হয়।

(২) ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার শিক্ষাদানের (Sense Training) সময়ও বিচার-শক্তির ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া যায়।

(৩) খেলা ও পড়া শিক্ষা—বর্ণগুলি লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষাদানের সময় তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাইলে বর্ণগুলি সহজে মনে থাকে এবং বিচার-শক্তিরও বিকাশ হয়। আদর্শের সহিত ভালরূপে মিলাইয়া লিখিতে দিলেও বিচার করিতে হয়।

(৪) চিত্রাঙ্কন—ছবি দেখিয়া বা আদর্শ দেখিয়া চিত্রাঙ্কন করিবার সময় অন্ধভাবে অনুকরণ না করিয়া বিশ্লেষণ ও তুলনা করিয়া আঁকিতে শিক্ষা দিলে বিচার-শক্তির চর্চা হয়।

(৫) কারণ ও ফল সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ইতিহাস শিক্ষা দিলে বিচার-শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার ও বিকাশ হয়।

(৬) প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে সম্পর্ক এবং মানব-জীবনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর প্রভাব দেখাইয়া ভূগোল শিক্ষা দিলেও বিচার-শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার হইতে পারে।

(৭) ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সময় সূত্র-গঠনে ও প্রয়োগে বিচারশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার হয়।

(৮) বিচার-শক্তির ব্যবহার না করিয়া জ্যামিতি ও গণিত শিক্ষা করাই যায় না।

(৯) নৈতিক শিক্ষাদানের সময় ভালমন্দ বিচার করিবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া যায়।

বস্তুতঃ সকল বিষয় শিক্ষাদানেই বিচার-শক্তি ব্যবহার করা যায়। কেবল তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হয়।

References

1. J. Ross—Ground-work of Educational Psychology, Chap. XII.
2. Sarat Ch. Brahmachary—ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, ১৪ ও ১৫শ অধ্যায়।
3. Dumville—Child Mind, Chap. V.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

(Intelligence)

বুদ্ধিবৃত্তি

বুদ্ধি বলিলে একটা মানসিক শক্তি বুঝায়। কিন্তু তাহা কিরূপ মানসিক শক্তি সে সম্বন্ধে নানা মত আছে। যথা—

(১) নিজেকে নূতন কোন অবস্থার উপযোগী করিয়া লওয়ার শক্তি।
(২) উচ্চ চিন্তাশক্তি, বিশেষতঃ বস্তুসম্পর্কশূন্য চিন্তাশক্তি।
(৩) শিক্ষা করিবার শক্তি।

শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধিকে **শিক্ষা ও চিন্তা করার মানসিক শক্তি** বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

Spearman বুদ্ধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) সাধারণ মানসিক কার্যশক্তি (General Mental Energy), এবং (২) বিশেষ কোন মানসিক কার্যশক্তি। তাঁহার মতে সকল মানসিক কাজে সাধারণ মানসিক শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয়। যথা, এই সাধারণ মানসিক শক্তির সাহায্যেই মানুষ চিন্তা, শিক্ষা, কল্পনা ও বিচার করিতে পারে। সুতরাং কেহ এই সকল মানসিক কাজ করিতে পারিলে তাহাকে বুদ্ধিমান বলা যায়। এই সাধারণ মানসিক শক্তি ও বিশেষ কোন কার্যশক্তির সংযুক্ত কার্য ফলেই মানুষ সেই বিশেষ কার্যে সফলতা লাভ করিতে পারে।

বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ

শারীরিক কাজের বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের দ্বারা যেমন আমাদের শারীরিক বিকাশ হয়, সেইরূপ মানসিক কাজের দ্বারা বা মানসিক শক্তি চর্চার দ্বারাই আমাদের মানসিক বিকাশ হইতে পারে। কিন্তু যেমন কেবল একপ্রকার শারীরিক কাজ বা ২।১টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের দ্বারা সমস্ত শরীরের বিকাশ হয় না, সেইরূপ কেবল একপ্রকারের মানসিক কাজ করিয়া বা ২।১ টা মানসিক শক্তির চর্চা করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। সুতরাং শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য তাহার চিন্তা, কল্পনা, বিচার, স্মৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে পূর্বকালের ন্যায় এই সমস্ত মানসিক বৃত্তির স্বতন্ত্র বা কৃত্রিম চর্চার ব্যবস্থা করা উচিত নহে। সকল মানসিক বৃত্তিগুলির ব্যবহার করিয়া নানা প্রকারের মানসিক কাজ করিতে দেওয়া হইলেই শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইবে।

বুদ্ধি-মাপক পরীক্ষা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় ছাত্রের স্বভাবজাত মানসিক শক্তি নির্ধারণের জন্য এক প্রকার বুদ্ধি-মাপক পরীক্ষার (Intelligence Test) প্রচলন হইয়াছে। এমন কি ইহার ফলের উপর নির্ভর করিয়া অনেক বিভাগে প্রবেশার্থী নির্বাচন করা হয়।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, শিশুর মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি জন্মগত এবং তাহার বিকাশ ও বংশানুবর্তনের দ্বারা অনেকটা সীমাবদ্ধ। সুতরাং শিশু কি মানসিক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহা জানিতে পারিলে তদুপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা করিয়া তাহার বিকাশের খুব বেশী সাহায্য করা যায়। কারণ যে শিশু মেধাবী তাহাকে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাহার যতদূর বিকাশ সাধন সম্ভব, ক্ষীণমেধা শিশুকে সেই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যায় না বা তাহার ততদূর বিকাশ সাধন সম্ভব নহে।

ইহা ছাড়া বুদ্ধি-মাপক পরীক্ষার সাহায্যে মানসিক শক্তি অনুযায়ী ছাত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া তদুপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা করা যায়; ইহার সাহায্যে কোন্ ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভের উপযোগী এবং কোন্ ছাত্র শ্রমশিল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জন করার যোগ্য তাহাও নির্ধারণ করা যায়। কোন ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলে বুদ্ধি-মাপক পরীক্ষার সাহায্যে নিরূপণ করা যায় যে মানসিক শক্তির অভাবে বা মনোযোগ ও পরিশ্রমের অভাবে সে অকৃতকার্য হইয়াছে। সর্বশেষ বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার সাহায্যে কোন্ ছাত্র কোন্ ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে পারে তাহাও নির্ধারণ করা যায় এবং তাহাকে তদুপযোগী শিক্ষা দেওয়া যায়।

সাধারণ পরীক্ষা ও বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য এই যে, **প্রথমটি ছাত্রের অর্জিত জ্ঞান বা শক্তি পরীক্ষা করে, দ্বিতীয়টি ছাত্রের স্বভাবজাত মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষা করে।** অবশ্য বুদ্ধি-মাপক পরীক্ষায়ও কোন না কোন বিষয়ের ব্যবহার করিতে হয় এবং বিষয়ের জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সমস্ত পরীক্ষার্থীর যাহা জানা আছে সেরূপ সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে অর্জিত জ্ঞান বা শক্তির পরীক্ষা না হইয়া স্বভাবজাত মানসিক শক্তিরই পরীক্ষা হইবে। যথা,—২০ হইতে ১ পর্যন্ত পিছন দিকে গণনা করিতে বলা যায়। তাহা ছাড়া কেবল একটি পরীক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া কয়েকটি পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা আরও কম থাকিবে।

বুদ্ধি-মাপক পরীক্ষার সময় ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, **স্বভাবজাত**

বুদ্ধির বিকাশ সময়সাপেক্ষ; সুতরাং বিভিন্ন বয়সের ছাত্রের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। **যে বয়সের অধিকাংশ ছাত্র কোন প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর দিতে পারে কিন্তু তাহা হইতে কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, সেই প্রশ্নগুচ্ছ সেই বয়সের ছাত্রের মানসিক শক্তি-নির্দেশক বলা যায়।** এইরূপে এক-এক বয়সের অনেক ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন বয়সের ছাত্রের মানসিক শক্তি-নির্দেশক এক প্রশ্নগুচ্ছ (Groups of Tests) গঠন করা যায়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে একই বয়সের সকল ছাত্র তাহাদের উপযোগী সকল প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিতে পারে না। কেহ তাহা হইতে বেশী বয়সের ছাত্রের উপযোগী সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, অন্য কেহ কেবল তাহা হইতে কম বয়সের ছাত্রের উপযোগী সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। **কোন ছাত্র যে বয়সের ছাত্রের জন্য নির্দিষ্ট সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাহাই তাহার মানসিক বয়স** (Mental Age) **বলা হয়। কোন ছাত্রের মানসিক বয়স ও জন্ম হিসাবে বয়সের অনুপাতকেই তাহার বুদ্ধি-নির্দেশক সংখ্যা** (Intelligence Quotient) **বলা হয়।** সংক্ষেপে **ইহাকে বুঃ সঃ** (I.Q.) বলা যায়। যথা, $\frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{জন্মহিসাবে বয়স}} \times ১০০ =$ বুঃ সঃ।

একজন ১০ বৎসর বয়স্ক ছাত্র যদি ১২ বৎসর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট সকল প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিতে পারে তবে তাহার বুঃ সঃ (বুদ্ধি-নির্দেশক সংখ্যা) $= \frac{১২}{১০} \times ১০০ = ১২০$ হইবে। অন্য একজন ১০ বৎসরের ছাত্র যদি মাত্র ৮ বৎসর বয়সের ছাত্রের জন্য নির্দিষ্ট সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তবে তাহার বুঃ সঃ $= \frac{৮}{১০} \times ১০০ = ৮০$ হইবে।

অনেক সময় দেখা যায় যে একজন শিশু যে কেবল কোন নির্দিষ্ট বয়সের উপযোগী সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাহা নহে, তাহার বেশী বয়সের উপযোগী কয়েকটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারে। ইহার সাহায্যে শিশুর মানসিক বয়স আরও সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য Terman নিম্নলিখিত-ভাবে

হিসাব করিতে বলিয়াছেন। **এক এক ছেলের মানসিক বয়স নির্ধারণের জন্য ছয়টি প্রশ্ন ব্যবহার করিয়া, কোন ছাত্র যে বয়সের উপযোগী সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে সেই বয়সের সহিত তাহা হইতে বেশী বয়সের ছাত্রের উপযোগী যত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য বৎসর প্রতি ২ মাস করিয়া যোগ দিলে তাহার মানসিক বয়স সঠিক ভাবে নির্ধারিত হইতে পারে।** যথা,—একজন ১০ বৎসর বয়সের ছাত্র যদি মাত্র ৮ বৎসর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, ৯ বৎসর বয়সের ছাত্রের ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে ও ১০ বৎসর বয়সের ছাত্রের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তবে তাহার মানসিক হইবে—

৮ বৎসর + ৪ মাস + ৪ মাস = ৮ বৎসর ৮ মাস। তাহার বুঃ সঃ হইবে $\frac{৮\frac{৮}{১২}}{১০} \times ১০০ = \frac{১০৪ \times ১০০}{১২০} = ৮৬.৬৬$।

বুদ্ধি-নির্দেশক সংখ্যানুযায়ী শিশুর শ্রেণী-বিভাগ।

(১) বুঃ সঃ (I. Q.) ৯০ হইতে ১১০ হইলে **সাধারণ মেধা** (Average)
(২) ,, ৮০ ,, ৯০ ,, **অল্পমেধা** (Dull)
(৩) ,, ৭০ এর নীচে হইলে **ক্ষীণমেধা** (Feeble-minded)
(৪) ,, ১১০—১৪০ হইলে **উচ্চমেধা** (Superior Intellect)
(৫) ,, ১৪০ এর উপর হইলে **অসাধারণ মেধা** (Genius).

এখন পর্যন্ত বুঃ সঃ ১৮৫ হয় এমন শিশু পাওয়া গিয়াছে। খ্যাতনামা মনীষিগণের বুঃ সঃ তাহার বেশীও হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা যায়।

ব্যক্তিগত বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা। ইহাতে সাধারণতঃ এক এক ছাত্রকে মৌখিক প্রশ্ন করিয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে তাহার বুঃ সঃ নিরূপণ করা হয়, দুই প্রকারে এই প্রশ্ন করা যায়। যথা,—(ক) কাজের আকারে ও (খ) ভাষার সাহায্যে।

(ক) কাজের আকারের প্রশ্নের নমুনা (৩ বৎসর বয়সের উপযোগী)

(১) তোমার নাক, কান, দাঁত, জিহ্বা, হাত, পা, উরু, নখ, চুল ইত্যাদি দেখাও।

(২) কতকগুলি নিত্য-ব্যবহার্য জিনিষের নাম বলিয়া জিনিষগুলি দেখাইতে বলা যায়।

(৩) কতকগুলি কাঠের টুকরা সাজাইয়া একটা ঘর বা পুল তৈয়ার করিতে বলা যায়।

(৫ বৎসর বয়সের উপযোগী)।

(১) বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দেওয়া আছে, সেগুলি সাজাইয়া একটা মানুষ বা ছবি তৈয়ার কর।

(২) একটা ছবির বিচ্ছিন্ন অংশগুলি একত্রিত করিয়া ছবিটি তৈয়ার কর।

(৩) একটা ছবির যে অংশগুলির অভাব আছে তাহা সরবরাহ কর।

(খ) ভাষা-মূলক প্রশ্ন

(১) এই জিনিষগুলির বা তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির নাম বল। (৩ বৎসর)

(২) কতকগুলি পাখির নাম বল (৪ বৎসর)

(৩) এই প্রাণী বা জিনিষের ছবিতে কি কি অংশ নাই বল। (৫ বৎসর)

(৪) একটা বিড়ালের কি কি জিনিষ থাকে? (৬ বৎসর)

(৫) ছাগলের এমন কি আছে যাহা কুকুরের নাই? (৭ বৎসর)

(৬) ১ হইতে ২০ পর্যন্ত উল্টাদিকে গণনা কর। (৮ বৎসর)

(৭) তোমার বাড়ীতে একজন অপরিচিত লোক আসিলে তুমি কি করিবে? (১০ বৎসর)

(৮) এক মিনিটের মধ্যে তুমি যতগুলি শব্দ বলিতে পার বল। (৯ বৎসর)

দলগত পরীক্ষা (Group Test)।

ইহাতে অনেকগুলি বালককে একসঙ্গে পরীক্ষা করিতে হয়। ইহার দ্বারা কাহারও বুঃ সঃ নিরূপণ করা হয় না। তাহাদের মধ্যে কাহার বুদ্ধি বেশী এবং কাহার বুদ্ধি কম তাহাই পরীক্ষা করা হয়। কতকগুলি ছোট ছোট প্রশ্ন ও প্রত্যেকের ২।৩টি উত্তর লিখিয়া দিয়া তাহাদিগকে শুদ্ধ উত্তর

বাছিয়া লইতে দেওয়া হয় অথবা পাদ-পূরণ করিতে দেওয়া হয়। ইহার জন্য সময়ও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর থাকে। যে ছেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত বেশী শুদ্ধ উত্তর বাছিয়া লইতে পারে এবং যত বেশী নম্বর পাইতে পারে, সেই ছেলে তত বেশী বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাতে সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি নানা বিষয়ে এমন প্রশ্ন থাকিতে পারে যাহাদের উত্তর সকল পরীক্ষার্থীর জানা থাকার সম্ভাবনা। সুতরাং **ইহাতে যে বেশী নম্বর পায় তাহার বুদ্ধি তত বেশী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়।**

দলগত পরীক্ষার প্রশ্নের নমুনা।

(১) সম্পূর্ণ কর :—

গাভী…দেয়। মৎস্য…বাস করে। মানুষ দিবসে…করে রাত্রিতে…যায়।

(২) নিম্নলিখিত জিনিষগুলির মধ্যে ছাগলের যেগুলি থাকে তাহাদের নীচে দাগ দাও :—শিং, লোম, হাত, পাখা, লেজ, খুর, ঠোঁট।

(৩) ঠিক উত্তর দাও

ভাল ছেলের কি পাওয়া উচিত? শাস্তি, ভৎর্সনা, পুরস্কার, ঘর, খাদ্য।

(৪) হাঁ কি না বল।

তাম্র কি একটা পাথর?

কয়লা কি একটা ধাতু?

চাপা কি একটা ফুল?

(৫) যে শব্দগুলি প্রথমটির সহিত সমজাতীয় নহে সেগুলি কাটিয়া দাও। সুশীল—গোপাল, কাপড়, গঙ্গা, মতি, হিমালয়, যদু, সাধু, পরিমল।

(৬) এই পর্যায়ের (Seriesএর) আর ৩টি সংখ্যা দাও :—২, ৪, ৮।

সঠিকভাবে বুদ্ধি নির্ধারণ করিতে হইলে **তিন প্রকারের পরীক্ষা করিতে হয়।** যথা,—

(ক) **কঠিন কাজ করিবার শক্তি-পরীক্ষা।** যে যত বেশী কঠিন মানসিক কাজ করিতে পারে সে তত বেশী বুদ্ধিমান।

(খ) **বেশী কাজ করিবার শক্তি-পরীক্ষা।** একই কাঠিন্যের মানসিক কাজ যে যত বেশী করিতে পারে সে তত বেশী বুদ্ধিমান।

(গ) **দ্রুত কাজ করিবার শক্তি-পরীক্ষা**—যে যত দ্রুত মানসিক কাজ করিতে পারে সে তত বেশী বুদ্ধিমান।

বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ফলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

(১) **মানসিক বয়স ১৬ বৎসরের পর আর বৃদ্ধি পায় না।** অল্প-মেধা বালকগণ আরও কম বয়সে মানসিক বয়সের শেষ সীমায় পৌছায়। ১৬ বৎসরের বালক ও ৩০ বৎসর বয়সের লোকের মানসিক বয়স এক। তবে অসাধারণ মেধাবী লোকের মানসিক বয়স ইহার পরেও পাইতে পারে।

(২) **গড়পড়তা স্ত্রী-পুরুষ বুদ্ধিমত্তায় সমস্থানীয়।**

(৩) নানা রকম মানসিক শক্তি (Mental Abilities) আছে—যথা, বিচারশক্তি, স্মরণশক্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি। কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে না। **একটা সাধারণ মানসিক শক্তি আছে যাহা সমস্ত মানসিক কাজে নিয়োজিত করা যায়।** তবে কাহারও বুদ্ধি পরিমাপের জন্য নানা মানসিক শক্তির পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়।

(৪) উচ্চ মানসিক শক্তির সহিত প্রবল ইচ্ছাশক্তির যোগ হইলে মানুষ প্রতিভাশালী হয়। তাহার সহিত চতুরতার (Cleverness) যোগ হইলেই সে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে.

বালক-বালিকার শারীরিক ও মানসিক শক্তির বা প্রকৃতির পার্থক্য।

বালক-বালিকাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বা প্রকৃতিগত যতটা পার্থক্য আছে বলিয়া সাধারণের ধারণা, পরীক্ষার ফলে তাহা সমর্থিত হয় না। তবে ইহা সত্য যে তাহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে কিছু পার্থক্য আছে। যথা,—বালকেরা হস্তচালনা, শারীরিক শক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা, দ্রুতগতি প্রভৃতি বিষয়ে বালিকাদের হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা ছাড়া ইচ্ছাশক্তি, বিচারশক্তি, সামাজিক

প্রবৃত্তি বিষয়েও বালকেরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনেকের মত। কিন্তু বালিকারা চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তিতে বালকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহারা বালকদের অপেক্ষা অধিক ভাবপ্রবণ বলিয়া অনেকের মত। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে বালকদের গণিতে ও হাতের কাজে এবং মেয়েদের সাহিত্যে অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে তাহারা প্রায় সমান বলা যায়। কিন্তু বালক-বালিকাদের মধ্যে এই পার্থক্য কতটা প্রকৃতিগত এবং কতটা পরিবেষ্টনীর প্রভাব বা শিক্ষার ফল তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

বিভিন্ন মেধার শিশুগণের উপযোগী শিক্ষাদান-পদ্ধতি।

সাধারণ বিদ্যালয়ে যে সকল শিশু শিক্ষালাভ করে তাহাদিগকে তাহাদের মেধানুযায়ী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা,—

(১) উচ্চ-মেধা (বুঃ সঃ ১১০—১৪০); (২) সাধারণ-মেধা (বুঃ সঃ ৯০—১১০); (৩) অল্প-মেধা (বুঃ সঃ ৭০—৯০)। অসাধারণ মেধার শিশুগণ যে-কোন অবস্থায় শিক্ষালাভে দ্রুত উন্নতি করিবে। তাহাদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। ক্ষীণমেধা শিশুগণকে (বুঃ সঃ ৭০এর নীচে) সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়াই যায় না, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।

আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাদান-পদ্ধতি সাধারণ-মেধা শিশুগণেরই উপযোগী। সুতরাং উচ্চ-মেধা এবং অল্প-মেধা শিশুগণের শিক্ষার জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহার জন্য তাহাদিগকে স্বতন্ত্র দলভুক্ত করা প্রয়োজন।

উচ্চ-মেধা শিশুগণের শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ উপায় অবলম্বন করা যায়।

(১) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই সকল শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু উচ্চ-মেধা শিশুগণ বেশী দিন বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা করিতে চাহে না। তাহাদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব বস্তু-সম্পর্ক-শূন্য বা বিমূর্ত (Abstract)

বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। যথা,—তাহাদিগকে বস্তুর সাহায্যে বেশীদিন গণিত শিক্ষা না দিয়া লেখা সংখ্যার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যায়।

(২) তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব এবং যত বেশী সম্ভব নিজ চেষ্টায় শিক্ষা করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

(৩) তাহাদিগকে শ্রেণীপাঠনের অতিরিক্ত কঠিনতম কাজ দেওয়া প্রয়োজন।

(৪) পুনরালোচনা ও সূত্র-গঠন বা সিদ্ধান্ত করার সময় কঠিনতর প্রশ্নগুলি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করা উচিত।

(৫) তাহাদিগকে শিক্ষাদানের জন্য বর্ণনামূলক পদ্ধতি হইতে ডল্টন পদ্ধতি, কার্য-সমস্যা পদ্ধতি (Project Method), আলোচনা পদ্ধতি, সক্রেটিক পদ্ধতি, গবেষণা পদ্ধতি প্রভৃতি বেশী উপযোগী।

(৬) কোন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট এক বৎসরের কাজ তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করিতে পারিলে তাহাদিগকে বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই প্রমোসান দেওয়া উচিত। তাহা না করিয়া তাহাদিগকে অল্প-মেধা শিশুগণের সহিত তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে দিলে তাহারা নিরুৎসাহ ও অসহিষ্ণু হইবে।

অল্প-মেধা শিশুগণের শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যায় :—

(১) তাহাদিগকে যত বেশী সম্ভব প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া উচিত। বস্তুর সাহায্যে প্রত্যেক বিষয় সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার পূর্বে তাহাদিগকে বস্তু-সম্পর্ক-শূন্য বিমূর্ত (Abstract) বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। এই উদ্দেশ্যে বস্তু, আদর্শ, ছবি, নক্সা মানচিত্র প্রভৃতি প্রচুর ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে পাঠ দেওয়া উচিত।

(২) যত বেশী সম্ভব কাজের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। মাটির কাজ, কাগজ কাটা, বেতের কাজ, কাঠের কাজ ও নানা হস্ত-শিল্প এবং চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির সাহায্যে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহা ছাড়া কার্য-সমস্যা পদ্ধতিতে নানা কাজ করিয়া শিক্ষা করিতে দিতে হইবে।

(৩) উদাহরণের সাহায্য ব্যতীত তাহারা কোন বিষয় ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগকে শিক্ষাদানের সময় যত বেশী সম্ভব উদাহরণ দিতে হইবে এবং তাহাদিগকেও নিজে যত বেশী সম্ভব উদাহরণ দিতে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

(৪) পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা। তাহাদিগকে পাঠদানের সময়ে যত বেশী সম্ভব পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা না করিলে তাহারা কোন বিষয় ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না ও স্মরণ রাখিতে পারে না।

(৫) তাহাদিগকে অল্প অল্প বিষয়, ধীরে ধীরে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কেননা তাহারা এক সঙ্গে বেশী বিষয় বা দ্রুত শিক্ষা করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, একটা বিষয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার পূর্বে তাহাদিগকে আর একটা বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে।

(৬) যত বেশী সম্ভব প্রয়োগের ব্যবস্থা। প্রয়োগের দ্বারাই জ্ঞান ছাত্রের নিজস্ব হয় এবং তাহা ছাত্রের মনে দৃঢ়-ভাবে প্রোথিত হয়। ইহা সকল ছাত্রের জন্য প্রয়োজন হইলেও, অল্প-মেধা ছাত্রের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন।

References

1. John Adams—Modern Development in Educational Practices. Chap. III.

2. James S. Ross—Ground-work of Educational Psychology, Chap. XII.

3. G. H. Thomson—Instinct, Intelligence and Character, Chap. XVIII.

4. Deniel Starch—Educational Psychology, Chap.—VII.

5. O. B. Douglas and B. E. Holland—Fundamentals of Educational Psychology.

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শিক্ষার কাজ

(Process of Learning)

কোন নূতন প্রভাব ঠিকভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার শক্তি অর্জন করাকেই শিক্ষা বলে।

শিক্ষার কাজকে বিশ্লেষণ করিয়া **তিন ভাগে** বিভক্ত করা যায়। যথা, (১) কোন প্রভাব গ্রহণ, (২) তাহার স্বরূপ উপলব্ধি ও তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ, ও (৩) প্রতিক্রিয়া।

ঠিকভাবে প্রভাব গ্রহণ ও তাহার সহিত কোন প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক স্থাপন করিতে শিক্ষা করিলেই ঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া করিতে পারে।

ঠিকভাবে প্রভাব গ্রহণের জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি কার্যক্ষম ও সতেজ রাখিতে হইবে এবং প্রভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে।

ঠিকভাবে সম্পর্ক-স্থাপনের জন্য প্রভাবের বিশ্লেষণ করিতে হইবে, তাহার প্রয়োজনীয় অংশগুলি বাছিয়া লইতে হইবে ও তাহাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া প্রতিক্রিয়া স্থির করিতে হইবে।

নিয়ন্ত্রিত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া।

একই সময়ে যে-সকল অভিজ্ঞতা হয় তাহাদের মধ্যে ও তাহাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই একটা স্বাভাবিক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৃত্রিম প্রভাবকে কাজ করিতে দিয়া স্বাভাবিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার সহিত কৃত্রিম প্রভাবের সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। ইহাকেই **নিয়ন্ত্রিত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বলে।** রাশিয়ার মনোবিজ্ঞানবিদ্ Pavlow একটা পরীক্ষার সাহায্যে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে একটা কুকুরের মুখের সামনে এক টুকরা মাংস ধরিলে তাহার জিহ্বা হইতে প্রচুর লালা নিঃসরণ হয়। প্রত্যেক বার তাহাকে মাংস খাইতে দেওয়ার সময় যদি একটা ঘণ্টাধ্বনি করা হয়, তবে সেই ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মাংস খাওয়ার

ও তাহার প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইহার পরে মাংস খাইতে না দিয়া কেবল সেই ঘণ্টাধ্বনি করিলেই কুকুরটির জিহ্বা হইতে লালা নিঃসরণ হয়। কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে এই কৃত্রিম সম্পর্ক স্থায়ী হয় না। কয়েকবার ঘণ্টাধ্বনি করিয়া কুকুরকে মাংস খাইতে না দিলে, তাহার পর ঘণ্টাধ্বনি করিলে তাহার জিহ্বা হইতে লালা নিঃসরণ হয় না।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ। শিশুকে একটা টুপী দেখাইয়া টুপী শব্দ উচ্চারণ করা হইল, এবং শিশুও অনুকরণ করিয়া টুপি বলিল। কয়েকবার ইহার পুনরাবৃত্তি করা হইলে, টুপি শব্দের সহিত টুপিটির সম্পর্ক স্থাপিত হইল। ইহার পর টুপিটি দেখিলে শিশু টুপি নামটি উচ্চারণ করিবে অথবা টুপি নাম শুনিলে টুপি জিনিষটি বুঝিবে।

বস্তুতঃ কোন নিয়ন্ত্রিত প্রভাবের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করার শক্তি অর্জনকেই শিক্ষার কাজ বলা যায়।

অপর দিকে, একই প্রভাবের নানা প্রতিক্রিয়া করিয়া শিশু ঠিক প্রতিক্রিয়া শিক্ষা করিতে পারে, যে প্রতিক্রিয়া করিয়া সে সফলতা লাভ করিতে পারে তাহাই ঠিক প্রতিক্রিয়া বলিয়া বুঝিতে পারে ও তাহা শিক্ষা করে। Thorndike পরীক্ষার ফলে ইহারও সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন। একটা তারের খাঁচার এক কোণায় এরূপ একটা ছোট দরজা ছিল যে তাহা ভিতর হইতে ঠেলিলেই খুলিয়া যায়। খাঁচার মধ্যে একটা ক্ষুধার্ত বিড়ালকে পুরিয়া খাঁচার বাহিরে অল্প দূরে কিছু খাদ্য দেওয়া হইল। বিড়ালটি খাঁচার চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তারের ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া বা থাবা দিয়া খাদ্য-গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ঘটনাক্রমে দরজার নিকট পৌছিয়া তাহা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল ও খাদ্য খাইল। কয়েকবার ইহার পুনরাবৃত্তি করা হইলে, বিড়ালটি সোজাসুজি দরজার নিকট গিয়া তাহা ঠেলিয়া বাহির হইতে শিক্ষা করিল।

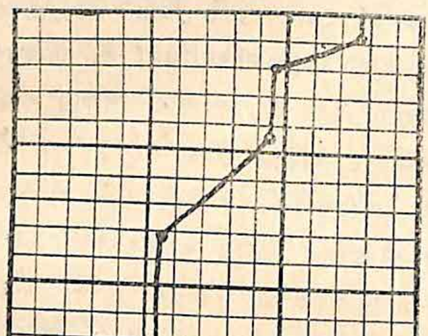
সুতরাং চেষ্টার ফলে নূতন নূতন প্রভাবের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার শক্তি অর্জন করাকেও শিক্ষার কাজ বলা যায়। কোন প্রভাবের প্রতিক্রিয়া করাকেই ব্যবহার বলা হয়। সুতরাং **ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের শক্তিলাভ করাকেই শিক্ষার কাজ বলা যায়।**

শিক্ষার শারীরিক কারণ (Synapse Theory of Learning)। বার বার কোন প্রভাবের একই রূপ প্রতিক্রিয়া করিতে তাহার একটা স্নায়ুপথ গঠিত হয় এবং পথে স্থিত স্নায়ুসন্ধিগুলির (Synapse) বাধা দানের শক্তি হ্রাস পায়। সুতরাং ভবিষ্যতে সেই প্রভাব বা সমরূপ প্রভাব কাজ করিলে স্নায়ুপ্রণালী স্বভাবতঃই পূর্বরূপ প্রতিক্রিয়া করে।

মানব-শিশুর প্রতিক্রিয়ার স্নায়ুপথ দৃঢ়ভাবে গঠিত নহে। সুতরাং সহজে তাহার পরিবর্তন করিয়া প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন করা যায়। ইহা ছাড়া নূতন নূতন অবস্থার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করিবার জন্য অসংখ্য নূতন নূতন স্নায়ুবৃত্তের সৃষ্টি করা যায় অথবা স্নায়ু-সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অপর দিকে মানবশিশু যে কেবল শারীরিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়া করিতে পারে তাহা নহে, সে মানসিক প্রভাবেরও প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। তাই তাহার প্রতিক্রিয়াগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির উপর কোন বহিঃপ্রভাব কাজ করিলে সে যে প্রতিক্রিয়া করে তাহাকে **জ্ঞান-গতিদায়িনী প্রতিক্রিয়া** (Sensori-motor Reaction) বলে। কথা বলা ও ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিশু অন্য এক প্রকারের প্রতিক্রিয়াও করিতে শিক্ষা করে। শব্দ ও ভাষা ধারণা বা চিন্তার চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেই চিহ্নগুলি ব্যবহার করিয়াও আমরা শিশুর উপর এক প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারি এবং সেই চিহ্নগুলির সাহায্যেই শিশু এক প্রকার প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। যথা, আমরা শিশুকে একটা প্রশ্ন করিতে পারি এবং শিশু ভাষার সাহায্যে তাহার উত্তর দিতে পারে। অথবা আমরা শিশুকে কোন কাজ করিতে নিষেধ করিতে পারি এবং শিশু ভাষার সাহায্যে তাহা করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। **কোন কথা শুনিয়া বা কোন বিষয় পড়িয়া শিশু ভাষার সাহায্যে যে প্রতিক্রিয়া করে তাহাকে ধারণামূলক প্রতিক্রিয়া** (Ideational Reaction) **বলে**। একটি লোক আগুন না দেখিলেও বা তাহার উত্তাপ অনুভব না করিলেও কাহারও ঘরে আগুন লাগিয়াছে এই কথাটি শুনিয়া তাহার সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে এবং কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়া না করিয়াও মৌখিক আদেশ বা উপদেশ দানরূপ প্রতিক্রিয়া করিতে পারে।

এমন কি কোন প্রভাবের আমরা বিশুদ্ধ মানসিক প্রতিক্রিয়াও করিতে পারি। যথা,—কোন কথা শুনিয়া বা কোন বিষয় পড়িয়া আমরা বাহ্যিক কোন প্রতিক্রিয়া না করিলেও সন্তুষ্ট, অসন্তুষ্ট, বিস্মিত, দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হইতে পারি বা তাহার বিচার করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিতেও পারি। কোন পূর্ব অভিজ্ঞতার বিষয় স্মরণ করিয়াও আমরা উক্তরূপ প্রতিক্রিয়া করিতে পারি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং নূতন নূতন স্নায়ুবৃত্তের সৃষ্টি করিয়া শিশুর প্রতিক্রিয়ার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। তাই বলা যায় যে মানবশিশুর শিক্ষার শক্তি ও ক্ষেত্র অতীব বিস্তৃত, অনেকটা সীমাহীন।

শিক্ষার উন্নতি (Improvements in Learning)। শিক্ষক মাত্রেই অবগত আছেন যে শিক্ষালাভ কার্যে উন্নতি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। সকল শিশু একই সময়ে শিক্ষার কাজে সমান উন্নতি করিতে পারে না। একই শিশুও সকল সময় একই হারে শিক্ষা করিতে পারে না। বংশানুবর্তন, পূর্বজ্ঞান, অনুরাগ, মনোযোগ, অভ্যাস, বয়স, স্বাস্থ্য, অবসাদ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষার উন্নতি প্রভাবিত হয়।


শিক্ষার রেখাচিত্র

শিক্ষালাভে উন্নতির রেখা-চিত্র আঁকিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রথমে দ্রুত শিক্ষা হয় না, তাহার পর দ্রুত উন্নতি হয়, তাহার পর কিছুকাল উন্নতি কম হয়, তাহার পর পুনঃ দ্রুত উন্নতি হয়—পুনঃ পুনঃ এই হ্রাসবৃদ্ধির আবৃত্তি হয়। শিক্ষার রেখা-চিত্র দ্রষ্টব্য।

ইহা ছাড়া উন্নতির সীমাও সুনির্দিষ্ট। অল্পমেধা শিশু হইতে সাধারণ মেধার শিশু শিক্ষালাভে বেশী উন্নতি করিতে পারে, উচ্চমেধা শিশু তাহা

অপেক্ষাও বেশী উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু কাহারও উন্নতির সীমা অনির্দিষ্ট নহে। প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং নানাভাবে চেষ্টা করিয়া কোন প্রভাবের ঠিক প্রতিক্রিয়া শিক্ষা করা সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা করিয়া শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ নিম্নলিখিত শিক্ষার নিয়মগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন।

শিক্ষার নিয়ম (Laws of Learning) :

(১) কোন প্রভাব ও তাহার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে **সম্পর্ক** স্থাপিত হয় তাহা **সুখকর** হইলে বেশীদিন স্থায়ী হয়, দুঃখকর হইলে অল্পস্থায়ী হয়। অর্থাৎ **শিক্ষা আনন্দদায়ক হইলে বেশী ফলপ্রসূ হয়।**

(২) কোন প্রভাব ও তাহার প্রতিক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইলেই তাহাদের মধ্যে দৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয় ; তাহা না হইলে সম্পর্ক দুর্বল হয় ও ক্রমে লোপ পায়। অর্থাৎ **পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারাই ভাল ও স্থায়ী শিক্ষা হয়। সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাওয়ার পূর্বেই পুনরাবৃত্তি করিতে হয়।**

(৩) কোন প্রভাবের প্রতিক্রিয়া করিবার জন্য মন প্রস্তুত থাকিলেই প্রতিক্রিয়া সুখকর বোধ হয় এবং তাহার জন্য মন প্রস্তুত না থাকিলে প্রতিক্রিয়া দুঃখকর বোধ হয়। অর্থাৎ কোন বিষয় শিক্ষার আগ্রহ থাকিলেই শিক্ষার কাজ আনন্দদায়ক হয়, আগ্রহ না থাকিলে বিরক্তিকর বোধ হয়। তাই **শিক্ষা করার ও মনে রাখার ইচ্ছা লইয়াই শিক্ষা করিতে হয়।**

(৪) শিশু একই প্রভাবের নানা প্রতিক্রিয়া করে এবং তাহাদের মধ্যে যেটা সুখকর বোধ হয় এবং যাহার দ্বারা সফলতা লাভ হয় তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া শিক্ষা করে। অর্থাৎ প্রথম উদ্যমে কোন বিষয় ঠিকভাবে শিক্ষা করা যায় না। **নানাভাবে চেষ্টা করিয়াও ভুলের সংশোধন করিয়া শিক্ষা করিলেই ভাল শিক্ষা হয়।** পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, প্রথম হইতে যন্ত্রের মত ঠিক পথে পরিচালিত করিলেও ভাল শিক্ষা হয় না।

(৫) শিক্ষার সময়ে **কিছু বাধার সৃষ্টি হইলে বা সমস্যা সমাধানের আকারে শিক্ষা করিতে দিলে** মনোযোগ অধিকতর গভীর হয় ও **ভাল শিক্ষা হয়।**

(৬) **অল্প বয়সেই সহজে এবং ভাল শিক্ষা করা যায়।** শিক্ষার শক্তি প্রায় ৪০ বৎসর পর্যন্ত অটুট থাকে। তবে পঁচিশ বৎসরের পর একটা নূতন বিষয় শিক্ষা করা খুব কঠিন হয়।

(৭) ভাল **শিক্ষা করিতে হইলে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন।**

(৮) **সফলতা ও নিষ্ফলতা-জ্ঞানের উপর ঠিক শিক্ষা নির্ভর করে।** কারণ তাহা হইলে শিশু ভুল পন্থা পরিহার করিয়া যে-ভাবে প্রতিক্রিয়া করিলে সফলতা অর্জন করা যায় সেইভাবে প্রতিক্রিয়া করিয়া শিক্ষা করিতে পারে।

(৯) প্রত্যেক **শিক্ষা-কার্যের কোন না কোন উদ্দেশ্য নির্দেশ করা প্রয়োজন।** উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষার কাজে শিশুর আগ্রহ হইতে পারে না।

(১০) **প্রভাব যতই বলবান্ হয় তাহার প্রতিক্রিয়া ততই স্থায়ী হয়।** অর্থাৎ যে বিষয়, বস্তু, কাজ আমাদের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে তাহা বেশী স্মরণ থাকে।

(১১) অবসাদ আসার পর মানসিক কাজ করিলে ভাল শিক্ষা হয় না।

(১২) কোন কাজে বা বিষয়ে গভীর মনোযোগ দানের পর মনকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে না দিয়া নূতন কাজ আরম্ভ করিলে বা নূতন বিষয়ে মনোযোগ দিলে ভাল শিক্ষা হয় না।

(১৩) একটি স্বাভাবিক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা প্রভাব কাজ করিলে তাহাদের মধ্যে ও তাহাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অথবা একসঙ্গে যে-সকল অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরে পুনঃ একটার অভিজ্ঞতা হইলে অন্য অভিজ্ঞতাগুলির কথা স্মরণ হয়।

(১৪) দুই বা বহু প্রকারের সহিত স্বতন্ত্রভাবে কোন প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হইলে সমস্ত প্রভাবগুলির যুগপৎ কাজের ফলে প্রবলতর প্রতিক্রিয়া হয়। তাই **যত বেশী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন জ্ঞান লাভ হয় তাহা তত বেশী গভীর ও স্থায়ী হয়।**

(১৫) নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে শিক্ষাকার্যে বেশী সাহায্য লওয়া বা দেওয়া ভাল নহে।

(১৬) সমস্ত মূলসূত্র বা সাধারণ নিয়মের উদাহরণ নিজে দিলে ভাল শিক্ষা হয়।

(১৭) যাহা কিছু শিক্ষা করা যায় যত শীঘ্র সম্ভব ও যত বেশী সম্ভব তাহা কাজে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই শিক্ষার ফল স্থায়ী হয়।

(১৮) শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে স্বাভাবিক বা কৃত্রিম সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শিক্ষা করিলেই ভাল শিক্ষা হয়।

(১৯) প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের আকারে পড়িলে বা কাজ করিলে ভাল শিক্ষা হয়।

(২০) কোন কবিতার বা একটা অনুচ্ছেদের এক এক অংশ শিক্ষা না করিয়া সমস্ত এক সঙ্গে শিক্ষা করিলে ভাল শিক্ষা হয়।

কোন বিষয় শিক্ষার ফলে যে শক্তিলাভ হয় অন্য বিষয় শিক্ষায় তাহার প্রয়োগ (Transfer of Training)।

পূর্বকালে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে কোন বিষয় শিক্ষার ফলে যে শক্তিলাভ হয় তাহা অন্য বিষয় শিক্ষারও সাহায্য করে। তাহারা মনে করিত লাটীন, অঙ্ক, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করিলে যে মানসিক শক্তিলাভ হয় তাহার সাহায্যে যে-কোন মানসিক কাজ করা যায়। তাই তাহারা এই সকল বিষয় শিক্ষায় যথেষ্ট সময় ব্যয় করিত। বর্তমান সময়ে Woodworth, Thorndike প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহু পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। **কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষা করিয়া এরূপ শক্তি অর্জন করা যায় না যাহা অন্য বিষয় শিক্ষার কাজে সাহায্য করিতে** পারে। কিন্তু যদি দুই বিষয়ের মধ্যে কিছু মিল থাকে বা তাহাদের কোন কোন অংশ সাধারণ (Common) থাকে, তবে সেই মিলের বা **সাধারণ অংশের পরিমাণানুযায়ী তাহাদের মধ্যে একটি শিক্ষা করিলে অন্য বিষয়টি শিক্ষারও সাহায্য হয়।** যথা,—কোন দেশের ভূগোল ও ইতিহাস এই উভয় বিষয় শিক্ষার জন্য সেই দেশের মানচিত্রের জ্ঞানের প্রয়োজন হয় বলিয়া ভূগোল শিক্ষা করিলে ইতিহাস শিক্ষার সাহায্য হয়। ইহা ছাড়া **দুই বিষয় শিক্ষার পদ্ধতি যদি একরূপ হয় তবে তাহাদের**

মধ্যে একটা শিক্ষা করিলে অন্যটা শিক্ষারও সাহায্য হয়। যথা,—একই প্রণালীতে শিক্ষা করিতে হয় বলিয়া একটা বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিলে অন্য একটি বৈদেশিক ভাষা শিক্ষারও সাহায্য হয়।

References

1. P. Sandiford—Educational Psychology, Chaps. IX, XII, XIV.
2. D. Starch—Educational Psychology, Chap. VIII.
3. Woosten Curti—Child Psychology Chaps, VIII—X.
4. E. A. Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study, Chap. V.
5. O. B. Dauglas and B. E. Holland—Fundamentals of Educational Psychology, Chaps. XIII—XIV.

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অভ্যাস

অভ্যাস কি ?

বার বার কোন কাজ করিবার ফলে সেই কাজ করার যে একটা প্রবৃত্তি জন্মে এবং বিশেষ চেষ্টা না করিয়া বা ইচ্ছাশক্তির বিশেষ ব্যবহার না করিয়া সেই কাজ করিবার যে শক্তিলাভ হয় তাহাকেই অভ্যাস বলে। একবার যখন কোন অভ্যাস গঠিত হয় তখন তাহা সহজ বৃত্তির ন্যায়ই আপনা হইতে কাজ করে। এই জন্যই **অভ্যাসকে দ্বিতীয় স্বভাব** বলে (Habit is the Second Nature)। তবুও **সহজ বৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য** আছে। সহজ বৃত্তি সহজাত, অভ্যাস অর্জিত। প্রথমে চেষ্টা করিয়া বার বার কোন কাজ করিলেই পরে বিনা চেষ্টায় তাহা করিবার অভ্যাস গঠিত হয়। সহজবৃত্তিগুলি প্রথম হইতেই চেষ্টা-নিরপেক্ষ-ভাবে কাজ করে।

অভ্যাস গঠিত হওয়ার কারণ। বার বার কোন প্রভাব একই ভাবে কাজ করিলে শরীরের অভ্যন্তরে তাহার ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার একটি স্নায়ুপথ নির্দিষ্ট হইয়া যায় এবং পথে-স্থিত স্নায়ুসন্ধিসমূহের বাধাদানের ক্ষমতা কমিয়া যায়। ইহা ছাড়া প্রথম কোন প্রবাহের প্রতিক্রিয়া করার জন্য চিন্তা, বিচার ও সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু কয়েকবার একই প্রকারের প্রতিক্রিয়া করার পর বিশেষ চিন্তা বা বিচার না করিয়াই পূর্বের ন্যায় প্রতিক্রিয়া করা যায়। সুতরাং ভবিষ্যতে সেইরূপ প্রভাব কাজ করিলে কোন বিচার বা চেষ্টা না করিয়াই স্নায়ুমণ্ডলী পূর্ব প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে এবং ইহাকেই অভ্যাস বলে। এই জন্যই **অভ্যাসকে স্নায়ুমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া বলা হয়।** মানুষের শরীরের অসংখ্য স্নায়ু-সম্পর্ক (Neuron Connections) স্থাপিত হইতে পারে এবং তাহার স্নায়ুপ্রণালীর যথেষ্ট পরিবর্তন হইতে পারে বলিয়া তাহার **শিক্ষালাভের বা অভ্যাসগঠনের সীমাও অনির্দিষ্ট।**

অভ্যাসের উপকারিতা

অভ্যাসের সাহায্যে আমরা বিশেষ চিন্তা বা চেষ্টা না করিয়া অনেক কাজ করিতে পারি। বিশেষতঃ অভ্যাসবশে কাজ করিবার সময় আমাদিগকে ইচ্ছাশক্তির বিশেষ ব্যবহার করিতে হয় না। **সুতরাং অভ্যাস-গঠনের ফলে চিন্তাশক্তির মিতব্যয়িতা হয়।** যেমন, জীবন-ধারণের প্রায় সমস্ত কার্য আমরা অভ্যাসের সাহায্যেই করিয়া থাকি। যদি সর্বদা চিন্তা করিয়া প্রত্যেক কাজ করিতে হইত তবে আমাদের জীবন-ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কার্যগুলি করিতেই আমাদের মন এত ব্যস্ত থাকিত ও পরিশ্রান্ত হইত যে, আমাদের অন্য কোন কাজ করিবার অবসর বা শক্তি থাকিত না। অভ্যাস বশে আমাদের অন্যান্য কর্তব্যকর্মও অনেকটা চেষ্টাবিহীন ও সহজসাধ্য হইয়া পড়ে বলিয়াই আমাদের পক্ষে এত বেশী কাজ করা সম্ভব হয়। শুধু তাহা নহে, **অভ্যাসের সাহায্য ব্যতীত আমরা কিছুই স্থায়ীভাবে শিখিতে বা কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিতাম না।** কারণ, আমরা যাহা কিছু শিক্ষা করি, চর্চার ফলে তাহা অভ্যাসে পরিণত হয় বলিয়াই স্থায়ী হয় এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। তাহা না হইলে আমাদিগকে একই বিষয় বার বার শিক্ষা করিতে হইত, আমরা নূতন কিছু শিক্ষা করিতে পারিতাম না। একটা খুব সাধারণ উদাহরণের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা যায়। যেমন,—শিশু প্রথমে অনেক চেষ্টা করিয়া পায়ের উপর দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে শিখে। দাঁড়াইবার ও হাঁটার অভ্যাস হইলেই সে দৌড়াইতে, লাফাইতে বা নৃত্য করিতে শিখিতে পারে। অভ্যাসের সাহায্য না পাইলে তাহাকে আজীবন মাথা স্থির রাখিয়া দাঁড়াইবার ও হাঁটিবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিতে হইত। সে অন্য কোন কাজ শিখিতে বা করিতে পারিত না। **শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্র-গঠনের কাজেও অভ্যাস যথেষ্ট সাহায্য করে।** কারণ, আমরা সকল সময় বিচার করিয়া কাজ করিতে পারি না, অভ্যাস বশেই অধিকাংশ কাজ করিয়া থাকি। সেই জন্যই বলা হয় যে **মানবজীবন কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি।** সুতরাং

যাহার যত বেশী সু-অভ্যাস গঠিত হয় সে তত বেশী ভাল কাজ করে বা চরিত্রবান হয়। অতএব **বাল্যকালে কতকগুলি সু-অভ্যাস গঠন করিয়া দিয়াও আমরা শিশুর চরিত্র-গঠনে সাহায্য করিতে পারি।** তাই সু-অভ্যাস গঠনকেও শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বলা যায়।

অভ্যাসের অপকারিতা

সু-অভ্যাস যেমন উপকারী, **কু-অভ্যাস সেইরূপ অপকারী।** তাহা ছাড়া **সম্পূর্ণরূপে অভ্যাসের দাস হইয়া পড়িলে সু-অভ্যাসও অপকার করিতে পারে।** কেননা, কেহ সর্বদা অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া কাজ করিলে তাহার ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং বিচারশক্তি প্রায় লোপ পায়। তখন সে কোন নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইলে নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারে না এবং নিজেকে তাহার উপযোগী করিয়া লইতে পারে না। তাই বলা হয় যে **অভ্যাস ভাল ভৃত্য কিন্তু খারাপ প্রভু** (Habit is a good servant but bad master)। সুতরাং যত বেশী সম্ভব সু-অভ্যাস গঠন করা ভাল, কিন্তু তাহাদের দাস হইয়া পড়া ভাল নহে।

অভ্যাস-গঠনের উপযুক্ত সময়

শৈশবে আমাদের শরীর ও মন খুব কোমল ও পরিবর্তনক্ষম (Plastic) থাকে। ইহা ছাড়া তখন পর্যন্ত বেশী সুদৃঢ় স্নায়ু-সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। তাই এই বয়সেই স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুসন্ধিগুলির পরিবর্তন এবং নূতন নূতন স্নায়ু-সম্পর্ক স্থাপন সহজসাধ্য হয়। সুতরাং **শৈশবই নূতন নূতন অভ্যাস-গঠনের প্রশস্ত সময়।** যতই বয়স বাড়িতে থাকে ততই স্নায়ু-প্রণালীর কোমলতা ও পরিবর্তন-ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং নূতন স্নায়ু-সম্পর্ক স্থাপন কঠিন হয়। এই জন্যই বেশী বয়সে নূতন অভ্যাস গঠন অসম্ভব না হইলেও খুব কষ্টসাধ্য।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, **প্রথম দশ বৎসরই শারীরিক অভ্যাস গঠনের প্রশস্ত সময়।** বিশেষভাবে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় অভ্যাস (Hygienic Habits), শারীরিক দক্ষতার অভ্যাস (Physical

skill Habits), বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া কথা বলা প্রভৃতির অভ্যাস-গঠনের জন্য ইহাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। ইহা ছাড়া সুকুমার **ভাববৃত্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত অভ্যাসগুলি ও নৈতিক অভ্যাসগুলির গঠনকার্যও এই বয়সে আরম্ভ করিতে হয়।** কেননা, ৩০ মাস বয়সের মধ্যেই শিশুর মেজাজ (Temperament) গঠিত হয়। ' শিশু যে-সকল লোকের সংসর্গে থাকে তাহাদের ভাববৃত্তিমূলক কার্যগুলির **অনুকরণ করিয়াই এই বয়সে তাহার ভাববৃত্তিমূলক অভ্যাস গঠিত হয়।** তাই এই বয়সে তাহার স্বভাব যেরূপ হয় পরে তাহার পরিবর্তন একরকম অসম্ভব বলা যায়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, নানা আইন-ভঙ্গকারী (Criminals) লোকের মন্দ অভ্যাসের পরিচয় দশ বৎসরের পূর্বেই পাওয়া যায়। **শিক্ষার অভ্যাসও এই বয়সে গঠিত হয়।** সঠিক পর্যবেক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া, নানা প্রকার গতিমূলক কাজ (Motor Activities), লেখা-পড়া, গণনা, চিন্তা ইত্যাদির অভ্যাসও ১০ বৎসরের পূর্বেই গঠন করিতে হয়।

অভ্যাস-গঠন ও উহার উন্নতি-সাধনের উপায়

(১) **পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান**—বার বার কোন কাজ করিলে তাহা অভ্যাসে পরিণত হয়। সুতরাং কোন কাজের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানই তাহার অভ্যাস-গঠনের প্রধানতম ও অপরিহার্য উপায়।

(২) **নিয়মানুবর্তিতা**—কোন নিয়ম পালন না করিয়া খেয়ালমত কোন কার্য বার বার করিলেও তাহা অভ্যাসে পরিণত হইবে না। কোন কাজের অভ্যাস গঠন করিতে হইলে একটা **নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিয়া তাহার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিতে হইবে।** যেমন, কোন কাজ প্রত্যহ অথবা ১ দিন বা ২ দিন পর পর নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বার বার করিলেই তাহা সহজে অভ্যাসে পরিণত হয়। যথা, শিশুকে কিছুদিন ভোর ৫টায় বা ৬টায় শয্যা ত্যাগ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ ও ভ্রমণ ইত্যাদি করিতে শিক্ষা দেওয়া হইলে, পরে তাহা তাহার অভ্যাসে পরিণত হইবে এবং সে নিজে তদনুযায়ী কাজ করিবে।

(৩) **ব্যতিক্রমের অভাব**—নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী কার্যানুষ্ঠানের কোন ব্যতিক্রম হইতে দিলেই অভ্যাস শিথিল হইয়া পড়ে, বার বার ব্যতিক্রম হইলে অভ্যাস সম্পূর্ণ লোপ পাইতে পারে। সুতরাং অভ্যাস বলবৎ রাখিতে হইলে তাহার ব্যতিক্রম হইতে দেওয়া উচিত নহে; অন্ততঃ অভ্যাস সুদৃঢ় হওয়া পর্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে অভ্যাস-গঠনের ব্যাঘাত হয়। যথা, পুনঃ পুনঃ ১ ঘণ্টা বা ২ ঘণ্টা পরে শয্যা ত্যাগ করিতে দেওয়া হইলে শিশুর নির্দিষ্ট সময়ে শয্যা-ত্যাগের অভ্যাস ভাঙ্গিয়া যাইবে।

(৪) **আগ্রহ**—কোন কাজের অভ্যাস গঠনের জন্য শিশুর আন্তরিক আগ্রহ না থাকিলে শিশু কাজটি বার বার অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিবে না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, অনিচ্ছাসত্ত্বে বাধ্য হইয়া বার বার কোন কাজ করিলেও তাহা সহজে অভ্যাসে পরিণত হয় না। সুতরাং কোন কাজের অভ্যাস গঠন করিতে হইলে যে কোন উপায়েই হউক সেই কাজের প্রতি শিশুর আগ্রহ জন্মাইতে হইবে। যথা, প্রথমে কিছুকাল বীচির সাহায্যে খেলার আকারে গণনা শিক্ষা দেওয়া হইলে শিশু আগ্রহের সহিত গণনা করিবে এবং অল্পকাল মধ্যে গণনার অভ্যাস গঠন করিবে। তাহার পর অভ্যাসবশতঃ বীচির সাহায্য না লইয়াও গণনা করিতে পারিবে।

(৫) **অনুকূল অবস্থা**—অভ্যাস-গঠনের সাহায্য করিবার জন্য প্রথমে কাজটি অনুষ্ঠানের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং বার বার অনুষ্ঠানের সুযোগ দিতে হইবে। অভ্যাস দৃঢ়রূপে গঠিত হইলে প্রতিকূল অবস্থায়ও অভ্যাসমত কাজ করা সম্ভব হইবে। যথা, প্রথমে গ্রীষ্মকালেই সহজে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগের অভ্যাস গঠন করা যায়। অভ্যাস গঠিত হইলে শিশু বর্ষা বা শীতকালেও প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিতে পারিবে।

(৬) **কার্য-নিয়ন্ত্রণ**—কোন কাজ বার বার করিয়া তাহার অভ্যাস গঠিত হইতে পারে, কিন্তু ঠিকভাবে কাজটির অভ্যাস না হইতে পারে বা তাহার কোন উন্নতি (improvement) না হইতে পারে। সুতরাং **ঠিকভাবে কোন কাজ করার অভ্যাস গঠনের জন্য ও তাহার উন্নতি-সাধনের জন্য কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া প্রয়োজনমত**

শিশুর প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। উদ্দেশ্য সামনে স্থাপন, উন্নতির পরিমাণ ·নির্ধারণ (measurement), প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রভৃতির সাহায্যে এই কাজে শিশুর সহযোগিতা লাভ করা যায়। যথা,—প্রথম হইতে ঠিকভাবে কলম ধরিয়া ও পরিচালিত করিয়া আদর্শের আকারে লিখিতে·শিক্ষা দেওয়া না হইলে শিশুর কখনও সুন্দর লেখার অভ্যাস হইবে না।

(৭) **সু-অভ্যাসের আদর্শ সামনে স্থাপন**—শিশুর অনুকরণ-প্রবৃত্তি খুব প্রবল। সুতরাং সু-অভ্যাসের আদর্শ তাহার সামনে স্থাপন করিলে সে তাহার অনুকরণ করিয়া সহজে সু-অভ্যাস গঠন করিবে। যেমন, পরিবারের লোককে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতে দেখিলে শিশু প্রত্যূষে শয্যাত্যাগের চেষ্টা করিবে ও তাহার অভ্যাস গঠন করিবে।

কু-অভ্যাস পরিত্যাগের উপায়

যেরূপে অভ্যাস গঠিত হয় ঠিক সেইরূপেই অভ্যাস ত্যাগ করা যায়। তবে ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতে হয়। যথা,—

(১) **অভ্যাস ত্যাগের আগ্রহ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা** লইয়া তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অভ্যাসের অপকারিতা চিন্তা করিয়া তৎপ্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিলেই তাহা ত্যাগের জন্য আগ্রহ হইবে।

(২) অভ্যাসবশতঃ কাজটি করিবার প্রবৃত্তি জন্মিলে **ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করিয়া তাহা হইতে বিরত হইতে হইবে**। যত বেশী বার প্রবৃত্তি দমন করিয়া কোন কার্যানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত থাকা যায় ততই তাহার অভ্যাস শিথিল হইয়া পড়ে। অভ্যাস অনুযায়ী কাজ করিবার সময় উপস্থিত হইলে নিজের হাত-পা বাঁধিয়া রাখিতে বা নিজেকে একটা ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াও অনেকে তাহা হইতে বিরত হইবার চেষ্টা করে এবং পরিশেষে অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

(৩) কোন অভ্যাস ত্যাগের জন্য, যে নিয়মে কাজ করিবার অভ্যাস হইয়াছে, ইচ্ছা করিয়া তাহার **যত বেশী ব্যতিক্রম করা যায়, অভ্যাসটি ততই শিথিল** হইয়া পড়ে।

(৪) পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী কাজ করিবার সময়ে **অন্য কোন আনন্দজনক কর্মে নিযুক্ত** থাকিলে অভ্যাস অনুযায়ী কার্যানুষ্ঠানে বিরত থাকা সহজ হয়। যথা, কাহারও সন্ধ্যার সময়ে মদ্যপানের অভ্যাস গঠিত হইয়া থাকিলে কিছুদিন সেই সময়ে সিনেমায় গিয়া সুন্দর সুন্দর ছবি দেখার কাজে নিযুক্ত থাকিলে মদ্যপানের অভ্যাস ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

References

1. W. Mc Dougall—Social Psychology, Chap. XIV.
2. J. Ross—Groundwork of Educational Psychology, Chap. VI-VII.
3. Sarat Ch. Brahmachary—ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, Chap. XXII.
4. Norseworthy and Whitley—The Psychology of Childhood, Chap. X.

অবসাদ

(Fatigue)

অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের ফলে কর্মশক্তি হ্রাস পাওয়াকেই অবসাদ বলে। অবসাদ এবং কার্য করিবার অনিচ্ছা এক কথা নহে। কর্মশক্তি অটুট থাকিয়াও নানা কারণে কর্মে অনিচ্ছার বা বিরক্তির সৃষ্টি হইতে পারে। যথা, গৃহে আলো-বাতাসের অভাবে, আরামের সহিত বসিতে না পারায়, কাজ চিত্তাকর্ষক না হওয়ায় বা একঘেয়ে হওয়ায় কাহারও কোন কাজ করিতে অনিচ্ছা বা বিরক্তি-বোধ (boredom) হইতে পারে। সেই সকল কারণ দূরীভূত হইলেই সে পূর্ণ উদ্যমে কাজ করিতে পারিবে। অবসাদগ্রস্ত হইলে সে চেষ্টা করিয়াও পূর্বের ন্যায় কার্য করিতে পারিবে না। তখনও কাজ করিবার চেষ্টা করিলে তাহার কর্মশক্তি ক্রমশঃ অধিকতর হ্রাস পাইবে এবং পরিশেষে একেবারে লোপ পাইতে পারে।

১। মানসিক অবসাদের শারীরিক কারণ

(Physiological reasons for Mental Fatigue)

সকলেই জানে যে, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে মানসিক অবসাদ আসে। কিন্তু কি শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে অবসাদ আসে তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন। নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল।

(১) খাদ্য হজম হইয়া কর্মশক্তিদায়ক এক প্রকার রাসায়নিক মিশ্র পদার্থে (Chemical Compound) পরিণত হয়। **অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে এই কর্মশক্তিদায়ক মিশ্র পদার্থ খরচ হইয়া যায় বলিয়া কার্য-শক্তি হ্রাস পায় বা মানুষ অবসাদগ্রস্ত হয়।**

(২) মাংসপেশীর অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তাহাদের তন্তুগুলি (Fibres) ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এক প্রকার **আবর্জনার** (Waste Products)

সৃষ্টি হয়। সেগুলি রক্তপ্রবাহের দ্বারা চালিত হইয়া **স্নায়ু-সন্ধিতে** (Synapses) **গিয়া জমা হয় এবং তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহ গমনে বাধা দেয়।** ইহার ফলেই শরীর ও মন অবসাদগ্রস্ত হয়।

(৩) অম্লজানের (Oxygen) সাহায্য ব্যতীত কর্মশক্তিদায়ক মিশ্র পদার্থ কাজ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া অম্লজান স্নায়ু-সন্ধিতে সঞ্চিত আবর্জনা দূরীকরণেরও সাহায্য করে। সুতরাং **মানব-দেহে অম্লজান সরবরাহ কম হইলেও মানুষ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।**

২। মানসিক অবসাদের বাহ্যিক কারণ

(১) অনেকক্ষণ একটানা মানসিক কাজ করিলে **মন অবসাদগ্রস্ত হয়।** পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে যে বিভিন্ন বয়সের শিশু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটানা মনোযোগ দিতে পারে। তাহা হইতে অধিকক্ষণ একটানা অধ্যয়ন করিলে বা পাঠ গ্রহণ করিলে বা কোন মানসিক কাজ করিলে তাহার মন অবসাদগ্রস্ত হইবে।

(২) **শ্রেণীকক্ষে বা পড়িবার কক্ষে ভাল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না করিলে** অল্প মানসিক শ্রমেও মন অবসাদগ্রস্ত হইবে। অম্লজান সরবরাহের অপর্যাপ্ততাই তাহার কারণ।

(৩) অধ্যয়নের সময় শিশু যদি আরামের সহিত **খাড়া হইয়া না বসে** বা বসিতে না পারে তবে শীঘ্র অবসাদগ্রস্ত হইবে। কারণ ইহাতে তাহার শরীরের রক্তপ্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়।

(৪) **অনেক ছাত্র এক ঘরে বসিয়া মানসিক কাজ করিলে** তাহারা শীঘ্র অবসাদগ্রস্ত হইবে। কারণ ইহার ফলে ঘরের অভ্যন্তরস্থ বায়ুতে অম্লজানের ভাগ কমিয়া যাইবে ও কার্বনিক এসিডের ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

(৫) শিশুকে **যত বেশী ইচ্ছামূলক মনোযোগ দান করিতে হয়** তাহার মন তত বেশী অবসাদগ্রস্ত হয়। কারণ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের জন্য বেশী মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। সুতরাং পাঠ চিত্তাকর্ষক না হইলেও শিশু শীঘ্র অবসাদগ্রস্ত হয়।

(৬) পরীক্ষার ফলে নির্ধারিত হইয়াছে যে **কতকগুলি পাঠ্য বিষয় বেশী অবসাদকর।** সুতরাং সে সকল বিষয় বেশীক্ষণ অধ্যয়ন করিলে বা দিবসের শেষ ভাগে অধ্যয়ন করিলে শিশু অবসাদগ্রস্ত হয়। অবসাদের পরিমাণানুযায়ী নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল।

(১)	অঙ্ক	১০০
(২)	সংস্কৃত, আরবী, লাটিন বা বিদেশী ভাষা	৯০
(৩)	জিমনাষ্টিকস্	৯০
(৪)	ইতিহাস ও ভূগোল	৮৫
(৫)	মাতৃভাষা	৮২
(৬)	প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	৮০
(৭)	ড্রইং	৭৭

(৭) **দিবসের শেষ ভাগে ও সপ্তাহের শেষ ভাগে** ছাত্র বেশী অবসাদগ্রস্ত হয়। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে প্রথমে কিছুকাল কাজ করিবার পর কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায়; ইহাকে গরম হওয়া বলে। তখন কিছুক্ষণ ভাল কাজ করা যায়, কিন্তু তাহার পর বিশ্রাম না করিলে কর্মশক্তি হ্রাস পায় বা মন অবসাদগ্রস্ত হয়।

(৮) **অসুস্থ শরীরে** বা মনের অশান্তি লইয়া মানসিক কাজ করিলে শীঘ্র অবসাদ আসে।

(৯) অল্পবয়স্ক বালকবালিকা মধ্যে মধ্যে কিছু **পুষ্টিকর খাদ্য না খাইয়া অনেকক্ষণ অধ্যয়ন করিলে** বা পাঠগ্রহণ করিলে তাহাদের মন অবসন্ন হয়। সাধারণতঃ অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা পাঠের পর কিছু পুষ্টিকর খাদ্য না খাইলে তাহারা অবসাদগ্রস্ত হইবে।

৩। অবসাদের লক্ষণ

অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়াই তাহাদের মানসিক অবসাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ অবসাদগ্রস্ত হইলে তাহাদের চোখে-মুখে তাহার ছাপ ফুটিয়া উঠে; তাহাদের মুখ ম্লান হয়, হাই উঠে,

চোখের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ হয় এবং চোখ বুজিয়া আসে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও দেখা যায় যে তাহারা চেষ্টা করিয়াও পাঠে মনোযোগ দিতে পারিতেছে না, সহজ প্রশ্নেরও ঠিক উত্তর দিতে পারিতেছে না বা উত্তর দিতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হইতেছে বা সাধারণ হিসাব করিতেও ভুল করিতেছে। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাইলে মনে করিতে হইবে যে, তাহাদের মন অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত উপায়ে মানসিক অবসাদ আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় ঃ—

(১) সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ের পার্থক্য নিরূপণ। যখন দেখা যায় যে উত্তর করিতে পূর্বাপেক্ষা বেশী সময়ের প্রয়োজন হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে ছাত্র অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে।

(২) লেখায় ও পড়ায় বা হিসাবে ভুল-বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণ। ভুল-বৃদ্ধিও মানসিক অবসাদের একটা লক্ষণ।

(৩) মনোযোগ রাখার সময় নির্ধারণ। যে সময়ের জন্য একজন ছাত্র মনোযোগ রাখিতে পারে তাহার দৈর্ঘ হ্রাস পাওয়া অবসাদের প্রমাণ।

(৪) স্মরণ রাখার শক্তি পরীক্ষা। প্রথমে যে ছাত্র একবার পড়িয়া ৫টা শব্দ স্মরণ রাখিতে পারে, পরে সে যদি তাহা হইতে কম শব্দ স্মরণ রাখিতে পারে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সে অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে।

(৫) মানসাঙ্কের সাহায্যে মানসিক অবসাদ সহজে নির্ধারণ করা যায়। কারণ অবসাদগ্রস্ত হইলে মানসাঙ্কের সঠিক উত্তর দিতে পারে না।

৪ : মানসিক অবসাদের প্রতিকার

(১) **বিশ্রাম—বিশ্রাম বা কর্মবিরতিই শারীরিক ও মানসিক অবসাদের প্রধান প্রতিকার।** যখনই অবসাদের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে বা প্রমাণ পাওয়া যাইবে, তখনই অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য কাজ বন্ধ রাখিতে হইবে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে ৩০।৩৫ মিনিট মানসিক কাজের পর অন্ততঃ ৫ মিনিট এবং ২।৩ ঘণ্টা কাজের পর অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে দেওয়া আবশ্যক। ৫।৬ দিন কাজের পর একদিন পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। নিদ্রাই

সম্পূর্ণ মানসিক বিশ্রাম। সুতরাং **নিদ্রাই মানসিক অবসাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিকার**। ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকাগণের রাত্রে ১০ ঘণ্টা, ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত ৮ ঘণ্টা এবং মানসিক কার্যে নিযুক্ত যুবকগণের রাত্রে অন্ততঃ ৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া দরকার। রাত্রে এই পরিমাণ নিদ্রা না হইলে তাহারা দিবাভাগের মানসিক পরিশ্রমজনিত অবসাদমুক্ত হইতে পারিবে না।

(২) **পুষ্টিকর খাদ্য**—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে খাদ্যই আমাদিগকে কর্ম-শক্তি দান করে। সুতরাং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিলেই আমরা কর্মক্ষম হইতে পারি। যখন অবসাদের লক্ষণ ফুটিয়া উঠে তখন বুঝিতে হইবে যে, খাদ্য হইতে প্রাপ্ত কর্মশক্তিদায়ক রাসায়নিক মিশ্র পদার্থের পুঁজি ফুরাইয়া আসিয়াছে। **তখন কিছু পুষ্টিকর খাদ্য খাইলে অবসাদ দূর হইবে** এবং পুনঃ কিছুক্ষণ কাজ করিবার শক্তি আসিবে। এই জন্যই অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণকে ২।৩ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রমের পর কিছু পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

(৩) **আলো বাতাস**—মানসিক অবসাদের প্রতিকার হিসাবে খাদ্যের পরই বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা বায়ুর স্থান। ইহার কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং শ্রেণীকক্ষে ও পড়িবার ঘরে আলো প্রবেশের ও বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

(৪) **একটানা পাঠদানের বা অধ্যয়নের সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা**। কত বয়সের ছাত্র কতক্ষণ পর্যন্ত এক বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে পারে তাহা পরীক্ষার ফলে নির্ধারিত হইয়াছে। তাহার বেশী সময় পাঠ না দিলে বা একটানা অধ্যয়ন করিতে না দিলে অবসাদ আসিবে না (অবশ্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনঃ কাজ করিতে পারে)।

(৫) **সাধারণ শারীরিক কাজ বা অঙ্গ-সঞ্চালন**। অনেকক্ষণ মানসিক কাজের পর কিছুক্ষণ শারীরিক কাজ বা অঙ্গসঞ্চালন করিলে মানসিক অবসাদের কিছু প্রতিকার হয়। কারণ ইহাতে ছাত্রগণের শরীরে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পাইয়া স্নায়ুর সংযোগস্থলসমূহে সঞ্চিত আবর্জনা অপসারণে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া ইহাতে মানসিক কাজের ফলে **মস্তিষ্কে**

যে রক্ত সঞ্চিত হয় তাহা নামিয়া আসে। সেইজন্য প্রত্যেক ঘণ্টা পাঠের পর অল্পবয়স্ক বালকবালিকাকে ৫ মিনিট শ্রেণীর মধ্যে অঙ্গসঞ্চালন করিতে দেওয়া উচিত। দুপুরের ছুটির সময় ছাত্রগণকে শ্রেণী-কামরায় চুপচাপ বসিয়া থাকিতে না দিয়া বাহিরে গিয়া দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। দিবসের শেষ অংশে অল্পবয়স্ক ছাত্রগণকে অবসাদগ্রস্ত হইতে দেখিলে পাঠ কিছুক্ষণ স্থগিত রাখিয়া শ্রেণী-ব্যায়াম করিতে দেওয়া উচিত। ইহা ছাড়া সকল ছাত্রছাত্রীকে দিবসের শেষভাগে এক ঘণ্টা খেলিতে বা ড্রিল করিতে বাধ্য করা প্রয়োজন।

(৬) ছাত্রগণ যাহাতে **আরামের সহিত খাড়াভাবে** বসিতে পারে সেরূপ আসনে বসিতে দিলে শীঘ্র অবসাদ আসিবে না।

(৭) **পাঠ যতটা সম্ভব চিত্তাকর্ষক করিলে ছাত্রগণ শীঘ্র অবসাদ-গ্রস্ত হইবে না**। কারণ এরূপ পাঠে তাহারা বেশী স্বাভাবিক মনোযোগ দিতে পারিবে ও ইচ্ছাশক্তির বেশী ব্যবহার করিতে হইবে না।

(৮) বেশী **অবসাদকর বিষয়সমূহের পাঠ দিবসের প্রথম ভাগে** বা দুপুরের ছুটির পরের ঘণ্টায় **শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা** করিলে ছাত্রগণ তাহাদের পাঠ-গ্রহণে বেশী অবসাদগ্রস্ত হইবে না।

(৯) পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ও বিভিন্ন মনোবৃত্তির ব্যবহার হয় এমন পাঠ দিলে ছাত্রগণ বেশী অবসাদগ্রস্ত হইবে না।

(১০) শরীর অসুস্থবোধ করিলে বা মনে কোন অশান্তি থাকিলে মানসিক কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করা বা ছাত্রকে ছুটি দেওয়া উচিত।

৫। অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় কাজ করার কুফল

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক কার্যশক্তি সীমাবদ্ধ। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়ম পালন করিয়া ও পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া প্রকৃতির নিয়মানুসারেই আমাদের কার্যশক্তি একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারি, কিন্তু কোন উপায়েই প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পারি না; আমরা যদি আমাদের কর্মশক্তির সীমা অতিক্রম করিতে যাই তাহা হইলেই

অবসাদগ্রস্ত হইব। সুতরাং অবসাদকে প্রকৃতির সাবধান-ইঙ্গিত বলা যায়। তাহা অবহেলা করিয়া তাহার পরও যদি কাজ করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে আমাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন না হইয়া পারে না। শারীরিক অবসাদ আসিলে তাহা বাহ্যতঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং আমরা সাবধান হইতে পারি। কিন্তু সজাগ দৃষ্টি না রাখিলে মানসিক অবসাদ প্রথমে ধরা পড়ে না। সেইজন্য অবসাদপ্রাপ্ত মন লইয়াও আমরা অনেক সময় মানসিক কাজ করিতে থাকি। ইহাতে আমাদের মানসিক শক্তির অপব্যবহার হয় মাত্র, প্রকৃত কাজ হয় না। কারণ মন অবসাদগ্রস্ত হইলে আর মনোযোগ দেওয়া যায় না এবং মনোযোগ না দিয়া কোন্ মানসিক কাজই করা যায় না। শুধু তাহা নহে, প্রকৃতির এই দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম অবহেলা করিয়া কাজ করিতে গেলে আমাদিগকে তাহার অনিবার্য ফল ভোগ করিতে হয়। প্রথমে আমাদের কর্মশক্তি দ্রুত হ্রাস পায়; তখনও কাজ করিতে চেষ্টা করিলে আমাদের শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়ে, এমন কি চিরতরে অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেও পারে। সুতরাং অবসাদ সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষকগণের সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অবসাদের যে সমস্ত প্রতিকার প্রস্তাব করা হইয়াছে সেগুলি অবলম্বন করিয়া অবসাদ নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার পরও অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই ছাত্রগণের মানসিক কাজ বন্ধ করিতে হইবে। তাহা না করিলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের স্বাস্থ্যহানির জন্য তাঁহারাই দায়ী হইবেন।

References

1. P. Sandiford—Educational Psychology, Chap. XIII.
2. J. Watson—Psychology from the standpoint of a Behaviourist, Chap. V.
3. Starch—Educational Psychology, Chap. XI.
4. Sarat Chandra Brahmachary—ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, ৩য় অধ্যায়।
5. Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study, Chap. V.

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

ভাষার সহিত চিন্তার সম্পর্ক

(Relation between Language and Thought)

শিশু প্রথমে নানারূপ অঙ্গভঙ্গির দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে। পরে যখন সে বাগ্‌যন্ত্রের ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে তখন সে তাহার মনের ভাব বাগ্‌যন্ত্রের ভঙ্গির দ্বারা বা ভাষায় প্রকাশ করে। ইহার অর্থ এই যে, প্রথমে তাহার চিন্তার সহিত অঙ্গভঙ্গির সম্পর্ক স্থাপিত হয়, পরে তাহার চিন্তার সহিত বাগ্‌যন্ত্রের ভঙ্গির বা ভাষার সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ভাষার সহিত শিশুর চিন্তার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে শিশু যে ভাষার সাহায্যে কেবল তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে তাহা নহে, সে ভাষায় চিন্তা করিতেও শিখে। ইহাকেই **ভাষার অভ্যাস** (Language Habit) বলে। প্রথম প্রথম সে যাহা চিন্তা করে তাহাই ভাষায় প্রকাশ করে (Thinks aloud—explicit language)। সেই জন্যই ৩।৪ বৎসরের শিশু সর্বদা কথা বলিতে থাকে। তাহার পর সে ক্রমশঃ মনে মনে কথা বলিতে শিখে (Talks mentally—implicit language), অর্থাৎ তখন সে নীরব ভাষায় চিন্তা করিতে শিখে। তখন কোন জিনিষ দেখিলে, কোন শব্দ শুনিলে, কোন জিনিষ স্পর্শ করিলে, বা অন্য যে-কোন অভিজ্ঞতা লাভ করিলে, সে মনে মনে ভাষায় তাহার বর্ণনা দেয় বা চিন্তা করে এবং তাহার ফলেই এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাহার সঠিক ধারণা হয় ও তাহার স্মরণ থাকে। ওয়াটসনের মতে ভাষার সাহায্য না লইয়া কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না। ৩।৪ বৎসরে শিশুর ভাষার অভ্যাস হয় না বলিয়াই সেই বয়স পর্যন্ত কোন অভিজ্ঞতা মানুষের স্মরণ থাকে না।

অপরদিকে ভাষা তখন তাহার উপর একটা শক্তিশালী বহিঃপ্রভাবের কাজ করে (Serves as a strong external stimulas) এবং সে ভাষায় তাহার প্রতিক্রিয়া করিতে শিখে। অর্থাৎ অন্যের কথা শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া তাহার মন প্রভাবিত হয় এবং ভাষায় তাহার ফল বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। ইহার

ফলে সে ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা করিতে পারে এবং তাহার শিক্ষার ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ আমাদের স্কুল-কলেজে প্রধানতঃ ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা দেওয়া হয়। এমন কি পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা বা হাতের কাজের দ্বারা যে শিক্ষা হয়, ভাষার সাহায্য ব্যতীত তাহাও সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয় না।

ইহা ছাড়া ভাষা আমাদের জাতিজ্ঞানও বৃদ্ধি করে। কারণ বিভিন্ন জাতীয় জীব, বস্তু, গুণ বা কার্যের নাম লইয়াই ভাষা গঠিত হয়। সে সকল নামের সাহায্যেই আমরা জাতি নিরূপণ করিতে পারি এবং জাতিজ্ঞান আমাদের মানস-ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতে পারি। যথা,—মানুষ, গরু, ছাগল প্রভৃতি নামের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি এবং সেই জ্ঞান স্মরণ রাখিতে পারি।

সর্বশেষ ভাষাই আমাদের চিন্তাধারাকে শৃঙ্খলাপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত (logical) করে। পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, প্রথমে শিশুর চিন্তা এলোমেলো থাকে। ভাষার অভ্যাস সুগঠিত হইলেই তাহার চিন্তাধারা শৃঙ্খলাপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত হয়। কেননা ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা আমাদের ভাষা শৃঙ্খলাপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার ব্যবহারের ফলে আমাদের চিন্তাধারাও শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শিশু ভাষার সাহায্যে শিক্ষা করে, চিন্তা করে, তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে, অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করে, অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখে, জাতিজ্ঞান লাভ করে ও স্মরণ রাখে এবং ভাষার সাহায্যেই তাহার চিন্তাশক্তি পুষ্ট হয় ও চিন্তাধারা শৃঙ্খলাপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত হয়। বস্তুতঃ মানুষ যে আজ প্রাণিজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলিয়া গর্ব করে তাহার জন্য সে ভাষার নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণী। কেননা, ভাষার সাহায্য ব্যতীত মানুষের বর্তমান মানসিক উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হইত না।

References

1. Watson—Psychology from the standpoint of a Behaviourist, Chap. IX.
2. J. Ross—Groundwork of Educational Psychology, Chap. XII.
3. P. Sandiford—Educational Psychology, pages 6,195,249-50.

বিংশ পরিচ্ছেদ

ইচ্ছাবৃত্তি

(Will)

চেষ্টা করিয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার মানসিক শক্তিকে ইচ্ছাবৃত্তি বলে। ইহা কেবল কোন কাজ করিবার ইচ্ছা নহে। প্রবৃত্তিবশতঃও আমাদের কোন কাজ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে। কোন কাজের সহিত মানসিক প্রচেষ্টাও যুক্ত না থাকিলে তাহাকে ইচ্ছাবৃত্তির কাজ বলা যায় না। শিশু প্রবৃত্তিবশতঃ খেলা করিতে পারে, ইহাতে তাহার ইচ্ছাবৃত্তির কিছুমাত্র ব্যবহার না হইতে পারে। কিন্তু সে মানসিক চেষ্টা করিয়াই গণিতের একটা কঠিন অঙ্ক কষিতে পারে, ইচ্ছাবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত ইহা করা যায় না।

তিন কারণে মানসিক চেষ্টা করিয়া কাজ করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। যথা,—(১) **কোন কঠিন কাজ করিবার জন্য** মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন হয় ; (২) কাজ সম্পাদনের পথে **বাধাবিঘ্ন** থাকিলে তাহা **অতিক্রম করিবার জন্যও** মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন হয় ; (৩) কোন **নীচ প্রবৃত্তি দমন** করিয়া অন্য উচ্চ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে হইলে মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন হয়। অতএব এই তিন প্রকারের কাজকে **ইচ্ছামূলক কাজ** বলা যায়।

পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্য কোন কাজ করিতে মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহারা কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ নহে। তাহার জন্য স্বতন্ত্র কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ইচ্ছাবৃত্তির কাজকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার **সহিত জ্ঞান ও ভাববৃত্তির কাজও জড়িত আছে।** কোন কাজ করার ইচ্ছা হওয়ার পূর্বে সেই কাজ সম্বন্ধে এবং তাহা করার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে

জ্ঞানলাভের প্রয়োজন। কিন্তু কেবল জ্ঞানলাভেও কোন কাজ করার ইচ্ছা না হইতে পারে। জ্ঞানলাভের ফলে সেই কাজ সম্বন্ধে কোন ভাববৃত্তি জাগরিত হইলেই সেই কাজ করার ইচ্ছা হইবে।

ইচ্ছাবৃত্তির মূল্য

মানুষ প্রবৃত্তিবশে কাজ করিতে পারে অথবা ইচ্ছাবৃত্তির ব্যবহার করিয়া কাজ করিতে পারে। প্রবৃত্তিমূলক কার্য খুব নিম্নস্তরের এবং তাহার ক্ষেত্রও খুব সীমাবদ্ধ। **সমস্ত উচ্চ মানসিক কাজের জন্য ইচ্ছা-শক্তির সাহায্য লইতে হয়।** যে-সকল কার্যে গভীর চিন্তা, উন্মুক্ত কল্পনা বা উচ্চ বিচারশক্তির প্রয়োজন হয়, ইচ্ছা-বৃত্তির সাহায্য ব্যতীত সে-সকল কার্য সম্পাদন করা যায় না। বস্তুতঃ ইচ্ছা-বৃত্তির সাহায্য ব্যতীত শারীরিক বা মানসিক কোন কঠিন কার্যে সফলতা লাভ করা যায় না। বিশেষতঃ ইচ্ছাবৃত্তির সাহায্যেই মানুষ প্রবল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে এবং নীচ প্রবৃত্তি দমন করিয়া উন্নত জীবন যাপন করিতে পারে।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি মনস্বিতারই পরিচায়ক, ক্ষীণমেধা শিশুর ইচ্ছাশক্তিও দুর্বল হয়। অপরদিকে **ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্ব প্রায় একার্থ-বোধক।** কারণ যাহার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল সে আত্মপ্রতিষ্ঠার (Self-assertion) চেষ্টা করিতে পারে না, এবং যাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি নাই তাহার ব্যক্তিত্বও থাকিতে পারে না। শুধু তাহা নহে, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হইলে মানুষ বিচার করিয়া কাজ করিতে পারে না, কর্তব্যাকর্তব্যও স্থির করিতে পারে না; হয়ত সে ভুল কাজ করে অথবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কার্যবিরত থাকে। সুতরাং **দুর্বল ইচ্ছাশক্তি লইয়া মানুষ চরিত্রবান্ হইতেও পারে না।**

ইচ্ছা-বৃত্তির বিকাশ

কেবলমাত্র ইচ্ছামূলক কাজের দ্বারাই ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হইতে পারে। সুতরাং শিশুর ইচ্ছাশক্তির বিকাশের জন্য তাহাকে নিম্নলিখিত ইচ্ছামূলক কাজ করিতে দিতে হইবে।

(১) **কোন বিষয়ে দীর্ঘকাল মনোযোগ দান।** পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রবৃত্তিমূলক মনোযোগকেও দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তির সাহায্য লইতে হয়।

(২) **চিত্তাকর্ষক নহে এরূপ বিষয়ে মনোযোগ দান।** ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার না করিয়া সেরূপ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যায় না।

(৩) **নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে মনোযোগ দান।**

(৪) যে-কোন **কঠিন মানসিক কার্য-সম্পাদন।**

(৫) দিন-চর্যা তৈয়ার করিয়া তদনুযায়ী **দৈনিক কার্য-সম্পাদন।**

(৬) **নিজে নিজে বিচার করিয়া কর্তব্য-নির্ধারণ।** সকল সময়ে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হইলে শিশুর ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইবে না। এই জন্যই বলা হয় যে দৃঢ়চিত্ত পিতামাতার সন্তানগণ সাধারণতঃ দুর্বলচিত্ত হয়।

(৭) **যত্নের সহিত কর্তব্য পালন।** শিশুর কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি করিলে এবং প্রতিকূল অবস্থায়ও কর্তব্য সম্পাদন করিতে উৎসাহ দিলে তাহার জন্য তাহাকে ইচ্ছাশক্তির সাহায্য লইতে হইবে। ফলে তাহার ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হইবে।

(৮) **সংযমের কাজ।** কোন নীচ প্রবৃত্তি দমন করিতে যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হয়। সুতরাং, শিশুকে আত্মসংযমে অভ্যস্ত করিলে তাহার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইবে।

(৯) **আত্মসম্মানবোধ-পরিচায়ক কাজ।** শিশুর আত্মসম্মানবোধ জাগাইতে পারিলে সে তাহার হানিকর কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিবে। তাহার ফলে তাহার ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হইবে।

(১০) **নৈতিক সাহসের কাজ।** এরূপ কাজের জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হয়। সুতরাং ইচ্ছাশক্তির কিছু বিকাশ হইলেই এরূপ কাজ করিতে উৎসাহ দেওয়া যায়।

References

1. Mc. Dougall– Social Psychology, Chap. IX.
2. J. Ross—Groundwork of Educational Psychology, Chap. VII.
3. P. Nunn—Education : Its Data and First Principles, Chaps. III and XIII.

একবিংশ পরিচ্ছেদ

চরিত্র-গঠন

(Formation of Character)

আদর্শ-চরিত্র গঠনই শিক্ষার সর্ববাদিসম্মত সর্বপ্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই শিশুর সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হয় এবং এই লক্ষ্য সাধিত না হইলে তাহার সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মানুষের চরিত্র বলিতে তাহার সমস্ত ইচ্ছাকৃত কাজ বা ব্যবহারের সমষ্টি বুঝায়। **সুতরাং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে, সকল অবস্থায় ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে শিক্ষাদানই শিশুর চরিত্র-গঠন।** কিন্তু বাহির হইতে জোর করিয়া শিশুর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিলেই তাহার চরিত্র গঠিত হইবে না। কারণ সে স্বেচ্ছায় যে কাজ বা ব্যবহার করে তাহার দ্বারাই তাহার চরিত্রের বিচার করা যায়। সুতরাং শিশুর চরিত্র-গঠনের জন্য তাহাকেই স্বচেষ্টায় তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিতে হইবে। **নিজে বিচার করিয়া সকল অবস্থায় কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিলে এবং দক্ষতার সহিত তাহা সম্পাদন করিতে পারিলেই শিশুর চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলা যায়।** কেহ কেহ **সম্পূর্ণ আয়ত্তীকৃত ইচ্ছাকেই চরিত্র বলেন।** কেননা ইচ্ছাশক্তির সাহায্য ব্যতীত কেহ নিপুণতার সহিত বিচার করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারে না এবং দক্ষতার সহিত তাহা সম্পাদন করিতে পারে না। বিশেষতঃ কর্তব্যের পথ প্রায়ই নানা বাধাবিঘ্ন-সঙ্কুল হয়। ইচ্ছাশক্তির সাহায্যেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়। অতএব চরিত্র-গঠনের জন্য ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে ইচ্ছাবৃত্তির সহিত জ্ঞান এবং ভাববৃত্তিও সকল সময় জড়িত থাকে। কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভের ফলেই সে সম্বন্ধে কোন ভাব জাগে এবং তাহাই কর্মপ্রেরণা দেয়। বস্তুতঃ প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব হইলে আমরা ঠিক কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারি না এবং কোন

প্রবল ভাব না জাগিলে আমরা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কর্তব্য করিবার শক্তি পাইতে পারি না। সুতরাং দক্ষতার সহিত কর্তব্য করিবার জন্য আমাদিগকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে এবং আমাদের সুকুমার ভাববৃত্তিগুলির বিকাশ-সাধন করিতে হইবে। শুধু তাহা নহে, ঠিকভাবে কর্তব্য করিতে হইলে আমাদের চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, কল্পনাশক্তিরও বিকাশের প্রয়োজন। বস্তুতঃ **চরিত্র-গঠনের জন্য সমস্ত মানসিক বৃত্তির—বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাববৃত্তি উভয়েরই বিকাশের প্রয়োজন হয়।** কেননা সকল অবস্থায় দক্ষতার সহিত কর্তব্য করিবার জন্য সমস্ত মানসিক বৃত্তিরই সাহায্য লইতে হয়। সুতরাং শিশুর চরিত্র-গঠনের জন্য স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নাই। **তাহার সমস্ত শিক্ষাকার্যকেই চরিত্র-গঠনের কার্য বলা যায়।** কেবল তাহার চরিত্র-গঠনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার সমস্ত শিক্ষাকার্য পরিচালিত করিলেই সেই লক্ষ্য সাধিত হইবে। **শিশুকে যে-কোন বিষয় বা কার্য শিক্ষা দেওয়া হউক, বা শিশুর শিক্ষার জন্য যে-কোন ব্যবস্থাই করা হউক, সকল সময় দেখিতে হইবে যে তাহার দ্বারা শিশুর ব্যবহার কিভাবে প্রভাবিত হইবে এবং শিশুজীবনের সকল ক্ষেত্রে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কতটা তৈয়ার হইবে।** তাহা হইলেই শিশুর শিক্ষা তাহার চরিত্র-গঠনকারী হইবে। তবে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতকগুলি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও তাহাদের উপর বেশী জোর দিতে হইবে। নিম্নে সেই বিষয়গুলি বর্ণিত হইল।

শিশুর চরিত্র-গঠনের উপায়

(১) **সহজবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ ও বিশুদ্ধীকরণ।** শিশু প্রথমে কেবল সহজবৃত্তির প্রেরণায় কাজ করে এবং তাহারাই তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে। তাহার ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হওয়া পর্যন্ত সে কেবল প্রবৃত্তিমূলক কাজই করিতে পারে। সুতরাং তাহার সহজবৃত্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিয়াই শিশুর চরিত্র গঠন করা যায়। যথা,—শিশু স্বভাবতঃই স্বার্থপর এবং তাহার আত্মবোধ অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু ক্রমশঃ

তাহার আমিত্বের ক্ষেত্র বিস্তার করিয়া নিজ পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সহপাঠী, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, দেশবাসী প্রভৃতিকেও আপনার বলিয়া ভাবিতে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায়।

(২) **সুঅভ্যাস গঠন**। সহজবৃত্তিগুলির সাহায্যে শৈশবে কতকগুলি সুঅভ্যাস গঠন করিয়া দিতে পারিলে, তাহারা শিশুর চরিত্রের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিবে। কারণ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ কার্য অভ্যাসের সাহায্যেই সম্পন্ন করি। সুতরাং অল্প বয়সে যাহার যত বেশী সুঅভ্যাস গঠিত হইবে তাহার জীবন ও চরিত্র ততই উন্নত ও মহৎ হইবার সম্ভাবনা।

(৩) **ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ**। শিশুর ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হওয়া পর্যন্ত তাহার প্রকৃত চরিত্র-গঠন সম্ভব নহে। কারণ মানুষ চিন্তা ও বিচার করিয়া স্বেচ্ছায় যে কাজ করে তাহাই তাহার চরিত্রের সামিল হয়। ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হওয়ার পূর্বে শিশু চিন্তা ও বিচার করিয়া কাজ করিতে পারে না। তাই শিশুর চরিত্র নাই বলিলেও চলে।

ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রকৃত চরিত্র-গঠন আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ সাধন করিয়াই তাহার চরিত্র গঠন করা যায়। কারণ ইচ্ছাবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত মানুষ চিন্তা ও বিচার করিয়া কোন কাজ করিতে পারে না। শুধু তাহা নহে, ইচ্ছাবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত অন্য মানসিক বৃত্তিগুলিরও বিকাশ বা ব্যবহার হইতে পারে না। সুতরাং শিশুর প্রকৃত চরিত্র গঠনের জন্য সর্বপ্রথমে তাহার ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ-সাধনের ব্যবস্থা করিতে হয়। বস্তুতঃ **চরিত্র ইচ্ছাবৃত্তির কাজেরই ফল**। সুতরাং ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ সাধন করিতে পারিলে চরিত্র-গঠনের কাজও অনেকটা অগ্রসর হইবে।

(৪) **বিচারশক্তির বিকাশ**। দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ কাজ অভ্যাসের সাহায্যে সম্পাদিত হইলেও আমাদের জীবনে বিচার করিয়া কাজ করিবার সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা কম নহে। কেননা বিচারশক্তির সাহায্য না লইয়া আমরা কোন নূতন অবস্থায় আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারি না। বস্তুতঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল অবস্থায় নিজে বিচার করিয়া

কর্তব্য নির্ধারণের শক্তিদানকেই শিশুর চরিত্র-গঠন বলা যায়। অবশ্য ইহার জন্য অন্য মানসিক বৃত্তিগুলিরও সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজে বিচার করিয়া তাহার কর্তব্য নির্ধারণ করিতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলা যায় না। সুতরাং শিশুর বিচারশক্তির বিকাশ-সাধন না করিয়া তাহার চরিত্র গঠন করা যায় না।

(৫) **কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি**। শিশুর কর্তব্যজ্ঞান না জন্মিলে সে বিচার করিয়া কর্তব্য নির্ধারণেরও চেষ্টা করিবে না, ইচ্ছাবৃত্তির ব্যবহার করিয়া কর্তব্য করিতে প্রবৃত্তও হইবে না। সুতরাং শিশুর চরিত্র-গঠনের জন্য তাহার কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন। ছোটবেলা হইতে যত্নের সহিত কর্তব্য করিতে শিক্ষা দিলেই শিশুর কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া সর্বদা তাহাকে অন্যের নির্দেশমত কাজ করিতে অভ্যস্ত না করিয়া তাহার শক্তিসাধ্য কোন কোন কাজের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত করিলেও তাহার কর্তব্য-জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে।

(৬) **সুকুমার ভাববৃত্তির বিকাশ**। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভাববৃত্তিই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। বিশেষতঃ নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কর্তব্য করিবার জন্য কোন প্রবল ভাববৃত্তির প্রেরণার প্রয়োজন হয়। সুকুমার ভাববৃত্তিগুলিই আমাদিগকে সেইরূপ কর্মপ্রেরণা দিতে পারে। প্রেম, দয়া, সহানুভূতি, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যানুরাগ, ধর্মানুরাগ প্রভৃতি সুকুমার ভাববৃত্তিগুলি বিকশিত হইলেই তাহারা আমাদিগকে নানা সৎকার্যে প্রেরণা দিতে পারে এবং আমাদের জীবন সুন্দর ও মহৎ করিতে পারে। সুতরাং শিশুর চরিত্র-গঠনের জন্য তাহার সুকুমার ভাববৃত্তিগুলির বিকাশের চেষ্টা করাও প্রয়োজন।

(৭) **আত্মসংযম শিক্ষাদান**। কিন্তু কেবল সুকুমার ভাববৃত্তিগুলি বিকশিত হইলেই শিশু চরিত্রবান হইবে না। তাহারা তাহাকে ভাল কাজে প্রবৃত্তি দিলেও, সে ভাবাবেশে বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলিতে পারে এবং পদে পদে ভুল করিতে পারে। সুতরাং তাহার ভাববৃত্তিগুলি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে যাহাতে নিজের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া না ফেলে তাহার জন্য তাহাকে আত্ম-সংযমও শিক্ষা দিতে হইবে। ইহার জন্য বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সাহায্য

লইতে হয়। ভাবাবেশে ভাসিয়া না গিয়া ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে ভাবাবেগ দমন করিতে এবং সর্বদা বিচার করিয়া কাজ করিতে তাহাকে শিক্ষা দিলে সে সংযত হইবে।

(৮) **সুশাসন বা নিয়মানুগামিতা**। শিশুর চরিত্রের উপর সুশাসনের প্রভাবও কম নাই। প্রথমে শিশু নিজে বিচার করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারে না এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নীচ প্রবৃত্তি দমন করিতে ও উচ্চ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে না। সুতরাং তাহার ইচ্ছাশক্তি ও বিচারশক্তির যথেষ্ট বিকাশ হওয়া পর্যন্ত তাহাকে সুশাসনাধীনে রাখা প্রয়োজন। শিশুর পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া তাহাকে তদনুযায়ী কাজ করিতে শিক্ষা দিলে তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং চরিত্র-গঠনের অনেক সাহায্য হইবে।

(৯) **উদাহরণ বা আদর্শ প্রদর্শন**। সকলেই জানে যে শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য উপদেশ হইতে উদাহরণই অধিকতর কার্যকরী। চরিত্র-গঠন কার্যে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হয়। কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে শিশুকে উপদেশ দেওয়ার চেয়ে তাহার সামনে সৎকার্যের উদাহরণ স্থাপন করিতে পারিলেই তাহাদের বেশী শিক্ষা হয়। বস্তুতঃ শিক্ষক ও অভিভাবক তাহাদের উদাহরণের দ্বারাই শিশুর চরিত্র সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত করিতে পারেন। তাঁহারা নিজে সংযত, কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যপরায়ণ হইয়াই শিশুকে সেই সকল মহৎগুণ শিক্ষা দিতে পারেন। ইহা ছাড়া ছোটবেলা হইতে আদর্শ লোকের জীবনী পাঠ করিতে শিক্ষা দিলেই শিশু তাহাদের আদর্শে নিজ জীবন ও চরিত্র গঠন করিতে উৎসাহিত হইবে।

(১০) **নীতিশিক্ষা**। শিশুর চরিত্র-গঠনের জন্য তাহার শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নীতিশিক্ষাও দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ভাগে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হইবে। এই স্থলে এইমাত্র বলা প্রয়োজন যে, সূক্ষ্ম ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা শিশুর নাই। তাহাকে কতকগুলি সারগর্ভ নীতিবাক্য শিক্ষা দিলে এবং আদর্শ-চরিত্র লোকগণের জীবনী, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ হইতে সেই সমস্ত নীতি-বাক্যের

প্রদীপক (illustrative) দৃষ্টান্ত দেখাইলেই তাহার প্রয়োজনীয় নীতিজ্ঞান হইবে এবং সে নৈতিক উপদেশগুলি অনুসরণের চেষ্টা করিবে।

(১১) **ধর্মশিক্ষা।** ধর্মই মানুষকে সৎকার্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রেরণা দেয় এবং মন্দকার্য হইতে নিবৃত্ত করে। সুতরাং শিশুর হৃদয়ে ধর্মের বীজ বপন না করিলে এবং ভগবানকে ভয় ও ভক্তি করিতে শিশুকে শিক্ষা না দিলে, তাহার চরিত্র-গঠন কার্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

References

1. D. Starch—Educational Psychology, Chap. XIII.
2. J. Ross—Ground-work of Educational Psychology, Chaps. IV & VIII
3. T. Raymont—The Principles of Education, Chap. I.
4. Sarat Ch. Brahmachari—ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, ২৩শ অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশু

বর্তমান সময়ে শিক্ষাদান কার্যে শিশুর উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এখন শিশুকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।

বিষয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা ও শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা।

পূর্বকালে শিক্ষা বিষয়-কেন্দ্রিক ছিল, অর্থাৎ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বা বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষা দেওয়া হইত। বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত খবর সংগ্রহ করিয়া এবং তাহা সুশৃঙ্খলভাবে সাজাইয়া শিশুর নিকট উপস্থিত করা হইত এবং তাহা শিশুর মনে গাঁথিয়া দিতে পারিলেই শিক্ষাদান-কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে **বিষয়ের জ্ঞানদান বা লাভই শিক্ষা নামে অভিহিত হইত**। যে শিশু শিক্ষালাভ করিবে তাহার কথা কিছুমাত্র বিবেচনা করা হইত না। বয়স্ক মানুষ যুক্তিযুক্ত ভাবে (logically) চিন্তা করে বলিয়া **শিশুকেও যুক্তিযুক্ত প্রণালীতে** (Logical Method) **বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হইত**। তাহা যে শিশুর উপযোগী নহে তাহার ধারণা ছিল না। যথা, ভাষাশিক্ষার প্রথমেই শিশুকে তাহার নিকট দুর্বোধ্য কঠিন কঠিন শব্দগুলি মুখস্থ করিতে হইত; ভাষার বিশেষ জ্ঞানলাভের পূর্বেই ব্যাকরণের কঠিন কঠিন সূত্র শিক্ষা করিতে হইত; কোন বিষয় শিক্ষা করার প্রথমেই সেই বিষয় ও তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত সমস্ত জিনিষের সংজ্ঞা দেওয়া হইত। তাহার পরেই বিষয়টি যুক্তিযুক্ত আকারে সাজাইয়া শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হইত। **শিশুর প্রকৃতি, শক্তি, ক্রমবিকাশ ও অভিজ্ঞতার উপযোগী আকারে ও পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইত না।**

বর্তমান সময়ে শিশুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বা শিশুকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা এখনও অস্বীকার করা হয় না ; কিন্তু বয়স্ক লোকের ন্যায় পূর্ববর্ণিত যুক্তিযুক্ত (logical) প্রণালীতে শিশুকে সেই জ্ঞান দান করা হয় না। কারণ বয়স্ক মানুষ যে-ভাবে চিন্তা করে, যে দৃষ্টিতে কোন বিষয় বা জিনিষ দেখে, যে-ভাবে কোন কার্য করে, শিশু সে-ভাবে চিন্তা করে না, সে দৃষ্টিতে কোন জিনিষ বা বিষয় দেখে না ও সে-ভাবে কাজ করে না। শিশু কেবল একটা ক্ষুদ্র মানুষ নহে। **রুচি, শক্তি, প্রবৃত্তি, চিন্তাধারা, ভাবধারা প্রভৃতি বিষয়েও শিশু বয়স্ক মানুষ হইতে ভিন্ন।** সুতরাং শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে হইলে, শিশুর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বা শিশুকে কেন্দ্র করিয়া, তাহার উপযোগী আকারে ও পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে। বিশেষতঃ শিশুর ক্রমবিকাশের সহিত মিল রাখিয়া শিক্ষা না দিলে তাহা শিশুর বিকাশের সাহায্য না করিয়া বরং তাহার পথে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। শিশু কোন্ বয়সে কি-ভাবে চিন্তা করে, কি-ভাবে জ্ঞান সংগ্রহ করে, কি-ভাবে কাজ করে, কি পছন্দ করে, কি অপছন্দ করে, কিসে তাহার আনন্দ হয়, কিসে তাহার দুঃখ হয় ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ও তাহাদের সহিত মিল রাখিয়া শিক্ষা না দিলে সেই শিক্ষার দ্বারা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের সাহায্য হইতে পারে না। যেমন, শিশু প্রথমে কেবল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে ; সুতরাং প্রথমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারেই সমস্ত বিষয় শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে। শিশু গল্প শুনিতে ভালবাসে ; সুতরাং গল্পের আকারেই তাহাকে বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে। শিশু খেলা করিতে ভালবাসে ; সুতরাং তাহাকে খেলার আকারে নানা কাজ করিতে দিতে হইবে এবং খেলার ভিতর দিয়া নানারূপ শিক্ষা দিতে হইবে। বিশেষতঃ শিশু যে বয়সে যে বিষয় শিক্ষার উপযুক্ত হয় তাহাকে সে বয়সে সে বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার পূর্বে বা পরে শিক্ষা দিতে গেলে সে তাহা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না। সুতরাং শিশুর প্রকৃতি, শক্তি ও ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ও তাহাদের সহিত মিল রাখিয়া তাহার শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাদিগকে

তাহার উপযোগী আকারে সাজাইয়া লইতে হইবে, তাহার উপযোগী প্রণালীতে সেগুলি শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষাকেই **শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা** বলে। ইহাও দেখা যাইবে যে, এইরূপ শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হইতে **শিশু সম্বন্ধে জ্ঞান কম প্রয়োজনীয় নহে**। অনেক শিশুকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াই শিশু সম্বন্ধে এই জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত চেষ্টায় শিশু সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভের শক্তি ও সুযোগ সকল শিক্ষকের থাকিতে পারে না। **অনেক খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিশুকে পর্যবেক্ষণ করিয়া ও নানা পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে শিশু-মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে।** শিক্ষকমাত্রেই উহা পাঠ করিয়া শিশু-সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। অবশ্য **ইহার পরও শিশুকে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয়।** কারণ স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের সিদ্ধান্তগুলির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা না করিলে শিশু সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা যায় না এবং কার্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করা যায় না।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ এবং তদুপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা

শৈশব (Infancy) ১—৩ বৎসর।

ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই শিশুর দেহ প্রায় সম্পূর্ণ হয়। কেবল তাহার দন্তোদ্গম হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্রুত বিকাশ হইতে আরম্ভ করে। সে প্রথমে কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের উপর তাহার কোন কর্তৃত্ব থাকে না। **ক্রমশঃ সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কিছু কিছু কর্তৃত্ব লাভ করে।** কিছু দেখিবার জন্য চক্ষু সঞ্চালন করিতে পারে, কোন জিনিষ লইবার জন্য হাত বাড়াইতে পারে ; কোন জিনিষ হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে চাহে, মুখে দিতে বা ছুঁড়িয়া ফেলিতে চাহে। ছয় মাস বয়সে শিশু মাথা স্থির রাখিয়া বসিতে পারে, ছয় মাসের পর কোন শব্দ হইলে সে তাহা আগ্রহের সহিত শুনিতে চাহে, কাহারও পদশব্দ হইলে মুখ ফিরাইয়া কে আসিতেছে দেখে। প্রায় ১ বৎসর বয়সে শিশু দাঁড়াইতে শিখে এবং দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যে হাঁটিতে পারে। এই সময়ে সে আধ-আধ কথাও বলিতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যে সে অনেক শব্দ শিখে, কোন কোন জিনিষের নাম করিতেও পারে। **তৃতীয় বৎসরে সে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে,** এবং দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিতে পারে। তখন সে ভালভাবে কথা বলিতে পারে এবং সর্বদা কথা বলিতে চাহে।

শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক বিকাশও হইতে থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার কেবল **ইন্দ্রিয়ানুভূতি** (Sensation) হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞান (Perception) হয় না। তবে তাহার **কতকগুলি স্বাভাবিক স্বক্রিয় প্রবৃত্তি** (Reflex) ও সহজবৃত্তি (Instinct)

থাকে। সে সেই প্রবৃত্তিবশেই স্তন্য পান করে। **অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে আরম্ভ করে। তাহার পর তাহার চিন্তা-শক্তির ও ভাব-বৃত্তির উন্মেষ হয়।** প্রথম বৎসরের মধ্যেই তাহার আনন্দ, ভয়, দুঃখ ও ক্রোধ প্রভৃতি ভাববৃত্তির উন্মেষের প্রমাণ পাওয়া যায়। সে তাহার মাতাকে দেখিলে আনন্দিত হয়, মাতা চলিয়া গেলে বিমর্ষ হয় এবং মাতা কোলে না লইলে বিরক্ত হয়। **দ্বিতীয় বৎসরেই তাহার অনুকরণ-প্রবৃত্তি জন্মে** এবং সে অনুকরণ করিয়াই কথা বলিতে শিখে। **এই সময়ে তাহার স্মৃতি-শক্তি এবং কল্পনা-শক্তিরও উন্মেষ হয়। তৃতীয় বৎসরেই** স্মৃতি-শক্তির বিশেষ বিকাশ হয় ও **স্থায়ী স্মৃতি-ভাণ্ডার গঠন আরম্ভ হয়। ৩ বৎসরের পূর্বের কোন কথা কেহই স্মরণ করিতে পারে না।**

ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাহার যে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বর্ণিত হইল তাহাই তাহার প্রকৃত প্রাথমিক শিক্ষা। অবশ্য **কেবল প্রাকৃতিক** (Physical) **ও সামাজিক পরিবেষ্টনীর প্রভাবেই শিশুর এই শিক্ষা হয় বা বিকাশ হয়।** সুতরাং পরিবেষ্টনীর নিয়ন্ত্রণ করিয়া, তাহার এই প্রাথমিক শিক্ষা বা বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই সময়ে তাহার ইন্দ্রিয়ানুভূতি খুব প্রবল থাকে। তাই **কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যেই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায়।** যেমন, তাহার চক্ষুর সামনে বিভিন্ন বর্ণের ও আকারের জিনিষ স্থাপন করিলে, তাহার বর্ণ ও আকারের জ্ঞান জন্মে। সেই সকল রঙীন জিনিষ ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া তাহাকে চক্ষু সঞ্চালন করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। তাহার কর্ণের নিকট মৃদু, উচ্চ, নানা প্রকার শব্দ ও মধুর সঙ্গীত করিয়া তাহার শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ করা যায়। বিভিন্ন দিক হইতে শব্দ করিয়া শব্দাগমের দিক স্থির করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। নাসিকার সামনে বিভিন্ন গন্ধ-দ্রব্য স্থাপন করিলে তাহার ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। কোমল, কঠিন, শীতল, উষ্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিষ চর্মে স্পর্শ করাইলে তাহার স্পর্শজ্ঞান জাগরিত হয়। অবশ্য এই বয়সের শিশু পরিবেষ্টনীর এই-সমস্ত প্রভাবের ইচ্ছামূলক বাহিক প্রতিক্রিয়া করিতে পারে

না। কিন্তু তাহার ভিতরে প্রবৃত্তিমূলক কাজ হয় ও তাহাতেই তাহার বিকাশের সাহায্য হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে শিশুকে অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। সে দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে শিখিলে তাহাকে স্বাধীনভাবে (freely) হাঁটিতে ও অঙ্গ-সঞ্চালন করিতে দিতে হয়। তাহার ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির দ্রুত বিকাশ হয়। কথা বলিতে আরম্ভ করিলে তাহার কর্ণের নিকট এক একটি শব্দ বিশুদ্ধভাবে বার বার উচ্চারণ করিয়া তাহাকে শীঘ্র বিশুদ্ধ কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া যায়।

প্রথম বাল্যাবস্থা (Early Childhood) ৩—৬ বৎসর।

এই বয়সে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি তেমন দ্রুত হয় না, কিন্তু **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর তাহার অধিকতর কর্তৃত্ব জন্মে।** সে দ্রুত হাঁটিতে ও দৌড়াইতে পারে এবং এক মুহূর্তও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চাহে না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার **খেলার প্রবৃত্তি খুব বাড়িয়া যায়,** সে চব্বিশ ঘণ্টাই খেলিতে চাহে; তাই **ইহাকে খেলার বয়স বলে।** এই সময়ে **তাহার অনুসন্ধিৎসাও খুব প্রবল হয়।** সে তাহার চারিপার্শ্বের সমস্ত জিনিষ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চাহে। মাতৃভাষার ব্যবহারেও অধিকতর দক্ষতা লাভ করায় সে সমস্ত জিনিষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে থাকে। 'কি ?' এবং 'কেন ?'—এই দুই প্রশ্ন সর্বদা তাহার মুখে লাগিয়া থাকে। তাই **এই বয়সকে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার বয়সও বলে** (Questioning age)। এই সময় তাহার **অনুকরণ-প্রবৃত্তি ও অভিনয়-প্রবৃত্তি খুব প্রবল হয়।** সে সর্বদা বয়স্ক লোকদের অনুকরণ করিতে থাকে এবং নানা লোক বা প্রাণী সাজিয়া অভিনয় করিতে চাহে। তাই পুতুলখেলা এই বয়সের শিশুদের প্রধান কাজ হইয়া পড়ে। একটা বালিশকে পর্যন্ত খোকা সাজাইয়া তাহারা অভিনয় করে। এই সময়ে **তাহার কল্পনাশক্তিরও বিকাশ হয়।** তাই সে রোমাঞ্চকর গল্প শুনিতে ভালবাসে। এই বয়সে শিশুর **স্মৃতিশক্তিও সতেজ থাকে** এবং তাহার

স্মৃতি স্থায়ী হয়। সে ছোট ছোট কবিতা মনে রাখিতে পারে, নিজের কোন কাজের সরল বর্ণনা দিতে পারে ও গণনা করিতে পারে। **তাহার বুদ্ধিবৃত্তির এবং ইচ্ছাশক্তিরও বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়।** সে বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে পার্থক্য করিতে ও তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারে। **এই সময়ে তাহার আমিত্ব-জ্ঞানের উন্মেষ হয় এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি জন্মে।** ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মাবমাননার প্রবৃত্তিও জাগরিত হয়, তাই সে গুরুজনের সম্মান করিতে ও তাহাদের আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত থাকে।

শিক্ষা—পূর্বে এই বয়সে শিশু কেবল দৌড়াদৌড়ি করিয়া ও খেলা করিয়া বেড়াইত, তাহার শিক্ষা আরম্ভ করা হইত না। কিন্তু ইতিপূর্বে শিশুর বিকাশের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, শিশুকে নানা রকম শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই বয়স বেশ উপযোগী। তবে তাহাকে **এই বয়সে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া যায় না, তাহার বিকাশের সহিত মিল রাখিয়া নানা রকম খেলা ও কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া যায়।** ইউরোপে এই বয়সের শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য **ফ্রোবেলের শিশুর উদ্যান** (Kinder-garten of Frobel) ও **ডাক্তার মন্তেসরীর শিশুর গৃহ** (Children's House of Dr. Montessori) নামক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে।[১] যে স্থানে সে রকম বিদ্যালয় নাই তথায় গৃহেই এই বয়সের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। **মাতা বা শিক্ষয়িত্রীই এই শিক্ষার ভার গ্রহণের অধিকতর উপযোগী।**

এই বয়সের উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা—

১। **জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যবহার**—শৈশবের ন্যায় এই বয়সেও শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি খুব সতেজ থাকে। তাই **প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই তাহাকে শিক্ষা দিতে হয়।** তাহার স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা-প্রসূত প্রশ্ন করিতে নিরুৎসাহিত না করিয়া যতদূর সম্ভব পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তাহাদের

১ মৎপ্রণীত 'আধুনিক বিশেষ পদ্ধতি'র প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

উত্তর পাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তাহার **জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির যথেষ্ট ব্যবহারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করিয়া বস্তু-পাঠ ও প্রকৃতি-পাঠ শিক্ষা দিয়াই শিশুর এই জ্ঞান-তৃষ্ণার তৃপ্তি সাধন করা যায়।** অবশ্য এই বয়সে উক্ত দুই বিষয় পাঠের সূচনা করা যায় মাত্র।

২। **কথোপকথন ও গল্প—কথোপকথন ও গল্পের মধ্য দিয়াই ভাষা-শিক্ষার সূচনা করিতে হয়।** কৌতূহলোদ্দীপক ও রোমাঞ্চকর গল্প বলিলে শিশু খুব আনন্দ পাইবে এবং তাহাতে তাহার কল্পনা-শক্তিরও বিকাশ হইবে। **কিন্তু ভূতের গল্প বা ভয়োৎপাদক গল্প বলা ভাল নয়।** ইহাতে শিশুর অন্তরে ভয়ের ভাব প্রবল হয় ও সে ভীরু হয়। তাহার পরিবর্তে মানুষের দুঃসাহসিক কাজের গল্প বলা যাইতে পারে।

৩। **হাতের কাজ**—খোদানো ছবির উপর হস্ত-পরিচালনা, নক্সা সম্পূর্ণ করা, শ্লেটে বা কাগজে নিজ ইচ্ছামত ছবি আঁকা, কাগজ ভাঁজ করিয়া বা কাটিয়া নানা জিনিষ তৈয়ার করা, মাটির জিনিষ তৈয়ার করা ইত্যাদি। ফ্রোবেলের ব্যবস্থামত খেলনাগুলির ব্যবহারও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

৪। **গণনা শিক্ষা—কেবল বস্তুর সাহায্যে ১০০ পর্যন্ত** সংখ্যা গণনা ও সরল যোগ-বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া যায়।

৫। **গান—সহজ সহজ গান ও কর্মসঙ্গীত** (Kinder-garten songs) শিক্ষা দেওয়া উচিত।

৬। **আবৃত্তি ও অভিনয়**—ছোট ছোট কবিতা মুখে মুখে শিক্ষা করিয়া আবৃত্তি করিতে এবং বালকোচিত অভিনয় করিতে উৎসাহ দেওয়া ভাল।

৭। **খেলা—প্রধানতঃ খেলার ভিতর দিয়াই এই বয়সে শিশুকে শিক্ষা দিতে হয়।** দড়ি লইয়া লাফ দিতে ও সরল নৃত্য করিতেও শিক্ষা দেওয়া যায়। ফ্রোবেলের ব্যবস্থামত **দলবদ্ধ খেলার** ব্যবস্থা করাও ভাল।

৮। **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা**—নিজে হাত-মুখ ধুইয়া ফেলা, পায়খানায় গিয়া জলশৌচ করা, স্নান করা ইত্যাদি কাজ শিশুকে শিখাইতে হইবে। নিজের কাপড় ধুইয়া লইতে, কামরা পরিষ্কার করিতে, জামা-কাপড়

পরিতে, কাপড়-চোপড়, জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিতেও শিক্ষা দিতে হইবে (Montessori Method)।

৯। **লেখাপড়া শিক্ষা**—এই স্তরের শেষে ষষ্ঠ বৎসরে মন্তেসরী প্রণালীতে লেখা ও পড়া শিক্ষা দেওয়া যায়। (মৎপ্রণীত 'আধুনিক বিশেষ পদ্ধতি'র ১ম ও ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

শেষ বাল্যাবস্থা (Later Childhood) ৭—১০ বৎসর

এই বয়সে দুগ্ধদন্তের পতন হয় এবং স্থায়ী দন্তোদ্গম হয়। **শরীরের বৃদ্ধিও খুব দ্রুত হয়,** শরীরের দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা বৎসরে প্রায় ২ ইঞ্চি বাড়ে এবং **মস্তিষ্কের প্রায় $\frac{8}{9}$ অংশ পূর্ণ হয়।** অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্রুত বিকাশ ও তাহাদের উপর অধিকতর কর্তৃত্ব লাভের ফলে বালক-বালিকারা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে, সর্বদা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করিতে ভালবাসে। অপর দিকে তাহাদের মানসিক বিকাশও দ্রুত হয়। কোন বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ-দানের শক্তি বাড়ে। তাহাদের **স্মৃতিশক্তিও এই সময়ে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ হয়।** দশম বৎসরেই স্মৃতি সর্বাপেক্ষা সতেজ হয়। এই বয়সে সে ছবি দেখিতে ভালবাসে, **তাই ইহাকে ছবির বয়স** (Pictorial Age) **বলা হয়। তাহার কল্পনা-শক্তিরও দ্রুত বিকাশ হইতে থাকে।** তাই সে রোমাঞ্চকর গল্প শুনিতে ভালবাসে। কিন্তু এখন আর সে অসম্ভব গল্প বিশ্বাস করে না; **সত্য, মিথ্যা, সম্ভব-অসম্ভব বিচার করিতে আরম্ভ করে।** এইরূপে তাহার **বিচার-শক্তিরও উন্মেষ হয়।** সে একই রকমের জিনিষের মধ্যেও পার্থক্য বাহির করিতে পারে। এই সময়ে তাহার **আমিত্ব-জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়** এবং সে অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের বুদ্ধিতে চলিতে চাহে। ইচ্ছাশক্তির কিছু বিকাশের ফলে সে আত্মসংযম করিবারও অধিকতর শক্তিলাভ করে। সে আর **পূর্বের ন্যায় অন্ধভাবে আদেশ পালন করে না।** তবে যে সমস্ত লোক বা গল্পের নায়ক তাহার প্রশংসা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে তাহাদিগকে অনুকরণ করিতে ও তাহাদের আদেশ পালন করিতে ভালবাসে। **উদাহরণের সাহায্য ব্যতীত নীতি সে এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।** ভাল

উদাহরণ বা আদর্শ তাহার উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। এই বয়সে সে কখনও একা থাকিতে চাহে না, **দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ও কাজ করিতে চাহে।**

শিক্ষা-ব্যবস্থা। শেষ বাল্যাবস্থায় শিশুগণ প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযোগী হয়। সুতরাং এই স্তরের শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা হইবে। তবে সাধারণভাবে এই বয়সের ছাত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা যাইতে পারে। **এই স্তরেও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার** (Sense-training) **শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।** সুতরাং বস্তুপাঠ ও প্রকৃতিপাঠ শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্গত থাকিতে হইবে। **যথেষ্ট খেলার ও হাতের কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে** ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে। গল্পের আকারে ও ছবির সাহায্যে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হইবে। স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে **স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি পালনেরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।** এই বয়সেই বস্তুর সাহায্যে গণিত-শিক্ষা হইতে লিখিত গণিত-শিক্ষায় লইয়া যাইতে হইবে। এই স্তরে **নৈতিক শিক্ষা এবং ধর্ম শিক্ষাদানেরও** বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ এই বয়স পর্যন্ত **শিশু নীতিজ্ঞানশূন্য** (Unmoral) **থাকে। ইহার পরেই সে দুর্নীতিপরায়ণ** (Immoral) হইতে পারে। তবে শুধু নৈতিক উপদেশে কোন ফল হইবে না। ভাল আদর্শ সম্মুখে স্থাপন, ভাল কাজে নিয়োগ এবং আদর্শ-চরিত্র লোকের জীবনী-পাঠই অধিকতর ফলপ্রদ। এই বয়সে **ধর্মাচরণ শিক্ষা দেওয়াই ধর্ম শিক্ষাদানের একমাত্র কার্যকরী উপায়।** এই বয়সের ছেলেমেয়েদের **দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে এবং খেলা করিতে দেওয়াও প্রয়োজন।**

কৈশোর (Boyhood or Girlhood) ১১—১৪ বৎসর

এই বয়সে **বালিকাগণের দ্রুত শারীরিক বিকাশ হয়, কিন্তু বালকগণের শারীরিক বিকাশ কিছু বাধাপ্রাপ্ত হয়।** তবে তাহাদের মাংসপেশীগুলি সুগঠিত ও শক্ত হয় এবং তাহারা অধিকতর কার্যক্ষম হয়।

সেইজন্য তাহারা **শ্রমজনক-ক্রাড়া ভালবাসে**। এই সময়ও স্মৃতিশক্তি বেশ সতেজ থাকে এবং চিন্তাশক্তির দ্রুত বিকাশ হয়। এখন তাহারা **বস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য বা বিমূর্ত (Abstract) বিষয়ের চিন্তা করিতে পারে**। কোন বিষয় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিতে পারে। তাহাদের **ইচ্ছাশক্তির বিকাশ** হওয়ায় তাহারা এখন চেষ্টা করিয়া কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে এবং বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে পারে। ইহা ছাড়া তাহারা এখন কিছু কিছু **যুক্তির অনুসরণ করিতে পারে**। নীতির ক্ষেত্রেও এখন স্বরচিত কতকগুলি নিয়মের অনুসরণ করিতে চাহে। তাহাদের প্রশংসার উপযুক্ত লোক বা গল্পের নায়কের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কতকগুলি কাজ ভাল ও কতকগুলি কাজ মন্দ বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করে।

শিক্ষা—এই বয়সে ছাত্রগণ মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠের উপযুক্ত (Higher Elementary Schools of other countries) হয়; তাহাদের উপযোগী শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। এই স্থলে এই পর্যন্ত বলা যায় যে এই **বয়স শিক্ষার খুব প্রশস্ত সময়**। এই সময়ে বালক-বালিকাগণ **উদার শিক্ষালাভের জন্য** (For Liberal Education) প্রয়োজনীয় নানা বিষয় অধ্যয়ন আরম্ভ করিতে পারে। বিশেষভাবে এই বয়সে মাতৃভাষার যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ভাষাজ্ঞান গভীর করিতে পারে। **কোন বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে তাহাও এই বয়সে আরম্ভ করা উচিত**। গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি যুক্তিপূর্ণ বিষয় পাঠ আরম্ভ করিবারও এই সময়। এই বয়সে প্রকৃতি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে **পরীক্ষার সাহায্যে প্রাথমিক বিজ্ঞানের** (Elementary Science) **জ্ঞান অর্জনও** আরম্ভ করা যায়। বালকগণ **নিয়মপূর্ণ শ্রমজনক খেলা খেলিতে পারে,** বালিকাগণকে নানাপ্রকার নৃত্যশিক্ষা দিলে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এখন তাহাদিগকে **নৈতিক গুণ সম্বন্ধেও উপদেশ** দেওয়া যায়। তবে উদাহরণের সাহায্যে উপদেশ না দিলে তাহা কার্যকরী হয় না। ধর্মাচরণের সঙ্গে সঙ্গে **ধর্মশাস্ত্র পাঠও** এই বয়সে আরম্ভ করা যায়।

যৌবনোন্মুখ অবস্থা (Adolescence) ১৫—১৮

এই বয়সে বালক-বালিকাদের **সর্বাপেক্ষা বেশী দ্রুত শারীরিক বিকাশ ও শারীরিক পরিবর্তন হয়**। কারণ ইহাই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থল। ১৪ বৎসরের বালক ১৮ বৎসরে যুবকে পরিণত হয়। এই সময়ে তাহাদের শরীরের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পায়, স্বর পরিবর্তিত হয়, শরীর খুব কর্মঠ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় খুব সতেজ হয়। **১৭।১৮ বৎসরে শারীরিক বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণ হয়**। ইহার পরও মাংসপেশীর বিকাশ বা উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু শরীরের আয়তন বা উচ্চতা আর বিশেষ বাড়ে না।

শরীরের সঙ্গে এই বয়সে **মনেরও অত্যধিক পরিবর্তন হয়**। মস্তিষ্কের আয়তন সম্ভবতঃ এই সময়ে সম্পূর্ণ হয় এবং মনের উচ্চবৃত্তি-সকল বিকশিত হয়। তাই **বস্তু-সম্পর্ক-শূন্য ও যুক্তিপূর্ণ বিষয়** (Abstract and Logical Subject) হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয় এবং সেই রকম বিষয় শিক্ষায় তাহারা বেশী আনন্দ পায়। এই বয়সে বালক-বালিকারা অত্যধিক **কল্পনাপ্রবণ ও ভাবপ্রবণ হয়**। বর্তমান হইতে ভবিষ্যতের চিন্তাই তাহাদের মনের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে। ভবিষ্যতের উচ্চ আশা ও স্বপ্নে তাহাদের মন বিভোর থাকে। তাই **দিবাস্বপ্ন এই বয়সের ধর্ম** বলা হয়। এই বয়সে **শারীরিক ও মানসিক কর্মশক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও উত্তেজনায় মন সর্বদা উদ্বেলিত হয়,** প্রবল ভাবপ্রবাহ তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চাহে। সাধারণতঃ এই বয়সে তাহাদের **আত্মশক্তিতে অতিবিশ্বাস হয়,** কোন কাজই তাহারা অসম্ভব বলিয়া মনে করে না। সামাজিক ও নৈতিক বিষয় তাহাদের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে। **ধর্ম ও জাতির উন্নতিসাধনে তাহারা অতিশয় আগ্রহশীল হয়**। এই বয়সে বালক-বালিকাগণ অত্যধিক **সঙ্গপ্রিয়ও হয়** এবং তাহাদের উপর সঙ্গীর প্রভাব খুব প্রবল হয়। **বীরপূজা** (Hero-worship) **এই বয়সের ধর্ম**। তাই তাহারা নেতার আদেশ বা উপদেশমত যে-কোন কাজ করিতে প্রস্তুত থাকে। কোন বড় নেতা নিকটে না থাকিলে সমপাঠীদের বা সঙ্গীদের মধ্যে

একজনকে নেতা নির্বাচন করে। নেতার অধীনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতেই তাহারা খুব আনন্দ পায়। এই বয়সেই **তাহাদের যৌন-প্রবৃত্তির** (Sex-instinct) **উন্মেষ হয়** এবং তাহা তাহাদের জীবনের উপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষা-ব্যবস্থা

এই বয়সে বালক-বালিকাগণকে পরিচালন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কেননা, তাহাদের প্রবল ভাবপ্রবাহ দমনের চেষ্টা করিলে তাহারা হয়ত বিদ্রোহী হইবে, বাধাপ্রাপ্ত খরস্রোতা তটিনীর ন্যায় উছলিয়া উঠিবে, অথবা আত্মপ্রকাশের সুযোগ না পাইয়া সমস্ত কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলিবে এবং জীবন্মৃত অবস্থায় কোনমতে জীবন কাটাইবে। সুতরাং **তাহাদের প্রবল ভাবপ্রবাহ রোধ করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহা সুপথে পরিচালনার চেষ্টাই করিতে হইবে।** তাহাদিগকে অবসর সময়ে সমাজসেবা, দেশ-সেবা, দীনদুঃখীর সেবা, দলবদ্ধ হইয়া দেশ-ভ্রমণ প্রভৃতি ভাল কাজে নিয়োজিত রাখিলে তাহাদের প্রবল ভাবপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং তাহাদের বিপুল কর্মশক্তির সদ্ব্যবহার হইবে। তবে পূর্বোক্ত মহৎ কাজসমূহে যোগ দিয়াও বিপথগামী হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। **সুনেতার অভাব বা কুনেতার** প্রভাবই তাহার প্রধান কারণ। অথচ কোন না কোন নেতার অধীনে কাজ করা এই বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম। সুতরাং শিক্ষক এবং অভিভাবককেই খুব সাবধানতার সহিত তাহাদের উপযুক্ত নেতা নির্বাচন করিয়া দিতে হইবে, অথবা যখনই সম্ভব তাঁহাদিগকে নিজেই নেতার স্থান, অন্ততঃ প্রধান নেতার স্থান, গ্রহণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ এই সময়েই শিক্ষককে ছাত্রের বন্ধু, পরিচালক ও বিজ্ঞ উপদেষ্টা হইতে হয়।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই বয়সের বালক-বালিকাগণ **অন্ধভাবে আদেশ পালন করে না, আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং যুক্তির সাহায্যেই তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে হইবে।** অপর দিকে শিক্ষক ও অভিভাবককে খুব সাবধানতার সহিত তাহাদের **সঙ্গী-নির্বাচন**

করিয়া দিতে হইবে। কারণ এই সময়ে কুসঙ্গের প্রভাবেই অধিকাংশ ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়। তাহা ছাড়া কর্মহীনতাও এই বয়সের ছেলেমেয়েদের সর্বনাশের কারণ হয়। সুতরাং তাহাদিগকে সর্বদাই কোন-না-কোন **ভাল কাজে নিয়োজিত** রাখিতে হইবে। তাহাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করিবার জন্য যখনই সম্ভব **তাহাদের উপর এক এক কাজের ভার দেওয়া উচিত** এবং তাহাদের স্কন্ধে কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দেওয়া উচিত। তাহা করিলেই অন্যের উপর নির্ভরশীল বালকবালিকা এই বয়সের পর স্বাবলম্বী ও দায়িত্বশীল পুরুষ বা স্ত্রীতে পরিণত হইতে পারে। এই সময়ে তাহাদের **ভাবপ্রবণ হৃদয়ে নানা উচ্চাশা জাগাইতে হইবে** এবং নানা উচ্চ আদর্শ তাহাদের সামনে ধরিতে হইবে, যেন সেগুলি অনুকরণ করিয়া তাহারা নিজ নিজ জীবন উন্নত করিতে পারে। তাই এই বয়সে পৃথিবীর নানা দেশের নেতৃস্থানীয় মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ করিতে তাহাদিগকে খুব উৎসাহ দেওয়া উচিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে **যুক্তি ও বিচারের সহিত নীতিশিক্ষা ও ধর্মোপদেশ** দেওয়ার ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন। কারণ এই ভাবপ্রবণ বয়সে উচ্চনীতিজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান জাগাইতে না পারিলে সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও তাহাদিগকে সুপথে রাখা কঠিন হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই বয়সে বালক-বালিকাদের শারীরিক ও মানসিক কর্মশক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এই সময় তাহাদের জন্য **যথেষ্ট শারীরিক ও মানসিক কাজের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।** উদার শিক্ষাদানের জন্য প্রায় সমস্ত স্কুলপাঠ্য বিষয় এই সময়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া **এই সময়ে তাহাদিগকে নাগরিক কর্তব্যও শিক্ষা দিতে হইবে।** উচ্চভাবপূর্ণ সাহিত্য শিক্ষাদানের এবং **নানা বিষয়ে প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা জাগাইবারও এই প্রশস্ত সময়।**

মানসিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে **যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রমেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে,** নানাপ্রকার নিয়মপূর্ণ, শ্রমসাধ্য প্রতিযোগিতামূলক খেলা

খেলিবার সুযোগ দিতে হইবে; তাহা ছাড়া নানাপ্রকার ব্যায়াম (Gymnastics) করিয়া এই সময়ে দেহ সুগঠিত না করিলে তাহাদের শারীরিক বিকাশ সম্পূর্ণ হইবে না।

এই বয়সেই **অধিকাংশ ছেলেকে জীবিকার্জনের জন্যও তৈরী করিতে হইবে।** ১৪ বৎসর পূর্ণ হইলেই যে-সকল ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত নহে তাহাদিগকে বিভিন্ন ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই বয়সের প্রবল যৌন-প্রবৃত্তি (Sex-instinct) সংযত করিবার জন্য তাহাদিগকে সর্বদা বয়স্ক আত্মীয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাখা প্রয়োজন, কখনও একা থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহা ছাড়া সর্বদা তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিতে হইবে ও কঠোর শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহারা কুসঙ্গে মিশিবার সুযোগ ও কুচিন্তায় মগ্ন হইবার অবসর পাইবে না। কেহ কেহ এই বয়সেই বালক-বালিকাদিগকে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কিন্তু খুব সতর্কতার সহিত এই বিষয়ে শিক্ষা দিতে না পারিলে ইহার দ্বারা যৌন-প্রবৃত্তি সংযত না হইয়া বরং বর্ধিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে অপরিণত বয়সে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার পরিণাম সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন করা একান্ত প্রয়োজন। একজন প্রবীণ চিকিৎসকের উপর এই বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার ভার দেওয়া যাইতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিশুর শ্রেণী-বিভাগ

ইহা বলা বাহুল্য যে সমবয়স্ক সকল শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সমান নহে। পূর্বে যে ক্রমবিকাশের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের গড়-পড়তা বিকাশ নির্দেশ করে মাত্র।

প্রকৃতি ও মেজাজ (Temperament) হিসাবে শিশুগণকে **বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।**

সাধারণতঃ **দুই প্রকৃতির শিশু** দেখা যায়; যথা—**দ্রুত প্রকৃতি** ও **ধীর প্রকৃতি। প্রথম শ্রেণীর শিশু** সহজে শিখে ও সহজে ভুলে, খুব চট্‌পটে এবং সজীব (Vivacious), কিন্তু বড়ই অস্থির-প্রকৃতি। এক সময়ে খুব প্রফুল্ল থাকে, পরক্ষণেই ভয়ানক বিমর্ষ হইয়া পড়ে; তাড়াতাড়ি বিচার ও সিদ্ধান্ত করিতে পারে, কিন্তু মোটেই অধ্যবসায়ী নহে; সহজেই ক্রোধান্ধ হয়, কিন্তু উদার প্রকৃতি বলিয়া সহজেই ভুলিয়া যায়। সহজে চিত্তাকর্ষণ করে ও জনপ্রিয় হয়, কিন্তু অস্থিরচিত্ততা ও উত্তেজনা-প্রবণতার জন্য শেষ পর্যন্ত জনপ্রিয়তা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহারা ভবিষ্যতের চিন্তায় বিভোর থাকে, বর্তমানের কথা মনে রাখিয়া হিসাব করিয়া কাজ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশু ধীরে শিখে, কিন্তু দেরীতে ভুলে; গম্ভীর, স্ফূর্তি-হীন, কিন্তু অনেকটা স্থিরচিত্ত, সহজে তাহাদের মেজাজ পরিবর্তিত হয় না;—অত্যন্ত ধীরে কিন্তু অনেকটা নির্ভুলভাবে বিচার ও সিদ্ধান্ত করে এবং দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে; সহজে রাগান্বিত হয় না, কিন্তু একবার রাগিলে সহজে শান্ত হয় না ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে। বর্তমান সম্বন্ধে খুব সচেতন থাকে এবং হিসাব করিয়া কাজ করে; সহজে চিত্তাকর্ষণ করে না ও জনপ্রিয় হয় না, কিন্তু পরিণামে বেশ প্রভাব বিস্তার করে।

মেজাজের তারতম্য-অনুসারে কেহ কেহ **শিশুগণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।** যথা,—

(১) **পিত্তবহুল বা উগ্র-প্রকৃতি** (Choleric)। ইহারা দ্রুত-প্রকৃতি, কিন্তু দৃঢ়চিত্ত; উদ্যমপূর্ণ ও আবেগপূর্ণ।

(২) **বিমর্ষ-প্রকৃতি** (Melancholic)। ইহারা ধীর-প্রকৃতি ও দৃঢ়চিত্ত, ভাবাবেগ-প্রবণ (Sentimental) ও আত্ম-পর্যবেক্ষণকারী (Introspective), ধীরে বিচার করে ও সিদ্ধান্ত করে।

(৩) **দৃঢ়-প্রত্যয়শীল-প্রকৃতি** (Sanguine)। ইহারা দৃঢ়চিত্ত, আগ্রহশীল, সহজে প্রভাবিত হয় ও সহজে পরিবর্তনশীল।

(৪) **শ্লেষ্মাপ্রধান বা মন্থর-প্রকৃতি** (Phlegmatic)। ইহারা ধীর ও দুর্বল-চিত্ত। খুব ধীরে কাজ করে কিন্তু ধরিয়া থাকে,—নাছোড়-বান্দা।

বুদ্ধিবৃত্তির দিক্ হইতে মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ শিশুকে আরও কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যথা, কেহ **স্থিতিশীল** (Static)—যে-কোন কাজে ধরিয়া থাকে। কেহ **গতিশীল** (Dynamic)—উদ্যমপরায়ণ কিন্তু বেশীক্ষণ এক কাজে ধরিয়া থাকিতে পারে না। কেহ সূক্ষ্মদর্শী (Intensive), কেহ বিস্তার-দর্শী (Distributive)। কেহ বেশী কল্পনাশীল, কেহ বিচারশীল, কেহ অন্তর্দর্শী (Subjective), কেহ বহির্দর্শী (Objective) ইত্যাদি।

সকল ছেলে সম্পূর্ণভাবে উপরি-উক্ত কোন বিভাগের অন্তর্গত না হইলেও উপরি-উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুর প্রকৃতি বা মেজাজের সহিত তুলনা করিয়া শিশুগণের ঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করা সহজ হয়।

References

1. Raymont—Principles of Education, Chap. V.
2. Kirkpatric—Fundamentals of Child Study, Chap. VI.
3. খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ—শিক্ষা-বিজ্ঞান।
4. Margaret Wooster Curtl—Child Psychology, Chap, II
5. Dumville— Child Mind, Chap. VIII.

দ্বিতীয় ভাগ

বিদ্যালয়-পরিচালনা ও শ্রেণী-পাঠনা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষক

(**শিক্ষাদান-কার্যে শিশুর পরেই শিক্ষকের স্থান**)। এই পর্যন্ত কেবল শিশু সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছে। এইক্ষণে **সুশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা** ও **গুণাবলী** আলোচনা করা হইবে।

শিশু এই পৃথিবীতে নূতন আগন্তুক। সুতরাং সে তাহার পরিবেষ্টনীর জ্ঞানলাভের জন্য ব্যগ্র। অপরদিকে জ্ঞান অনন্ত, এই **বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানের ভাণ্ডার**। কিন্তু শিশুর চারিদিকে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার সজ্জিত থাকিলেও তাহার দ্বার যেন অর্গলবদ্ধ। অন্যের সাহায্য ব্যতীত সে এই জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে না ও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। কারণ **অন্য পশু-শাবকের ন্যায় মানব-শিশু জন্মের পরই আপনার পায়ে দাঁড়াইতে পারে না** এবং আত্ম-চেষ্টায় জীবনধারণ করিতে পারে না। অপর দিকে **অন্য পশু-শাবক হইতে তাহার অধিকতর বিকাশ বা উন্নতি সম্ভবপর**। সুতরাং শৈশবে তাহাকে যত্নের সহিত লালন-পালনের জন্য ও তাহার সর্বতোমুখী বিকাশ-সাধনের জন্য সুদক্ষ পরিচালকের প্রয়োজন। এই গুরুতর কাজের দায়িত্ব স্বভাবতঃই তাহার মাতাপিতার উপরই ন্যস্ত হওয়া উচিত। তাই মনীষী রুশো বলিয়াছেন, **পিতাকেই শিক্ষক হইতে হইবে**। অনেক সময় পিতামাতার প্রয়োজনীয় অবসর বা যোগ্যতা থাকে না বলিয়া **শিক্ষকের উপরেই এই গুরুতর দায়িত্বভার অর্পিত হয়**। কিন্তু বিশেষ কোন গুণের অধিকারী না হইয়া এবং বিশেষভাবে প্রস্তুত না হইয়া সকলেই কি শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত? শিক্ষার অর্থ ও লক্ষ্য এবং শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে **শিক্ষাদান অত্যন্ত জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য**। ইহা একটা অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ (Highly Technical) কার্য। ঠিকভাবে শিক্ষাদানের উপর শিশুর বিকাশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বস্তুতঃ **শিক্ষকই**

শিশুর ভবিষ্যৎ প্রস্তুত করিতেও পারে, ধ্বংস করিতেও পারে। সুতরাং নিপুণতার সহিত এরূপ জটিল, গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলপূর্ণ কার্য সম্পাদনের জন্য খুব সুদক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন। তাই সুশিক্ষক হওয়ার জন্য কি কি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন তাহাই এস্থলে আলোচনা করা হইবে।

সুশিক্ষকের গুণাবলী

Mr. Percival Wren অতি সুন্দর ভাষায় আদর্শ শিক্ষকের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, **"শিক্ষক কেবল খবরের উৎস বা ভাণ্ডার নহেন; কিংবা শিশুকে প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার খবর সরবরাহকারী নহেন; শিক্ষক শিশুর বন্ধু, পরিচালক ও বিজ্ঞ উপদেষ্টা; তিনি তাহার সুদক্ষ শরীর গঠনকারী, মনের বিকাশ সাধনকারী ও চরিত্র গঠনকারী।"**

সুশিক্ষকের **গুণাবলীকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়।** যথা, **স্বাভাবিক গুণাবলী ও অর্জিত গুণাবলী।**

স্বাভাবিক গুণাবলী। যে-কেহ সুশিক্ষক হইতে ইচ্ছা করেন **তাহার শরীর সুস্থ, সবল ও কষ্টসহিষ্ণু** হইতে হইবে এবং তাঁহাকে উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী হইতে হইবে। তাহা না হইলে তিনি উদ্যম সহকারে কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না। শিক্ষক অলস বা দুর্বল হইলে তাঁহার প্রদত্ত পাঠ জীবন্ত (lively) ও ফলপ্রসূ (effective) হয় না। **তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রখর স্মৃতিশক্তি, প্রবল কল্পনাশক্তি, উচ্চ বিচারশক্তি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকিতে** হইবে। ছাত্রদের হইতে তিনি অধিকতর বুদ্ধিমান না হইলে বা তিনি কথায় কথায় ভুল করিলে তাহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার চোখে দেখিবে না। যে-কোন জটিল প্রশ্নের নিজে বিচার করিয়া দ্রুত সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলে তিনি ছাত্রদের পরিচালিত করিতে পারিবেন না।

তাঁহার অফুরন্ত ধৈর্য থাকিতে হইবে এবং তাঁহার মেজাজ শান্ত হইতে হইবে। নতুবা তিনি শিশুগণের স্বাভাবিক চঞ্চলতা ও অক্ষমতা উপেক্ষা করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত তাহাদের বিকাশসাধনে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

সরল, অমায়িক, প্রফুল্লচিত্ত ও সহানুভূতিসম্পন্ন না হইলে তিনি শিশুর হৃদয় জয় করিতে পারিবেন না। তাঁহার শিশুর অন্তঃকরণ থাকিতে হইবে এবং শিশুকে ভালবাসিতে হইবে। নিজ বাল্যজীবনের কথা স্মরণ করিয়া তাহার সাহায্যেই তাঁহাকে শিশুর মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং আন্তরিক সহানুভূতির সহিত তাহাকে পরিচালিত করিতে হইবে। তাঁহার বাল্যের চঞ্চলতার কথা ভাবিয়া দেখিলে তিনি শিশুর চঞ্চলতা স্বাভাবিক বলিয়া বুঝিতে পারিবেন।

তাঁহার সমস্ত মুদ্রাদোষ পরিহার করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, শিশু খুব অনুকরণপ্রিয় ও কঠোর সমালোচক। প্রত্যেক কথা বলিতে তিনি যদি কোন শব্দ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করেন বা কোন হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী করেন তাহা হইলে শিশুগণ তাহার অনুকরণ করিবে ও তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে উৎসাহিত হইবে।

তাঁহার ভাল বর্ণনা দেওয়ার শক্তি বা বাগ্মিতা থাকা প্রয়োজন। তাঁহার উচ্চারণ বিশুদ্ধ, এবং স্বর সুস্পষ্ট, মিষ্ট ও প্রয়োজনমত উচ্চ হইতে হইবে।

তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কিছু মৌলিকতা থাকিতে হইবে। কারণ তাঁহাকে শ্রেণীতে বসিয়াই অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং অবস্থোপযোগী কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

তাঁহার আত্মবিশ্বাস না থাকিলে তিনি তাঁহার শক্তি ও জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন না, এবং ছাত্রেরা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতে চাহিবে না।

শিক্ষক মাত্রেরই কিছু রসজ্ঞান (Humour) **থাকা প্রয়োজন।** তাহা না থাকিলে তাঁহার প্রদত্ত পাঠ সরস ও চিত্তাকর্ষক হইবে না। খুব গুরুতর বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময়ও মধ্যে মধ্যে রহস্যজনক মন্তব্য করিয়া ছাত্রগণকে হাসিবার সুযোগ দিলে তাহাদের উপর যে কাজের চাপ পড়ে তাহা কিছু হাল্কা বোধ হইবে। কিন্তু ইহা দেখিতে হইবে যে তাহারা যেন **শিক্ষকের সঙ্গে হাসে, শিক্ষকের প্রতি না হাসে।**

শিক্ষক **উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ়চিত্ত** না হইলে চঞ্চলমতি শিশুগণকে নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন না। তাঁহার ব্যক্তিত্বের অভাব বা ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কিছুমাত্র প্রমাণ পাইলেই ছাত্রগণ তাঁহার কর্তৃত্ব উপেক্ষা করিতে ও তাঁহার অবাধ্য হইতে সাহসী হইবে। তিনি আন্তরিক সহানুভূতির সহিত ছাত্রদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিবেন ; কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত করিয়া কোন আদেশ দিলে দৃঢ়তার সহিত ছাত্রগণকে তদনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য করিবেন।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার **কর্মচতুরতা (Tact) না থাকিলে তিনি নির্বিবাদে ছাত্রদের চালাইতে পারিবেন** না বা বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে পারিবেন না। এস্থলে বলা প্রয়োজন যে কর্মচতুরতা সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে বা অনেকে ইহার অপব্যবহার করেন। সমস্ত অবস্থা ভালরূপে বিচার করিয়া এবং প্রত্যেক কাজের ফলাফল চিন্তা করিয়া, তৎপরতা ও সতর্কতার সহিত অবস্থার উপযোগী উপায় নির্ধারণ করা এবং দৃঢ়তার সহিত তদনুযায়ী কাজ করাকেই কর্মকৌশল বা কর্মচতুরতা বলে। বস্তুতঃ যতদূর সম্ভব সংঘর্ষ এড়াইয়া কর্তব্য করাই কর্ম-চতুরতা। কিন্তু সংঘর্ষের ভয়ে কর্তব্য অবহেলা করাকে কোনমতে কর্ম-চতুরতা বলা যায় না।

সর্বোপরি শিক্ষককে চরিত্রবান্ হইতে হইবে। সত্যবাদী, অকপট-চিত্ত, ন্যায়পরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ ও সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য না হইলে শিক্ষক ছাত্রের শ্রদ্ধালাভ করিতে পারিবেন না। মুখে যাহা উপদেশ দেন নিজে কার্যতঃ তাহার অনুসরণ না করিলে ছাত্রের নিকট তাঁহার উপদেশের কোন মূল্য থাকিবে না। তাঁহার নিকট সর্বদা সুবিচার পাইবে বলিয়া বিশ্বাস না থাকিলে ছাত্রগণ অন্তরের সহিত তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে না।

অর্জিত গুণাবলী

(১) উচ্চশিক্ষা—শিক্ষক মাত্রেরই যতদূর সম্ভব উচ্চশিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন। কারণ অনেক সময় একটি ছোট শিশুকে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্যও সেই বিষয়ের অতি উচ্চ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কেবল

পাঠ্যপুস্তকের পুনরাবৃত্তি করিলে পাঠ চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হয় না। পাঠ্য বিষয়ের উপর শিক্ষকের যথেষ্ট অধিকার না থাকিলে তিনি তাহা ঠিকভাবে ছাত্রের সামনে উপস্থিত করিতে পারেন না। অপর দিকে যে বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে কেবল সেই বিষয়ের উচ্চজ্ঞানই সুশিক্ষা দানের জন্য যথেষ্ট নহে। কেননা, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এক বিষয় ভালরূপে শিক্ষা দিতে হইলে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অনেক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সুতরাং **সুশিক্ষক হইতে হইলে তিনি যে যে বিষয় শিক্ষা দেন, সে-সকল বিষয়ে তাঁহার উচ্চজ্ঞান এবং অন্যান্য স্কুলপাঠ্য বিষয়ে তাঁহার সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার।**

(২) কতিপয় বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে শিক্ষার সহিত মনোবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সুতরাং সুশিক্ষা দানের জন্য **মনোবিজ্ঞানের** জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। **শিশু-মনোবিজ্ঞানের** সহিত সুপরিচিত না হইয়া শিশুকে ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া কঠিন। ইহা ছাড়া শারীরিক শিক্ষাদানের জন্য **স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান** (Hygiene) ও **শরীর-তত্ত্বের** (Physiology) জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নৈতিক শিক্ষাদানের জন্য **নীতি-বিজ্ঞানের** সহিত সুপরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেরূপ **সমাজ-বিজ্ঞান** ও **রাষ্ট্র-বিজ্ঞান** সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া কেহ নাগরিক-শিক্ষা দিতে পারে না। অবশ্য একই শিক্ষককে এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে না। **তিনি যে বিষয় শিক্ষা দেন তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের বা বিষয়গুলির প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকিলেই হইবে। তবে সকল শিক্ষককে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত হইতে হইবে।**

(৩) শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালীর কার্যতঃ জ্ঞানলাভ (Training of Teachers)।

কোন বিষয়ের উচ্চজ্ঞান থাকিলেই যে সে-বিষয় ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা নহে। কি প্রণালীতে ও আকারে শিক্ষা দিলে তাহা ছাত্রের সম্পূর্ণ বোধগম্য হইবে এবং তাহার দ্বারা ছাত্রের মানসিক বিকাশের ও চরিত্রগঠনের সাহায্য হইবে তাহা অবগত না থাকিলে অতি উচ্চস্থান লইয়াও কোন বিষয়

ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ শিক্ষা বলিতে কি বুঝায়, তাহার সুচিন্তিত মূলসূত্রগুলি কি কি, এবং পূর্বের কৃতবিদ্য শিক্ষকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গভীর গবেষণার ফলে কি কি শিক্ষাদান-কৌশল বা শিক্ষাদান-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া কাহারও শিক্ষাদান-কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। ট্রেনিং স্কুল বা কলেজেই এই সকল বিষয় কার্যতঃ শিক্ষা দেওয়া হয়; সুতরাং সকল শিক্ষকের পক্ষে ট্রেনিং পাওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনেকে মনে করে যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে এবং শিক্ষকের স্বাভাবিক গুণগুলির অধিকারী হইলে যে কেহ স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষাদানের কৌশলগুলি আয়ত্ত করিতে পারে। তাই তাহারা অভিজ্ঞ শিক্ষককে ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ, (১) সকল শিক্ষকের উদ্ভাবনী-শক্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং সকলেই স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রকৃষ্ট শিক্ষাদান-কৌশল উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবে না। (২) খুব প্রতিভাবান এবং উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকও অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবনের পূর্বে বহু ভুল করিতে পারেন এবং তাহার ফলে শিশুর অপূরণীয় ক্ষতি হইতে পারে। (৩) পূর্বের কৃতবিদ্য শিক্ষকদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গভীর গবেষণার ফলে যে-সকল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বা কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেগুলি পুনঃ আবিষ্কারের চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। (৪) যদি ভুল পন্থার অনুসরণ করিয়া কেহ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জন করে তবে তাহার সেই অভিজ্ঞতার মূল্য কি?

(৫) ট্রেনিং স্কুল বা কলেজে শিক্ষার মূলসূত্রগুলিও পূর্বের উদ্ভাবিত শিক্ষাদান-কৌশল বা শিক্ষাদান-প্রণালীর জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সেগুলি কার্যতঃ প্রয়োগ করিয়া শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা হয়। সুতরাং ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক পূর্বের কৃতবিদ্য শিক্ষকগণের অভিজ্ঞতার ফলভোগ করিতে পারেন, এবং প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে নিজেও অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

(৬) ট্রেনিং পাওয়ার ফলে প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন শিক্ষকও অল্পায়াসেই শিক্ষাদান-কার্যে পারদর্শী হইতে পারেন এবং পূর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষাদানের শক্তিলাভ করিতে পারেন। সুতরাং কি প্রতিভাশালী শিক্ষক, কি সাধারণ শিক্ষক, সকলেই ট্রেনিং দ্বারা উপকৃত হইবেন এবং পূর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষক হইবেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, হাতুড়ে চিকিৎসক হইতে চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে বা কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে অভিজ্ঞ শিক্ষক হইতে ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ। অবশ্য অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মধ্যেও যে খুব ভাল শিক্ষক থাকিতে পারেন না তাহা নহে। কিন্তু ট্রেনিং-প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা নিশ্চয় আরও বেশী সফলতা অর্জন করিতে পারিতেন।

যদি কাহারও পক্ষে ট্রেনিং পাওয়ার সুযোগ না ঘটে তবে তিনি অন্ততঃ ভাল পুস্তক পড়িয়া শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালীর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন এবং কার্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিয়া শিক্ষাদানের কৌশলগুলি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। ইহাও না করিয়া শিক্ষাদান-কার্যে ব্রতী হওয়া একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। কেননা তাঁহার অজ্ঞতা ও ভুলত্রুটির জন্য শিশুর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে এবং তাহার ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে পারে।

(৪) **অধ্যয়নের অভ্যাস**। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোন বিষয় ভালরূপে শিক্ষাদানের জন্য সেই বিষয়ের জ্ঞান এবং তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অনেক বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান থাকিতে হইবে। ইহা ছাড়া সুশিক্ষককে মনোবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রভৃতির সহিতও সুপরিচিত হইতে হইবে। ছাত্র-জীবনে এতগুলি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করিয়া শিক্ষকতা ব্যবসায় অবলম্বন করার সৌভাগ্য খুব কম শিক্ষকের হয়। কিন্তু সুশিক্ষাদানের জন্য আন্তরিক আগ্রহ থাকিলে সকলেই ছাত্রজীবনের পরও নিজ চেষ্টায় সেই সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা-জীবন শেষ হয় না, তখনই তাহার বৃহত্তর শিক্ষা-জীবন আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ সুশিক্ষককে আজীবনই ছাত্র থাকিতে

হয়। কারণ জ্ঞান কখনই চরম সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। দিনের পর দিন জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে। জ্ঞানের এই ক্রমবিস্তারের সহিত পা মিলাইয়া চলিতে না শিখিলে শিক্ষককে পিছাইয়া পড়িতে হইবে এবং সম্পূর্ণ বর্তমান আকারে জ্ঞানদানের যোগ্যতা হারাইতে হইবে।

(৫) সুশাসনের ক্ষমতা। সুশাসক মাত্রেই সুশিক্ষক না হইলেও সকল সুশিক্ষককেই সুশাসক হইতে হয়। ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষা না করিয়া সুশিক্ষা দান করা কিছুতেই সম্ভব নহে। শিক্ষক যতই বিদ্বান হউন বা শিক্ষাদান-কার্যে তাঁহার যতই আগ্রহ থাকুক, শ্রেণীতে সুশাসন বজায় রাখিতে না পারিলে তাঁহার প্রদত্ত পাঠ ফলপ্রসূ হইতে পারে না, এমন কি তাঁহার পক্ষে পাঠ দেওয়াও সম্ভব হয় না। সুতরাং সুশিক্ষক মাত্রেরই সুশাসক হওয়া প্রয়োজন। সুশিক্ষকের ন্যায় সুশাসককেও অনেক স্বাভাবিক ও অর্জিত গুণের অধিকারী হইতে হয়। (সুশাসনের অধ্যায়ে তাহার আলোচনা হইবে)

(৬) শিক্ষাদান-কার্যে আন্তরিক আগ্রহ। সর্বোপরি শিক্ষাদান-কার্যে আন্তরিক আগ্রহ না থাকিলে কেহই সুশিক্ষক হইতে পারেন না। শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাব হইলে শিক্ষাদান-কার্য জীবনহীন যন্ত্রের কাজের আকার ধারণ করে, এবং জীবনহীন শিক্ষাদান কখনই চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না। ইহাছাড়া ফলপ্রসূ শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষককে নিজে চিন্তা করিয়া অবস্থোপযোগী নূতন নূতন উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু শিক্ষাদান-কার্যে আন্তরিক আগ্রহ না থাকিলে তিনি তাহা করিতে পারেন না। সুশিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক গুণাবলীর আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে এইরূপ সর্বগুণ-সম্পন্ন শিক্ষক খুব বিরল। কিন্তু সকলেই আন্তরিক আগ্রহ ও উদ্যম সহকারে শিক্ষাদান-কার্যে ব্রতী হইতে পারেন। আগ্রহ সহকারে শিক্ষাদান-কার্যে প্রবৃত্ত হইলে অনেক স্বাভাবিক গুণের বিকাশ পাইবে এবং যে-সকল গুণলাভে তিনি বঞ্চিত তাহাদের অভাব অনেকটা পূরণ করাও সম্ভব হইবে। কেননা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং অবস্থোপযোগী হওয়ার ক্ষমতা অনেকটা সীমা-হীন। কিন্তু আন্তরিকতার অভাব হইলে

সমস্ত স্বাভাবিক ও অর্জিত গুণের অধিকারী হইয়াও কেহই সুশিক্ষক হইতে পারে না। সুতরাং সুশিক্ষক হইতে হইলে শিশুকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে হইবে, তাহার বিকাশ-সাধনের জন্য আন্তরিক আগ্রহ থাকিতে হইবে, শিক্ষাদান-কার্যে আনন্দ পাইতে হইবে এবং তাহাকে সম্মানের চোখে দেখিতে হইবে ; ইহাকে কেবল জীবিকার্জনের একটা উপায় মনে না করিয়া দেশসেবা বা মানবজাতির সেবা বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং শিশুর বিকাশ সাধন করিয়া যে স্বর্গীয় আনন্দ বা সন্তোষ উপভোগ করা যায় তাহাকেই শিক্ষকের সর্বাপেক্ষা বড় পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষক জন্মগ্রহণ করে, না তৈয়ার হয় ?
(Are teachers born or made ?)

সুশিক্ষক হওয়ার জন্য অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণের প্রয়োজন হয় বলিয়া অনেকের মত যে কবির ন্যায় শিক্ষক জন্ম গ্রহণ করেন, শিক্ষককে তৈয়ার করা যায় না (Teachers like poets are born, not made)। এই উক্তির মধ্যে যে কিছু সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে-সকল লোক সুশিক্ষকের অধিকাংশ স্বাভাবিক গুণাবলীর অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা শিক্ষক হইয়াই জন্মিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে খুব বেশী লোক শিক্ষকের সমস্ত স্বাভাবিক গুণের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। অল্প কয়েকজন কবি জন্মিলেই পৃথিবীর অভাব মিটিতে পারে, কিন্তু মানবজাতির শিক্ষার জন্য অগণিত শিক্ষকের প্রয়োজন। সুতরাং যাঁহারা ঠিক শিক্ষক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই তাঁহাদিগকেও অনেক সময় শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করিতে হয়। অপরদিকে মানবের অপরিস্ফুট স্বাভাবিক শক্তি (Undeveloped Natural Potentialities) এবং অবস্থোপযোগী হওয়ার ক্ষমতা (Adaptability) অনেকটা সীমাহীন বলা যায়। এমন কোন মানুষ নাই যাহার মধ্যে কোন স্বাভাবিক গুণ বা প্রবৃত্তি একেবারে নাই বলা যায়। সুতরাং ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্যম থাকিলে অনেকেই প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক গুণাবলীর যথাসম্ভব বিকাশ-সাধন করিয়া বা অন্য গুণের দ্বারা তাহাদের অভাব

যতটা সম্ভব পূরণ করিয়া নিজেদের শিক্ষকতা কাজের উপযোগী করিয়া লইতে পারে। ইহা ছাড়া কেবল স্বাভাবিক গুণাবলী থাকিলেই কেহ সুশিক্ষক হইতে পারে না। তাহার জন্য অনেক অর্জিত গুণেরও প্রয়োজন হয়। শিক্ষকেরা সমস্ত স্বাভাবিক গুণের অধিকারী হইলেও অনেক বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকিলে কেহই সুশিক্ষক হইতে পারে না। সুতরাং শিক্ষক জন্মগ্রহণও করে এবং তৈয়ারও হয় বলিলেই সত্য কথা বলা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা-ব্যবসায়ের আকর্ষণ

সুশিক্ষকের গুণাবলী আলোচনার সময় শিক্ষকের নিকট হইতে অনেক কঠিন দাবী করা হইয়াছে। ইহা পড়িয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শিক্ষা-ব্যবসায়ের এমন কি আকর্ষণ বা সুবিধা আছে যে যাহার লোভে লোকে এতগুলি কঠিন সর্ত পূরণ করিয়া শিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য লালায়িত হইবে। তাই এ-স্থলে শিক্ষাব্যবসায়ের আকর্ষণ বা সুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) সদ্ভাবে এবং অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার করিয়া জীবিকা অর্জনের উপায়। ইহা সত্য যে শিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জন করা যায় না। কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে শিক্ষকের আয়ের তারতম্য হইলেও সকল দেশেই যথেষ্ট শিক্ষিত লোক শিক্ষা-ব্যবসায়ের সাহায্যে জীবিকার্জন করেন। অবশ্য ইহা দ্বারা শিক্ষা-ব্যবসায়ের কোন বিশেষ সুবিধা প্রতিপাদিত হয় না। কেননা, পৃথিবীতে সকল লোকই কোন না কোন উপায়ে জীবিকার্জন করে, তবে সকলে সদুপায়ে জীবিকার্জন করে না। সৎপথে থাকিয়া সকল ব্যবসায়ে উন্নতি করা অনেকে সময় সম্ভব হয় না। শিক্ষা-ব্যবসায়ের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে কৃতকার্যতা লাভের জন্য ন্যায় ও সত্যের পথ হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই

ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সাংসারিক হট্টগোল, কপটতা, কুটিলতা, মিথ্যা, অসদাচার প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিয়া জীবিকার্জন করা সম্ভব হয় এবং সরল, উন্নত ও মহৎ জীবনযাপনের সুযোগ পাওয়া যায়। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ইহা কম সুবিধা নহে। কারণ সৎপ্রবৃত্তি নাই বা সদ্ভাবে জীবনযাপনের কিছুমাত্র আগ্রহ হয় না এরূপ মানুষের সংখ্যা খুব কম। যাহারা জীবনযাত্রায় অসৎ পথের পথিক হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই প্রথমে অবস্থার প্রভাবে বা অভাবের তাড়নায় অসৎমার্গে পা দিয়াছিল। সুতরাং কেবলমাত্র এই একটা সুবিধার জন্যও শিক্ষা-ব্যবসায় বিভিন্ন ব্যবসায়ের মধ্যে উচ্চ স্থান দাবী করিতে পারে।

অপর দিকে জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতে না পারিলে জ্ঞানার্জনের সার্থকতাই থাকে না। এমন অনেক ব্যবসায় আছে যাহার সাহায্যে প্রভূত অর্থোপার্জন করা সম্ভব হয়, কিন্তু যে-সকল ব্যবসায়ে জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করা যায় তাহাদের সংখ্যা খুব কম এবং শিক্ষা-ব্যবসায় তাহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দাবী করিতে পারে। বস্তুতঃ জ্ঞানদানের ন্যায় জ্ঞানের সদ্ব্যবহার আর কিছুই হইতে পারে না এবং একমাত্র শিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বন করিলেই জ্ঞানের এই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়।

(২) জীবিকার্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবা ও মানবজাতির সেবার সুযোগ। সদ্ভাবে এবং জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিয়া জীবিকার্জনের সুযোগ পাওয়াই শিক্ষা-ব্যবসায়ের একমাত্র সুবিধা নহে। ইহার আর একটা বড় সুবিধা এই যে, এই ব্যবসায় অবলম্বন করিলে জীবিকার্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবা বা মানবজাতির সেবা করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। মানুষ কেবল উদর পূরণ করিয়া বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা মিটাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহা হইলে সে পশু হইতে উচ্চস্থান দাবী করিতে পারিত না। প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে তাহাকে যে কেবল উচ্চতর মহত্তর জীবনযাপন করিতে হইবে তাহা নহে, নিজ শক্তিমত দেশের ও জাতির উন্নতিসাধনেও যত্নবান হইতে হইবে। যদি তাহার নিজ চেষ্টার ফলে তাহার জন্মের সময় হইতে মৃত্যুর সময়ে নিজ সমাজকে উন্নততর দেখিয়া যাইতে পারে, তবেই তাহার জীবনধারণ সার্থক

হইয়াছে বলা যায়। বস্তুতঃ প্রত্যেক মানবেরই নিজ দেশ ও মানব-জাতির প্রতি একটা উচ্চতর, মহত্তর কর্তব্য আছে। কিন্তু দেশের সেবায় বা মানব-জাতির সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ ও শক্তি সকলের থাকে না। তবে স্বীয় জীবিকার্জনের জন্য যদি এমন কোন ব্যবসায় অবলম্বন করা সম্ভব হয় যাহার সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও মানবজাতির সেবা করা যায়, সে-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে কাহার না আগ্রহ হয়? বস্তুতঃ কেবল জীবিকার্জন বা অর্থাগমের সুযোগ-লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া, তাহার ব্যবসায়ের দ্বারা দেশের বা মানবজাতির কতদূর উপকার সাধিত হইতে পারে তাহাও বিচার করিয়া প্রকৃত মানুষের স্বীয় ব্যবসায় নির্বাচন করা উচিত।

ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না যে, সুশিক্ষাদানের ন্যায় দেশের বা মানবজাতির মঙ্গলজনক কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। মানব-শিশু জন্ম-মুহূর্তে পশু-শাবকের প্রায় সমস্থানীয়। অশিক্ষিত বর্বর মানুষ ও পশুর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। শিক্ষাপ্রভাবেই তাহার সর্বতোমুখী বিকাশ হয়, তাহার উচ্চ ও মহৎ বৃত্তিগুলি কার্যকরী হয় এবং সে মনুষ্য নামের যোগ্য হয়। অপরদিকে শিক্ষককে জাতি-গঠনকারী নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুতঃ শিক্ষকই শিক্ষা-ছাঁচে ফেলিয়া শিশু-ইষ্টকগুলিকে প্রয়োজনমত আকার দেন, শিক্ষা-আগুনে দগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে শক্ত ও কার্যক্ষম করেন এবং শিক্ষা-সুরকির সাহায্যে তাহাদিগকে গাঁথিয়া জাতীয়-প্রাসাদ নির্মাণ করেন। বর্তমান সময়ে যে-সমস্ত জাতি সভ্যতা ও সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছে তাহাদের জাতীয়-ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সেই সমস্ত জাতির গঠনকার্যে শিক্ষার দানই সর্বাপেক্ষা বেশী। বস্তুতঃ শিক্ষা ব্যতীত মানব-জাতির বর্তমান উন্নতি বা সভ্যতা কিছুতেই সম্ভব হইত না। যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দেশের ও মানবজাতির এবম্বিধ মঙ্গল সাধন করা সম্ভব হয় তাহার স্থান কত উচ্চে সহজেই অনুমেয়।

(৩) **দীর্ঘ অবকাশ**। দীর্ঘ অবকাশ-লাভ শিক্ষা-ব্যবসায়ের আর একটি বড় সুবিধা। একজন মনীষী বলিয়াছেন, "জীবিকার্জনের জন্য কে কি কাজ করে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই; অবসর সময় সে কিভাবে

ব্যয় করে তাহা জানিলেই তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে। বস্তুতঃ শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে স্থায়ী দান করিয়া যাঁহারা এই পৃথিবীতে অমর-কীর্তি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে অবসর সময়েই স্বনির্বাচিত বিশেষ বিষয়ের চর্চা করিতেন। ইংলণ্ডের অমর কবি স্যার ওয়াল্টার স্কট এক অফিসে কেরানীর কাজ করিতেন। বৈজ্ঞানিক-প্রবর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীন রাজনীতি-ক্ষেত্রেই নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের এই বঙ্গদেশের সুযোগ্য সন্তান কবিবর নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল অবসর সময়েই সাহিত্যচর্চা করিয়া বঙ্গ-বাণীর মন্দিরে তাঁহাদের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং জীবিকার্জন করিয়া দীর্ঘ অবকাশলাভের সুযোগ পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে এবং যেই ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক অবকাশভোগের সুযোগ পাওয়া যায় তাহার আকর্ষণ কম নহে। তবে শিক্ষকগণ যদি তাঁহাদের দীর্ঘ অবকাশের সদ্ব্যবহার না করেন তাহার জন্য তাঁহারাই নিন্দার্হ, শিক্ষা-ব্যবসায় তাহার জন্য দায়ী নহে।

(৪) **শিক্ষকের সম্মান**। প্রত্যেক লোকের কাজের মূল্য এবং তাহার দায়িত্বের পরিমাণ হিসাবে সমাজে তাহার স্থান নির্ধারিত হয়, অন্ততঃ হওয়া উচিত। শিক্ষকের কাজ মানুষ তৈয়ার করা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, একমাত্র শিক্ষা-প্রভাবেই মানব-শিশু মনুষ্য নামের যোগ্য হয়। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, শিক্ষকই প্রকৃত জাতিগঠন করেন। সুতরাং শিক্ষকের কাজের মূল্য সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। অপরদিকে, শিক্ষকের কাজের মূল্য যেমন বেশী, তাঁহার দায়িত্বও সেইরূপ বেশী। অন্য পশুশাবক হইতে মানব-শিশুর স্বাতন্ত্র্য এই যে, তাহার মধ্যে পশুভাব ও দেবভাব সম-পরিমাণে বর্তমান। সুশিক্ষার প্রভাবে নীচ-বৃত্তিচয় সংযত হইয়া উচ্চ-বৃত্তিচয় সুবিকশিত হইলে মানব-শিশু দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সুশিক্ষার অভাবে বা কুশিক্ষার প্রভাবে নীচ-বৃত্তিচয় প্রাধান্যলাভ করিলে মানুষ হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও হীন এবং ভয়ঙ্কর হইতে পারে। সুতরাং শিক্ষকই শিক্ষার সাহায্যে মানব-শিশুকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, অন্যথায় সে পশুর

স্তরে নামিয়া যাইতে পারে। যে-সকল শিশু-ইষ্টকের দ্বারা জাতীয়-প্রাসাদ নির্মিত হয় শিক্ষকের ভুলে বা অবহেলায় যদি তাহারা কাঁচা থাকে, অথবা সুগঠিত না হয়, তবে তাহাদের দ্বারা সুদৃঢ় জাতীয়-প্রাসাদ নির্মাণ কিরূপে সম্ভব হইবে? সুতরাং শিক্ষাদান কাজ হইতে অধিক মূল্যবান্ বা দায়িত্বজনক কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। কাজের মূল্য এবং দায়িত্ব হিসাবে সমাজে প্রত্যেকের স্থান নির্ধারিত হইলে শিক্ষক হইতে উচ্চতর স্থান কেহ দাবী করিতে পারে না। তাই প্রাচীনকাল হইতে শিক্ষক সকলের নিকট শ্রেষ্ঠতম সম্মানলাভ করিয়া আসিতেছেন।

(অবশ্য বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে শিক্ষক তাঁহার ন্যায্য সম্মান পান না। ইহার জন্য শিক্ষক এবং সমাজ উভয়েই দায়ী। কারণ একদিকে আমরা, শিক্ষকগণ, আমাদের গুরুতর দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখিয়া কর্তব্য-সম্পাদনে ব্রতী হই না। অপরদিকে, আমাদের সমাজেরও চরম অবনতি হওয়ায় সমাজ শিক্ষার ন্যায্য মূল্য দিতে এবং শিক্ষকের উপযুক্ত সম্মান করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু শিক্ষকের উপযুক্ত সম্মান করিতে অস্বীকার করিয়া সমাজ শিক্ষক হইতে নিজেকেই বেশী অপমান করিতেছে। কারণ যে-সমাজ যত বেশী শিক্ষিত ও সুসভ্য, সেই সমাজ শিক্ষার তত বেশী আদর করে এবং শিক্ষকের তত বেশী সম্মান করে। সুতরাং শিক্ষার আদর এবং শিক্ষকের সম্মানের মাপ-কাঠিতেও সমাজের শিক্ষা ও সভ্যতার বিচার করা যায়।)

(৫) **শিক্ষকের গৌরব**। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যে শিক্ষকের গৌরব করিবার কিছুই নাই। তাঁহার না আছে প্রভূত অর্থ, না আছে দোর্দণ্ড ক্ষমতা, না আছে উচ্চ পদ-মর্যাদা। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, অন্য কাহারও চেয়ে শিক্ষকের গৌরবের বস্তু বা দাবী অধিক বই কম নহে। প্রথমতঃ তাঁহার নিজ কাজই তাঁহাকে অতুল গৌরব-মণ্ডিত করিতে পারে। পূর্বেই দেখান গিয়াছে যে, শিক্ষকই প্রকৃত মানুষ তৈয়ার করেন এবং জাতিগঠনকারী বলিয়া দাবী করিতে পারেন। মানুষ-তৈয়ারকারী বা জাতিগঠনকারী নামে অভিহিত হওয়ার চেয়ে উচ্চতর গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ, এই পৃথিবীতে যাঁহারা স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে বা অসাধারণ প্রতিভায় মানবজাতির নেতৃস্থান অধিকার করিয়া নিজ যশঃ-সৌরভে সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই জীবন-প্রভাতে এই দরিদ্র শিক্ষকের নিকট সর্বপ্রথম জ্ঞানের আলোক পাইয়াছিলেন। এই শিক্ষকেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রভিভার সম্যক্ বিকাশ হওয়ায় তাঁহারা আসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইয়া মানব-সমাজে অপ্রতিহত ক্ষমতা বা অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরিষ্টোটল, প্লেটো, নিউটন, নেপোলিয়ন, সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ, জগদীশচন্দ্রের গুরু বলিয়া দাবী করিতে পারা কি কম গৌরবের কথা? ক্ষুদ্র বৃক্ষশিশু যখন কালক্রমে বিশালকায় মহীরুহে পরিণত হইয়া তাহার কুসুম-সৌরভে দিগন্ত প্রফুল্লিত করে, তাহার সুস্বাদু ফলে কত জীবের ক্ষুধা নিবারণ করে, তাহার সুদূর-প্রসারী শাখা-প্রশাখায় কত বিহঙ্গকে বাসস্থান দেয় এবং তাহার শান্ত-শীতল বিস্তৃত ছায়ায় কত জীবকে আশ্রয়-দান করে, তখন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কাহার হৃদয় না আনন্দ ও প্রশংসায় ভরিয়া উঠে? কিন্তু যাঁহার আন্তরিক যত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এক ক্ষুদ্র বৃক্ষশিশু কালক্রমে এই বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, তিনি ইহার দিকে তাকাইয়া যে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেন অন্য কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না।

(৬) **শিক্ষকের আনন্দ।** প্রকৃত শিক্ষাদান-কার্য ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষে অফুরন্ত আনন্দের উৎস। জ্ঞানপিপাসু যেমন জ্ঞানলাভে অতুল আনন্দ উপভোগ করেন, প্রকৃত শিক্ষকও সেইরূপ শিক্ষাদান-কার্যে অনির্বচনীয় আনন্দ পান। প্রকৃত শিক্ষক শিশুকে নিজ সন্তানের ন্যায় ভালবাসেন। ছোট ছোট শিশুগুলির সরল, নির্মল আনন, বিস্ময় ও ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টি, এবং সমস্ত বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণের জন্য আগ্রহপূর্ণ ছোট ছোট প্রশ্ন তাঁহাকে অপরিসীম আনন্দ দেয়। এই নানা বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে তাহারা নূতন আগন্তুক। ইহার প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনা তাহাদের বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের উদ্রেক করে। তাহার উপর মানুষের ভাষা, আচার-ব্যবহার, শিল্প-বিজ্ঞান সমস্তই তাহাদের নিকট রহস্যময়। শিক্ষকের সাহায্যে তাহারা যখন নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করে এবং এক একটা

রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনে সমর্থ হয়, তখন তাহাদের কচি মুখগুলি জ্ঞানলাভের নির্মল আনন্দ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় এবং তাহা দেখিয়া শিক্ষকের হৃদয় সফলতার আনন্দে ভরিয়া উঠে। তাহার পর শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যখন এই ক্ষুদ্রকায় মানব-শিশুগুলির শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হইতে থাকে এবং তাহারা জ্ঞানের রম্যোদ্যানে আনন্দে বিচরণ করিয়া নব নব জ্ঞান-পুষ্পে নিজেকে সজ্জিত করিতে থাকে তখন তাহাদের এই ক্রম-বিকাশ ও জ্ঞান-শোভা সন্দর্শনে শিক্ষকের হৃদয় যে স্বর্গীয় সৃষ্টির আনন্দে পূর্ণ হয় তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বাগানের মালী ধনীর একজন সাধারণ বেতনভোগী চাকর মাত্র; কিন্তু তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে যখন বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সবুজ পত্রশোভিত পুষ্পবৃক্ষে পরিণত হয় এবং কালক্রমে তাহারা যখন নানাবর্ণের ও মধুর সুষমামাখা ফুলপুষ্পে সজ্জিত হইয়া বাগানের শোভাবর্ধন করে, তখন সেই বাগানের দিকে তাকাইয়া তাহার মালী যে অনির্বচনীয় সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করে, অতুল ধনের অধিকারী তাহার প্রভুর পক্ষেও তাহা সম্পূর্ণ দুর্লভ। শিক্ষাদানের এই নির্মল স্বর্গীয় সৃষ্টির আনন্দই শিক্ষকের সর্বাপেক্ষা বড় পুরস্কার। যে শিক্ষক শিক্ষাদান-কার্যে এই নির্মল সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করেন না, তিনি কোনদিন সুশিক্ষক হইতে পারেন না।

(দুই কারণে আমাদের শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকে এই স্বর্গীয় আনন্দভোগে বঞ্চিত থাকেন। প্রথমতঃ, জ্ঞানলাভে ও জ্ঞানদানে ছাত্র ও শিক্ষকের আন্তরিক আগ্রহ না থাকায় তাহারা উভয়েই এই আনন্দলাভে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিশুর জ্ঞানলাভ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সর্বদা পরীক্ষা-পাশের দিকে লক্ষ্য রাখায় শিক্ষকের নিকট শিক্ষাদান-কার্য আনন্দদায়ক হয় না। প্রথমোক্ত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিলে শিক্ষকও আনন্দ পাইবেন, ছাত্রও পরীক্ষা-পাশে কৃতকার্য হইবে।)

References

1. T. Raymont—Principles of Education, Chap. XVIII.
2. P. Wren—The Indian Teachers' Guide, Chap. V.
3. Landon—The Principles and Practice of Teaching and Class Management, Chap. I.
4. T. Raymont—Modern Education, Chap. XII.

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়

সুশিক্ষা-দানের জন্য পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত বহু গুণযুক্ত সুশিক্ষকের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী হইলেও উপযুক্ত স্থানে ও শিক্ষাদানের উপযোগী আকারে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মিত না হইলে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম না পাইলে তাঁহার পক্ষে সুশিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা কঠিন। তবে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া প্রাসাদোপম বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিলেই তাহা সকল সময় শিক্ষাদানের উপযোগী হয় না। শিক্ষার প্রয়োজনগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বল্পব্যয়েও ভাল বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা যায়। তাই কি রকম স্থানে ও কি আকারে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিলে শিক্ষাদানের সুবিধা হয় তাহা এই স্থলে আলোচনা করা যাইতেছে।

বিদ্যালয়ের স্থান

ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে, হাট-বাজারের নিকট, বহুলোক বা গাড়ী চলাচল করে এমন রাস্তার পার্শ্বে বা অন্য কোন জনাকীর্ণ স্থানে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা উচিত নহে। কারণ সেই সকল স্থানে ছাত্রদের পাঠে মনোযোগ-দানের ব্যাঘাত হয়। জলাভূমি, গোরস্থান, শ্মশান বা জঙ্গলের নিকটও বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা উচিত নহে। সেই সকল স্থানের দূষিত বায়ু-সেবনে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে; ইহা ছাড়া ছাত্রগণের নৈতিক অবনতিকর প্রভাবপূর্ণ পারি-পার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেও বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা উচিত নহে। নদী বা পুষ্করিণীর তীরে, নাত্যুচ্চ পর্বত বা মুক্তপ্রান্তরেই বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের প্রশস্ত স্থান। সহরে বড় রাস্তা হইতে দূরে, পার্ক বা ময়দানের ধারে বা সহরের প্রান্তভাগে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা ভাল। স্থানটি কিছু উচ্চ, শুষ্ক ও আলো-

বাতাস-যুক্ত হইতে হইবে এবং তাহার জল-নিকাশের সুবিধা থাকিতে হইবে। বিদ্যালয়-গৃহের চারিপার্শ্বে, বিশেষতঃ দক্ষিণপার্শ্বে খোলা জায়গা থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় বিদ্যালয়-গৃহে বায়ু-চলাচলের ও আলো প্রবেশের ব্যাঘাত হইবে। ইহার চারিদিকের দৃশ্য যতদূর সম্ভব সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের সন্নিকটে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ সম্ভব না হইলে, তাহার সামনে. অন্ততঃ মনোরম ফুলের বাগান তৈয়ার করিয়া স্থানটি চিত্তাকর্ষক করা যায়।

বিদ্যালয়-গৃহ

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দক্ষিণ দিক্ হইতেই বায়ু প্রবাহিত হয়। সুতরাং এই দেশে দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ করা উচিত। আলোবাতাস প্রবেশের জন্য বিদ্যালয়গৃহের দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বে সমান্তরালভাবে যথেষ্ট দরজা ও জানালা থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়গৃহের ভিত্তি অন্ততঃ দুই ফিট্ (২´) উচ্চ এবং পাকা হইলেই ভাল হয়। উহার ছাদ ভিত্তি হইতে ৭।৮ হাত ঊর্ধ্বে থাকা প্রয়োজন, যেন গৃহের অভ্যন্তরে যথেষ্ট বায়ু থাকিবার স্থান হয়। বিদ্যালয়গৃহের কক্ষগুলি পাশাপাশি থাকা উচিত এবং বিদ্যালয়গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রশস্ত আচ্ছাদিত বারান্দা থাকা প্রয়োজন। ইহার সুবিধা এই যে, ছাত্র ও শিক্ষকগণ কোন কক্ষের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া নিজ নিজ শ্রেণীতে যাইতে পারেন।

বিদ্যালয়গৃহে যাহাতে আলো প্রবেশের এবং বায়ু-চলাচলের কোন বাধা না হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেকগুলি অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা দীর্ঘ সময়ের জন্য যে-ঘরে আবদ্ধ থাকে তাহাতে আলো-প্রবেশের ও বায়ু-চলাচলের ভাল ব্যবস্থা না থাকিলে প্রয়োজনমত অম্লজান সরবরাহের অভাবে তাহারা অল্প মানসিক পরিশ্রমেই অবসাদগ্রস্ত হইবে এবং তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হইবে। ভাল আলোবাতাস পাইবার উদ্দেশ্যে আজকাল কেহ কেহ খোলা জায়গায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু খোলা স্থানে পাঠে মনোযোগদানের নানা বিঘ্ন হইতে পারে।

বিদ্যালয়-গৃহে কক্ষের সংখ্যা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক না থাকিলে স্বতন্ত্র শ্রেণী-কামরার প্রয়োজন নাই, এবং তাহাতে সুশাসন বজায় রাখার অসুবিধা হইতে পারে। তবে যতজন শিক্ষক থাকিবে ততটি শ্রেণী-কামরা থাকা প্রয়োজন। অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অপসারণযোগ্য কাঠের বা বাঁশের পর্দা দেওয়া উচিত। কেবল ছাত্রদের বসিবার স্থান পর্দা দিয়া ভাগ করিয়া দিলে একজন শিক্ষক কোন কামরায় বসিয়া পার্শ্বস্থিত দুই কামরার ছাত্রগণকে দেখিতে পাইবেন, অথচ একশ্রেণীর ছাত্রগণ অন্য শ্রেণীর ছাত্রগণকে দেখিতে পাইবে না। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক না থাকিলে এই ব্যবস্থাই শ্রেয়। শ্রেণীর কামরাগুলি ছাড়াও শিক্ষকগণের বসিবার জন্য এবং আপিসের কাগজপত্র ও পুস্তকাগারের পুস্তক রাখিবার জন্য আরও একটি বা দুইটি কামরা থাকা প্রয়োজন।

উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র কামরা থাকা আবশ্যক। ইহা ছাড়া হেড্‌মাষ্টারের জন্য, শিক্ষকদের জন্য, আফিসের জন্য ও পুস্তকাগারের জন্যও এক-একটি স্বতন্ত্র কক্ষ থাকা উচিত। ভাল স্কুলে ভূগোল, প্রকৃতিপাঠ ও বিজ্ঞান-শিক্ষার সরঞ্জাম রাখার জন্য একটা পদার্থাগারও থাকা বাঞ্ছনীয়। একটা ব্যায়ামাগারও না থাকিলে বর্ষার সময় ছাত্রদের ব্যায়াম করার অসুবিধা হয়। সকল বিদ্যালয়েই একটা সম্মেলন-কক্ষ (Assembly Hall) থাকা উচিত। তাহার আয়তন এরূপ হইবে যেন প্রয়োজনমত বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র তথায় সমবেত হইতে পারে। অন্য সময়ে ইহা ছাত্রদের সাধারণ পাঠাগার (Common Room) ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

শ্রেণী-কক্ষ

শ্রেণীকক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অন্ততঃ ১০ বর্গ ফুট মেঝে থাকা প্রয়োজন। ইংলণ্ডে প্রত্যেকের জন্য ১৪ বর্গ ফুট মেঝে রাখা হয়। সুতরাং ছাত্রের সাংখ্যানুযায়ী শ্রেণী-কক্ষের আয়তন বড়-ছোট হইবে। সাধারণতঃ উচ্চ ইংরেজী স্কুলে

এক শ্রেণীতে ৪০ জন ছাত্র থাকিতে পারে। সুতরাং তাহার শ্রেণী-কক্ষগুলির আয়তন অন্ততঃ ৪০০ বর্গফুট হইতে হইবে। শ্রেণী-কামরা চৌকোণ (square) না হইয়া আয়তক্ষেত্রের আকারে (rectangular) হওয়া ভাল, অর্থাৎ ৪০ জন ছাত্রের কামরা ২৫ ফিট্ দীর্ঘ এবং ১৬ ফিট্ প্রস্থ হইতে পারে।

প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে একটার বেশী দরজা থাকা উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে ছাত্রগণ শিক্ষকের অজ্ঞাতসারে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে। দরজাটি দক্ষিণ ধারের পূর্ব বা পশ্চিম প্রান্তে থাকা উচিত। ইহা ছাড়া দক্ষিণ ধারে আরও দুইটি জানালা এবং তাহাদের সমান্তরালভাবে উত্তর পার্শ্বেও দুইটি জানালা থাকা প্রয়োজন। দরজাগুলি ৪ হাত উচ্চ ও ২½ হাত প্রস্থ এবং জানালাগুলি ২½ হাত উচ্চ এবং ২ হাত প্রস্থ হওয়া উচিত। প্রত্যেক কামরার দরজা-জানালার ক্ষেত্রফল মেঝের ক্ষেত্রফলের ⅕ হইতে হইবে। ছাত্রগণ কক্ষে বসিলে তাহাদের চক্ষু যত উচ্চে থাকে জানালাগুলি তাহা হইতে কিছু উচ্চে বসিবে। তাহা হইলে বাহিরের কোন বস্তুর প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে না। সাধারণতঃ ২ বা ২½ হাত উচ্চে জানালা করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

শ্রেণীকক্ষে বসিবার ব্যবস্থা
(Arrangement of Seats in the Class-room)

শ্রেণীকক্ষের যে অংশে জানালাগুলি থাকে সেই অংশে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া ছাত্রগণকে বসিতে দিতে হইবে। তাহারা এইভাবে বসিবে যেন তাহাদের বামপার্শ্ব হইতে আলো আসে। ডান দিক্ হইতে আলো আসিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, তাহাতে কেবল লেখার সময় লেখার উপর হাতের ছায়া পড়িতে পারে। পশ্চাৎ হইতে আলো আসিলে তাহাদের দেহের ছায়া পুস্তকের উপর পড়িবে এবং পড়িবার অসুবিধা হইবে। সম্মুখ হইতে আলো আসিলে মনোযোগ-দানের ব্যাঘাত হয় ও চোখের অনিষ্ট হয়। সুতরাং আলোর দিকে মুখ রাখিয়া বসিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহারা সকলে শিক্ষকের দিকে মুখ রাখিয়া সারি সারি হইয়া বসিবে। শিক্ষকের দৃষ্টি-বহির্ভূত স্থানে কোন ছাত্রকে বসিতে দেওয়া উচিত নহে।

শ্রেণীকক্ষের যেই অংশে দরজা থাকে সেই অংশে ছাত্রগণের দিকে মুখ করিয়া শিক্ষক আসন গ্রহণ করিবেন। তাঁহার আসন কিছু উচ্চ হওয়া ভাল। তাহা হইলেই তিনি শ্রেণীর সকল ছাত্রের মুখ দেখিতে পাইবেন। তাঁহার পার্শ্বে দরজার বিপরীত দিকে ব্ল্যাক-বোর্ড স্থাপন করিলে তাহার উপরে যথেষ্ট আলো পড়িবে এবং বোর্ডের লেখা বা চিত্র শ্রেণীর সমস্ত বালক দেখিতে পাইবে। ব্ল্যাক-বোর্ডের পার্শ্বেই ম্যাপ, চিত্র ইত্যাদি টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রেণীকক্ষের আসবাব-পত্র

(Furniture of the Class-Room)

ছাত্রদের আসন। আমাদের দেশে পূর্বকালে ফরাসের উপর বা মাদুরের উপর বসিয়া পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। এখনও অনেক স্থানে তাহা আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সমীচীন নহে। কেননা ফরাসের উপর শিশুগণ সোজা হইয়া বসে না, প্রায়ই নুইয়া বা বাঁকা হইয়া বসে। অল্প বয়সে যখন তাহাদের শরীর নিতান্ত কোমল থাকে তখন নুইয়া বা বাঁকা হইয়া বসিবার অভ্যাস করিলে তাহাদের দেহ বাঁকা হইতে পারে বা তাহারা বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িতে পারে। (বোধ হয় প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ছাত্রেরা যোগশাস্ত্র বর্ণিত কোন আসন করিয়া সোজা হইয়া বসিত।) তাহা ছাড়া ইহাতে শরীরে রক্ত-সঞ্চালনেরও ব্যাঘাত হয়। তাই ফরাসের উপর আরাম করিয়া বসিলে শিশুর জড়তা আসে বা সে অলসভাবাপন্ন হয় ও ফলে পাঠে অমনোযোগী হয়। ফরাসের উপর বসিবার ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণ পরস্পরের কাজের ব্যাঘাত করিবার এবং শাসন-শৃঙ্খলা

নষ্ট করিবারও বেশী সম্ভাবনা থাকে এবং শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রগণের কাজ তত্ত্বাবধান করার অসুবিধা হয়। সুতরাং ফরাসের পরিবর্তে বেঞ্চে বসিয়া পড়িবার ব্যবস্থা করাই সমীচীন।

বিভিন্ন প্রকারের আসন

আসন ভিন্ন ভিন্ন আয়তন ও আকারের হইতে পারে। যথা—১ জন বসিবার, ২ জন বসিবার, ৩ বা ৪ জন ছাত্র বসিবার আসন।

এক একজন বসিবার আসনের সুবিধা :—(১) ইহা আরামদায়ক ; (২) পরস্পরের কাজে ব্যাঘাত করিবার সম্ভাবনা কম ; (৩) স্বাস্থ্যকর, অন্যের নিঃশ্বাস নাকে যাওয়ার বা অন্য হইতে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কম ; (৪) শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের কাজ পরিদর্শন করা সহজ হয় ; (৫) ছাত্র সহজে আসন হইতে উঠিয়া কোন কাজ করিতে পারে ; (৬) নকল করা কঠিন হয় এবং (৭) শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার সুবিধা হয়। ইহার মাত্র দুইটি অসুবিধা আছে, যথা,—(১) ইহা বেশী ব্যয়সাধ্য ও (২) ইহার জন্য শ্রেণীকক্ষে বেশী স্থানের প্রয়োজন হয়। তবে গোলটুল ব্যবহার করিলে বোধ হয় বেশী খরচ হইবে না এবং বেশী স্থানের প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং প্রত্যেক ছাত্রের বসিবার জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করাই সর্বাপেক্ষা ভাল।

যদি অর্থাভাবে বা স্থানাভাবে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তবে দুই দুইজন ছাত্রের জন্য এক একটি আসনের ব্যবস্থা করা ভাল। ইহা প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা হইতে খারাপ হইলেও বিশেষ ক্ষতিজনক নহে। ইহাও সম্ভব না হইলে চারিজন পর্যন্ত ছাত্রের জন্য একটা আসনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহার বেশী ছাত্রকে একটা আসনে বা বেঞ্চে বসিতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। এক আসনে একজনের বেশী ছাত্রের বসিবার ব্যবস্থা হইলে, নম্বর দিয়া বা দাগ দিয়া প্রত্যেকের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে এক আসনে অনেক ছাত্র বসিবার অসুবিধাগুলির অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে।

আসনের পরিসর ও উচ্চতা—ছাত্রের বয়স বা উচ্চতা অনুযায়ী আসন বড়-ছোট বা উচ্চ-নীচ হইবে। আসনের পরিসর উরুর দৈর্ঘ্য হইতে কিছু কম হওয়া উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট শিশুর আসনের পরিসর ১০″ (ইঞ্চি), মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যমাকৃতি ছাত্রের আসনের পরিসর ১২″ (ইঞ্চি), এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের বা কলেজের যুবকের আসনের পরিসর ১৪″ (ইঞ্চি) হইলেই ঠিক হয়। আসনের পরিসর ছাত্রের উচ্চতার $\frac{১}{৫}$ হওয়া উচিত। আসনের উচ্চতা ছাত্রের হাঁটুর উচ্চতার সমান হইবে, যাহাতে ছাত্র আসনে বসিলে তাহার পায়ের তলা ঠিক মেঝে পৌঁছে মাত্র।

২ জন বসিবার বেঞ্চের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৩′ (ফুট) এবং ৪ জন বসিবার বেঞ্চের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৬″ (ফুট) হওয়া আবশ্যক।

আসনের পিছনে ছাত্রের কাঁধের সমান উচ্চ একটা খাড়া পিঠ (back) সংলগ্ন থাকা দরকার। ইহা থাকিলে ছাত্রকে খাড়া হইয়া বসিতে হয়।

পুস্তক রাখিবার জন্য ও লিখিবার জন্য বেঞ্চের সামনে একটা ডেস্ক থাকা প্রয়োজন। ডেস্ক বেঞ্চে সংলগ্ন থাকিতেও পারে, স্বতন্ত্র থাকিতেও পারে। এক আসনে বা বেঞ্চে যতজন ছাত্র বসিবার ব্যবস্থা হয়, একটা ডেস্কও তত জন ছাত্রের ব্যবহারের উপযোগী হইতে হইবে। সুতরাং আসনের দৈর্ঘ্য ও ডেস্কের দৈর্ঘ্য সমান হইবে।

বেঞ্চ হইতে ডেস্কের উচ্চতা এরূপ হইবে যাহাতে ছাত্র খাড়া হইয়া বেঞ্চে বসিলে কনুই ও হাত না তুলিয়া বা নামাইয়া ডেস্কের উপর রাখা যায়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই উচ্চতা ছাত্রের উচ্চতার প্রায় $\frac{১}{৬}$ হয়। ডেস্কের পিছনের প্রান্ত বেঞ্চের সম্মুখ প্রান্তের ঠিক উপর পর্যন্ত পৌঁছিলে বা বেঞ্চের উপরও কিছু প্রসারিত হইলে লিখিবার সুবিধা হয়।

ডেস্কের পরিসর ১৫″ হইতে ১৮″ পর্যন্ত হইতে পারে। ডেস্কের উপরি-ভাগে সম্মুখ অংশে পুস্তক দোয়াত ইত্যাদি রাখিবার জন্য ৩″ বা ৪″ সমতল থাকা প্রয়োজন। লেখার জন্য অবশিষ্ট ১২″—১৪″ পর্যন্ত ঢালু হওয়া ভাল। ঢালুর কোণের পরিমাণ প্রায় ১৫° (ডিগ্রী) হইলেই লিখিবার সুবিধা হয়।

ছাত্রের উচ্চতা অনুযায়ী বেঞ্চ এবং আসনের উচ্চতা ও পরিসর

ছাত্রের উচ্চতা	আসনের উচ্চতা	আসনের পরিসর	আসন হইতে ডেস্কের উচ্চতা
৪´	১৩´´	১০´´	৮´´
৪½´	১৪½´´	১১´´	৯´´
৫´	১৬½´´	১২´´	১০´´
৫½´	১৮´´	১৩´´	১১´´

(১) **শিক্ষকের আসন ও টেবিল**—শিক্ষকের বসিবার জন্য একখানা চেয়ার এবং তাঁহার পুস্তক ও কাগজপত্র রাখিবার জন্য একখানি টেবিল থাকাও প্রয়োজন। এইগুলি প্রায় ১´ (ফুট) উচ্চ বেদী বা তক্তপোষের উপর স্থাপন করিলেই ভাল হয়। তাহা হইলে শিক্ষক শ্রেণীর সকল ছাত্রের মুখ দেখিতে পাইবেন। শিক্ষকের চেয়ার হাত-বিহীন হওয়াই ভাল। কারণ পাঠদানের সময় তাঁহাকে বারবার চেয়ার হইতে উঠিতে হয়। টেবিলে একটা ড্রয়ার থাকিলে তাহাতে শ্রেণী সম্পর্কিত কাগজপত্র রাখা যায়।

(২) **ব্ল্যাক-বোর্ড**—শ্রেণী-শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণীতে একটা বা বেশী ব্ল্যাক-বোর্ড থাকা একান্ত প্রয়োজন। (ব্ল্যাক-বোর্ডের ব্যবহার পরে বর্ণিত হইবে।) ব্ল্যাক-বোর্ড নানা প্রকারের হইতে পারে। যথা,—(১) **ফ্রেমের সহিত আঁটা ব্ল্যাক-বোর্ড**—ইহা সাধারণতঃ চতুষ্কোণ হয়। উপরে ও নীচে বা দুই পার্শ্বে কেবল দুইটি পেরেক দ্বারাই ইহা ফ্রেমের সহিত আঁটা থাকে। ইহার এপিঠ ওপিঠ ঘুরাইতে পারা যায় এবং দুই পিঠই ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে এই প্রকারের ব্ল্যাক-বোর্ড থাকে। (২) **ঝুলান ব্ল্যাক-বোর্ড**—ইহার কোন ফ্রেম থাকে না এবং একটা দড়ি বা তারের সাহায্যে ইহা দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখা যায়। সাধারণতঃ ইহার এক পিঠই ব্যবহার করা হয়। তবে প্রয়োজন হইলে উল্টাইয়া অপর পিঠও ব্যবহার

করা যায়। খুব অল্প ব্যয়সাধ্য বলিয়া অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইহাই ব্যবহৃত হয়।

(৩) **প্লাষ্টার বোর্ড**—দেওয়ালে প্লাষ্টার দিয়া ইহা নির্মিত হয়। ইহা বেশ দীর্ঘ ও বড় হইতে পারে এবং ইহাতে এক সঙ্গে অনেক ছবি আঁকা যায় ও সুদীর্ঘ বিষয় লেখা যায়। ইহা বেশী ব্যয়সাধ্য। প্রয়োজন মত ইহাকে স্থানান্তরিত করা যায় না এবং কেবল পাকা দেওয়ালেই ইহা তৈয়ার করা যায়। সম্ভব হইলে শ্রেণী-কক্ষে কাঠের বোর্ডের অতিরিক্ত এই রকম ব্ল্যাক-বোর্ডও রাখা ভাল।

(৪) **ইজেলে স্থাপিত ব্ল্যাক-বোর্ড**—ফ্রেমে ইজেল লাগাইয়া তাহার উপর এই বোর্ড বসাইতে হয়। ইহার অনেক সুবিধা আছে। ইহা প্রয়োজন মত উপরে উঠান বা নীচে নামান যাইতে পারে এবং পিছন দিকে ইচ্ছামত হেলান যাইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহাতে একই ফ্রেমে দুই বা ততোধিক বোর্ড পর পর ব্যবহার করা যাইতে পারে। একটু ব্যয়সাধ্য হইলেও সম্ভব হইলে এই আকারের ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করাই ভাল।

(৫) **গ্রাফ্ বোর্ড**—এই ব্ল্যাক-বোর্ডে দাগ কাটা থাকে। ১ ইঞ্চি পর পর খাড়া (Vertical) ও শয়ান (Horizontal) দাগ কাটিয়া সমস্ত বোর্ডখানি এক বর্গইঞ্চি আয়তনের ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়। রেখাচিত্র (Graph) আঁকিবার জন্য বা মাপমত কোন চিত্র, নক্সা বা মানচিত্র আঁকার জন্য এই বোর্ড ব্যবহৃত হয়। নিম্নস্তরের শিক্ষায় ইহার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

(৬) **কাপড়-বোর্ড**—কাপড়ের উপর এক প্রকার আঠাল জিনিষ লাগাইয়া ও কাল রং দিয়া এই বোর্ড নির্মিত হয়। দেওয়ালে বা কোন ফ্রেমে আঁটিয়া দিয়া ইহা ব্যবহার করা যায়। ইহার সুবিধা এই যে, ইহা ব্যবহারের পর শ্রেণী হইতে লইয়া যাওয়া যায় এবং শ্রেণীর বাহিরে ইহাতে ছবি, ম্যাপ প্রভৃতি আঁকিয়া শ্রেণীতে আনিয়া দেখান যায়। তবে ইহা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। সম্ভব হইলে কাঠের বোর্ডের অতিরিক্ত এরূপ কয়েকটি কাপড়-বোর্ডও রাখা যাইতে পারে।

অন্যান্য জিনিষ। সুন্দর অক্ষরে সারগর্ভ বাক্যলেখা কাগজ কার্ডবোর্ডে আঁটিয়া শ্রেণী-কক্ষের দেওয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়া উচিত। নানা বিষয়ের চার্ট

তৈয়ার করিয়াও দেওয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে কতকগুলি সুদৃশ্য ও শিক্ষাপ্রদ ছবি থাকা বাঞ্ছনীয়। শ্রেণী-লাইব্রেরীর পুস্তক রাখিবার জন্য প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে একটা আলমারীও রাখা উচিত। ডল্টন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন বিষয়-কক্ষ রাখা সম্ভব হইলে তাহাতে সেই বিষয়ের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত নানা পুস্তক, জিনিষ, মডেল, ছবি ইত্যাদি সাজাইয়া রাখিতে হয়।

শ্রেণীকক্ষের আসবাবের অতিরিক্ত বিদ্যালয়ের জন্য আরও অনেক আসবাবের প্রয়োজন হয়। যথা—আলমারী, সেল্‌ফ, র‍্যাক ইত্যাদি। সেইগুলি শিক্ষাদানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নহে বলিয়া এস্থলে বর্ণিত হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ

বিদ্যালয়-গৃহের সামনে কিছু খোলা জায়গা থাকা দরকার। বিদ্যালয় গৃহে ভাল আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য ইহা রাখার প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া, ছাত্রগণ ছুটির পর এই স্থানে সমবেত হইয়া সারিবদ্ধ হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে পারে।

খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে বা যতদূর সম্ভব নিকটে একটা খেলার মাঠ থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যানুযায়ী খেলার মাঠের আকার বড়-ছোট হইবে, ইহাতে যেন বিভিন্ন বয়সের অনেক ছাত্র একসঙ্গে নানা খেলা খেলিতে পারে। শিশুর শারীরিক বিকাশের এবং

তাহার মানসিক অবসাদ দূরীকরণের জন্য বিদ্যালয়ে খেলার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে। কিন্তু বিদ্যালয়-সংলগ্ন প্রয়োজনমত বড় খেলার মাঠ না থাকিলে বিদ্যালয়ের এতগুলি ছাত্রের ব্যায়াম বা খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করিতে পারিলে প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে একটা ব্যায়ামাগারও রাখা ভাল। তাহা হইলে বর্ষার সময় ছাত্রগণের ব্যায়াম করার সুবিধা হয়। ইহার জন্য একটা খোলা ঘরেরই প্রয়োজন। টীনের বা খড়ের ছাউনী দিয়া চারিদিকে খোলা একটা ঘর তৈয়ার করা বিশেষ ব্যয়সাধ্যও নহে।

পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ মধ্যাহ্নকালে ৪।৫ ঘণ্টা সময় জলপান না করিয়া থাকিতে পারে না। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকিলে নিকটস্থ পুকুর বা ডোবার দূষিত জল পান করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। যে স্থানে কলের জল সরবরাহ হয় তথায় বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণেই একটা জলের নল রাখা যাইতে পারে। অন্য স্থানে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে একটি নলকূপ প্রোথিত করিলে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যাইতে পারে। এই দুইটার কোনটাই সম্ভব না হইলে বিদ্যালয়ে কয়লা-বালির ফিল্টারের সাহায্যে জল পরিষ্কার করিয়া ঢাকা-দেওয়া পাত্রে জমা রাখা যাইতে পারে। একই পাত্র হইতে অনেক ছাত্র জলপান করিলে একজনের মারাত্মক রোগ অন্য ছাত্রের শরীরে সংক্রমিত হওয়ার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং জল খাওয়ার জন্য কোন পাত্র না রাখিয়া ছাত্রগণের অঞ্জলীবদ্ধ হস্তে জল ঢালিয়া দেওয়া এবং তাহা হইতে জল খাইতে দেওয়াই ভাল। অথবা জলপাত্র মুখে না লাগাইয়া জল খাওয়ার অভ্যাস করা ভাল।

পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান। প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকগণের জন্য স্বতন্ত্র পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান রাখা একান্ত প্রয়োজন। তবে স্কুল-গৃহ হইতে যথেষ্ট দূরে পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান নির্দিষ্ট করিতে হয়, যেন স্কুলগৃহে ইহার দুর্গন্ধ আসিতে না পারে। স্কুল-প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণায় পায়খানা ও প্রস্রাবের ঘর নির্দিষ্ট করা উচিত। বড় সহরে ফ্লাস (flush) যুক্ত পায়খানা

না হইলে প্রত্যহ উহা পরিষ্কার করার জন্য মেথর নিযুক্ত করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে যেখানে মেথর পাওয়া যায় না, সেখানে কোন স্রোতযুক্ত খালের উপর পায়খানা নির্মাণ করিতে পারিলেই ভাল হয়।

References

1. T. Raymont—Principles of Education, Chaps. I and XV.
2. Percival Wren—The Indian Teachers' Guide, Chap. VII.
3. W. West—Indian School Management and Inspection, Chap. II.
4. খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ—শিক্ষা-বিজ্ঞান, অষ্টম অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয় পরিচালনা

(School Management)

সুপরিচালনার উপরেই বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার সফলতা বা নিষ্ফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত স্থানে বহুব্যয়ে প্রাসাদোপম গৃহ নির্মিত হইতে পারে, তাহাতে যথেষ্ট ছাত্র থাকিতে পারে, তাহার জন্য প্রচুর আসবাব-পত্র ও সরঞ্জাম সংগৃহীত হইতে পারে, এমন কি অনেক বিদ্বান শিক্ষকও নিযুক্ত হইতে পারে; তথাপি সুপরিচালনার অভাবে সমস্ত ব্যর্থ হইতে পারে এবং বিদ্যালয় সুশিক্ষাদানকার্যে সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হইতে পারে। যেমন সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, অগণিত সাহসী সৈনিক লইয়া গঠিত বিপুল সৈন্যবাহিনীও সুপরিচালিত না হইলে কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না, অথবা যেমন অপর্যাপ্ত মালমশলা থাকিলেও নিপুণ শিল্পীর নির্মাণকৌশলের অভাবে সুরম্য অট্টালিকা নির্মিত হইতে পারে না, সেইরূপ সুপরিচালনার অভাব হইলে কোন বিদ্যালয় সুশিক্ষাদান করিতে পারে না, বা ছাত্রগণকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে না। কারণ সুপরিচালিত না হইলে বিদ্যালয়ের সুশাসন বজায় থাকিবে না, সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম থাকিবে না, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকিবে না, প্রত্যেকে কর্তব্য করিবার সুযোগ পাইবে না। এরূপ অবস্থায় শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা হওয়ার বা সুশিক্ষাদানের আশা করা বাতুলতা নহে কি?

বিদ্যালয় সুপরিচালনার জন্য তাহার শিক্ষকগণই একা বা সর্বাপেক্ষা বেশী দায়ী। তাঁহারাই বিদ্যালয়কে ঠিকভাবে তৈয়ার করিতেও পারেন, ধ্বংস করিতেও পারেন। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের সমস্ত অভাব দূর করিয়া তথায় সুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার সুযোগ দিতে পারেন মাত্র, শিক্ষকগণই প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা করিয়া সুশিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু খুব উপযুক্ত এবং আগ্রহশীল শিক্ষকগণ এক একজন এক একভাবে কাজ করিলে তাঁহাদের দ্বারা বিদ্যালয় সুপরিচালিত হইতে পারে না। পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া সুশিক্ষা-দানরূপ কঠিন কার্যে সফলতা অর্জন করিতে হইলে তাঁহাদিগকে একজন উপযুক্ত নেতার অধীনে কাজ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকই এই নেতার স্থান গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষকগণের নেতা হিসাবে বিদ্যালয় সুপরিচালনার জন্য প্রধান-শিক্ষকের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। তাঁহাকে বিদ্যালয়রূপ ঘটিকাযন্ত্রের প্রধান স্প্রীং বলা যায়। তিনি উপযুক্ত না হইলে বা ঠিকভাবে কাজ না করিলে বিদ্যালয়-ঘটিকা একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। অথবা তাঁহাকে বিদ্যালয়রূপ জাহাজের কর্ণধার বলা যায়। তিনি ঠিকপথে না চালাইলে বা চালাইতে না পারিলে অন্য শিক্ষক-নাবিকগণের প্রাণান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও বিদ্যালয়-জাহাজ গন্তব্যস্থলে পৌছিবে না। বস্তুতঃ প্রধান-শিক্ষক উপযুক্ত, উদ্যমশীল, কর্তব্যপরায়ণ এবং উচ্চ আদর্শবাদী হইলে বিদ্যালয় সুপরিচালিত হয়, অন্যথা বিদ্যালয় সুপরিচালনার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

প্রধান-শিক্ষকের গুণাবলী

দক্ষতার সহিত নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে **প্রধান-শিক্ষককে সুশিক্ষক, সুশাসক, সুব্যবস্থাপক** (Good Organiser) **ও উপযুক্ত নেতা হইতে হইবে।** কেহ কেহ বলেন যে সুশিক্ষক না হইয়াও একজন সুদক্ষ প্রধান-শিক্ষক হইতে পারেন। ইহা নিতান্ত ভুল ধারণা। কারণ নিজে সুশিক্ষক না হইয়া তিনি কিরূপে অন্য শিক্ষকগণের শিক্ষাদান-কার্য তত্ত্বাবধান করিতে পারেন? নিজে সুশিক্ষক না হইয়া তিনি অন্য শিক্ষককে পরিচালিত করিতে গেলে একজন অন্ধ অন্য একজন অন্ধকে চালাইবার ফল ভোগ করিতে হইবে, অথবা তিনি তাঁহার অধীনস্থ সুশিক্ষকগণের কার্যে অনিষ্টজনক বাধার সৃষ্টি করিবেন। সুতরাং **প্রধান-শিক্ষককে সুশিক্ষকের অধিকাংশ স্বাভাবিক ও অর্জিত গুণের অধিকারী হইতে হইবে।** শুধু তাহা নহে,

শিক্ষাদান-কার্যে তাঁহার যথেষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকাও দরকার।
তাহা না হইলে তিনি তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষকগণকে সহানুভূতির সহিত ও
দক্ষতার সহিত চালাইতে পারেন না। বরং তাঁহার অনভিজ্ঞতার ফলে অধীনস্থ
অভিজ্ঞ শিক্ষকের কার্যে বাধার সৃষ্টি করিতে পারেন। অপরদিকে শিক্ষাদান-
কার্যে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাই প্রধান-শিক্ষক হইবার জন্য একমাত্র গুণ বলিয়া
বিবেচিত হওয়া উচিত নহে। কারণ শিক্ষাদান-কার্য ও বিদ্যালয় পরিচালনা-
কার্য সম্পূর্ণ এক নহে। শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনার
অভিজ্ঞতা না হইতেও পারে। তাহা ছাড়া কৃতিত্বের সহিত প্রধান-শিক্ষকের
কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে যে উদ্যম, উৎসাহ, নূতন কার্যারম্ভের ক্ষমতা
(Power of Initiative), উদ্ভাবন-ক্ষমতা ও কর্মশক্তি থাকা প্রয়োজন, তাহা
খুব বেশী বয়সে থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক ও অর্জিত
গুণের অধিকারী সহকারী শিক্ষককে ৫ বৎসরের মধ্যে সহকারী প্রধান
শিক্ষকভাবে নিযুক্ত করা উচিত এবং ৪।৫ বৎসর সহকারী প্রধান-শিক্ষকভাবে
কাজ করার পরই প্রধান শিক্ষকের পদে প্রমোশন দেওয়া উচিত।

কেবল সুশিক্ষক হইলেই যে সুদক্ষ হেডমাষ্টার হইবেন তাহা নহে। **তিনি**
সুশাসকও না হইলে বিদ্যালয়ে শাসন-শৃঙ্খলা বজায় থাকিবে না
এবং তাহার অভাবে সুশিক্ষাদান সম্ভব হইবে না। ইহা ছাড়া তাঁহার
সুব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা (Power of Organisation), **কাজ আরম্ভ**
করিবার ক্ষমতা (Power of Initiative) থাকিতে হইবে এবং তাঁহাকে
কিছু **আদর্শবাদী** (Idealist) হইতে হইবে। তাহা না হইলে তিনি
বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে ও তাহার উন্নতি-সাধন
করিতে পারিবেন না। সর্বোপরি **তাঁহাকে একজন ভাল নেতা হইতে**
হইবে। কারণ সমস্ত শিক্ষকের আন্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন তিনি বিদ্যালয়
ঠিকভাবে চালাইতে পারেন না। বস্তুতঃ নিজে কাজ করা হইতেও অন্যকে
দিয়া কাজ করাইবার বা **অন্যকে চালাইবার ক্ষমতাই প্রধান শিক্ষকের বড়**
গুণ। কারণ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তাঁহাকে শিক্ষকগণের অনেক
চক্ষে দেখিতে হইবে, তাঁহাদের অনেক কর্ণে শুনিতে হইবে এবং তাঁহাদের

সমস্ত উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া কার্য করিতে হইবে। তবে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সেনাপতির সৈন্য-পরিচালনা এবং হেড্‌মাষ্টারের শিক্ষক ও ছাত্রগণকে পরিচালনা এক নহে। কারণ শিক্ষক ও ছাত্রগণকে কেবল তাঁহার আদেশ পালন করাইতে পারিলেই চলিবে না। তাঁহাদিগের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিতে না পারিলে তিনি বিদ্যালয় ঠিকভাবে চালাইতে বা তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন না, সুতরাং তাঁহার এরূপ জ্ঞান, কর্মশক্তি, উদ্যম, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবল থাকিতে হইবে যাহাতে অধীনস্থ শিক্ষক ও ছাত্র তাঁহাকে কেবল উর্ধ্বতন কর্মচারীভাবে না দেখিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরের সহিত অনুভব করে। তিনিও অন্য শিক্ষকগণকে কেবল অধীনস্থ কর্মচারীভাবে না দেখিয়া তাঁহাদিগকে সহযোগী মনে করিলে ও তদনুযায়ী ব্যবহার করিলেই তাঁহাদের আন্তরিক সহযোগিতা পাইবেন। ইহা ছাড়া সমস্ত কাজে নিজে অগ্রণী হইয়াই তিনি শিক্ষকগণকে উৎসাহের সহিত নিজ নিজ কর্তব্য-সাধনে নিযুক্ত করিতে পারেন। তিনি **নিজে কঠোরতার সহিত নিয়ম পালন করিয়াই শিক্ষক ও ছাত্রগণকে নিয়মানুগ করিতে পারেন**। শিক্ষক ও ছাত্রের সকল ভাল কাজে **সহানুভূতি** দেখাইয়া ও তাহাদের প্রতি **সস্নেহ, সদয় ও অমায়িক ব্যবহার** করিয়াই তিনি তাহাদের হৃদয় জয় করিতে পারেন। তাঁহার **সততা, ন্যায়পরায়ণতা** ও **পক্ষপাত-শূন্যতায়** গভীর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেই, শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নির্ভয়-চিত্তে আগ্রহের সহিত তাঁহার নির্দেশমত নিজ নিজ কর্তব্য-সাধনে রত হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে **শিক্ষক ও ছাত্রগণের ক্ষমতাশালী প্রভু না সাজিয়া তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, বিজ্ঞ পরামর্শদাতা ও সুযোগ্য নেতার স্থান গ্রহণ করিলেই তিনি শিক্ষক ও ছাত্রগণকে ঠিকভাবে চালাইতে পারিবেন**। ইহা বলা বাহুল্য যে, **সহৃদয়তার সহিত তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা থাকাও একান্ত প্রয়োজন**। যখনই দেখিবেন যে কোন শিক্ষক বা ছাত্র তাঁহার বিশ্বাস ও সৌজন্যের অপ-ব্যবহার করিয়াছে, তখনই তিনি যেন তাহাকে কঠোর হস্তে শাসন করিতে পারেন। **প্রয়োজনমত শাসনের ক্ষমতা** না থাকিলে তাঁহার সহৃদয়তাকে

তাহারা দুর্বলতা বলিয়াই মনে করিবে এবং তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইতস্ততঃ করিবে না।

কেহ কেহ হেডমাষ্টারের কর্মকুশলতাকেই (tact) সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, যতদূর সম্ভব সংঘর্ষ এড়াইয়া কর্তব্য করাকেই কর্মকৌশল বলে এবং প্রত্যেক হেড্‌মাষ্টারের তাহা কিছু পরিমাণে হইলেও থাকা প্রয়োজন। অধীনস্থ লোকের প্রতি সহৃদয়, সহানুভূতিপূর্ণ ও পক্ষপাতশূন্য ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা বড় কর্মকৌশল বলা যায়। কেননা তাহার দ্বারাই সংঘর্ষের মূলোৎপাটিত হয়। ইহা ছাড়া অবস্থোপযোগী অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া ও সংঘর্ষ এড়াইয়া কর্তব্য করা হেডমাষ্টার কেন প্রত্যেক দায়িত্ব-পূর্ণ পদে নিযুক্ত লোকের কর্তব্য। কিন্তু সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য কর্তব্য অবহেলা করাকে কর্মকৌশল না বলিয়া কর্তব্য-জ্ঞানহীনতা বলাই ঠিক।

প্রধান-শিক্ষকের কর্তব্য। হেডমাষ্টার নিজে প্রত্যহ অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা শ্রেণীতে পাঠ দিবেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য শিক্ষকের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতে মধ্যে মধ্যে পাঠ দিলে সকল শ্রেণীর শিক্ষাদান সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত থাকিবেন। বস্তুতঃ **শিক্ষাদান-কার্যে সম্পূর্ণ বিরত হওয়া হেডমাষ্টারের পক্ষে মহাভুল**। কারণ তাহা করিলে শিক্ষক-গণের সুবিধা-অসুবিধা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না এবং তাহাদিগকে কার্যতঃ পথ প্রদর্শন করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার পক্ষে খুব বেশী সময় শিক্ষাদান-কার্যে ব্যয় করাও ঠিক নহে। কারণ তাহা হইলে তিনি অন্য শিক্ষকের শিক্ষাদান-কার্য তত্ত্বাবধান এবং বিদ্যালয় পরিচালনার অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করিবার সময় পাইবেন না।

শিক্ষকগণের কাজ তত্ত্বাবধান করাই হেডমাষ্টারের সর্বপ্রধান কর্তব্য এবং দক্ষতার সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেই তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শিক্ষকগণের কাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই ভাবেই তত্ত্বাবধান করিতে পারেন।

পরোক্ষ তত্ত্বাবধান :—(ক) শিক্ষকগণের পাঠ-তালিকা, পাঠটীকা, নোট, পাঠোন্নতির রেজিষ্টার ইত্যাদি নিয়মমত পরীক্ষা করা; (খ) হেড্‌-

মাষ্টার নিজে প্রশ্ন করিয়া বা অন্য কোন শিক্ষকের দ্বারা প্রশ্ন করাইয়া শ্রেণী পরীক্ষা করা, এবং খুব ভাল, মধ্যম ও খুব খারাপ ছেলের কাগজগুলি নিজে পড়িয়া দেখা বা সহকারী প্রধান-শিক্ষক বা বিষয়-শিক্ষককে পড়িয়া মন্তব্য করিতে দেওয়া; (গ) শ্রেণী পরিদর্শন ও ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়া শিক্ষকের শিক্ষাদানের ফল নিরূপণ।

প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানঃ—(ক) হেডমাষ্টার সময় সময় বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন এবং কোন্ শ্রেণীতে কিরূপ কাজ হইতেছে লক্ষ্য করিবেন। কোন শ্রেণীতে বিশৃঙ্খলা হইয়াছে বা শিক্ষক কর্তব্য অবহেলা করিতেছে দেখিলে শিক্ষকের সহিত কোন কথা বলিবার ছলনায় শ্রেণীতে ঢুকিয়া পড়িতে পারেন এবং ২।১ মিনিট দেখিয়া চলিয়া আসিতে পারেন।

(খ) প্রয়োজন মনে হইলে কোন শ্রেণীতে সমস্ত ঘণ্টা থাকিয়া শিক্ষকের পাঠদান-কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেও পারেন। কেবল অনভিজ্ঞ শিক্ষকের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য, বিশেষতঃ পরোক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলে তাঁহার কাজ সন্তোষজনক নহে বলিয়া মনে হইলে, এই উপায় অবলম্বনীয়। তবে শ্রেণীতে শিক্ষকের সহিত সর্বদা সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাঁহাকে উৎসাহ দেওয়া বা প্রশংসা করা ছাড়া তাঁহার কাজের কিছুমাত্র বিরুদ্ধ সমালোচনা করা উচিত নহে।

পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের পর শিক্ষকের কাজ সম্বন্ধে হেডমাষ্টারের মন্তব্য ও শিক্ষকের সংশোধনের জন্য তাঁহার প্রস্তাব একটা খাতায় লিখিয়া রাখা দরকার এবং তাঁহাকে ডাকিয়া গোপনে তাহা দেখান উচিত। একজন শিক্ষকের কার্য সম্বন্ধে মন্তব্য অন্য শিক্ষকদের জানিতে দেওয়া উচিত নহে। যদি দেখা যায় যে অনেক শিক্ষকই একই রকম ভুল করিতেছেন তখন কোন শিক্ষকের নামোল্লেখ না করিয়া সমস্ত শিক্ষকের সংশোধনের জন্য লিখিত উপদেশ দিতে পারেন।

শিক্ষকগণের কার্য তত্ত্বাবধান ছাড়াও হেডমাষ্টারকে স্কুল পরিচালনার জন্য অনেক কাজ করিতে হয়। যথা—**শ্রেণীগঠন, সময়-পত্রিকা প্রস্তুত** করা, বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রয়োজনমত আসবাবপত্র স্থাপন, বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য **পাঠ্য**

পুস্তক নির্বাচন, বিদ্যালয় শাসন ও পরিচালনার জন্য নিয়ম প্রণয়ন, বৎসরে বিভিন্ন অংশের জন্য **পাঠ-তালিকা অনুমোদন,** বিদ্যালয়ে **সুশাসন রক্ষা**, বিদ্যালয়-গৃহে ও তাহার চারিদিকে স্বাস্থ্যের অনুকূল অবস্থা বজায় রাখা, স্কুলের **আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা,** আফিসের জন্য খাতাপত্র প্রস্তুত রাখা, পুস্তকাগারের পুস্তক ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, ছাত্রদের খেলার বন্দোবস্ত করা, বিদ্যালয়-গৃহের কোন পরিবর্তন বা বিদ্যালয়ের কোনপ্রকার উন্নতি সাধনের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করা, ছাত্রগণের কাজ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভাবকগণকে অবগত রাখা, শিক্ষা বিভাগের সহিত পত্র-ব্যবহার (correspondence) করা ইত্যাদি। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে হেড্ মাষ্টার নিজে একা এতগুলি কাজ করিতে পারেন না। ইহার জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে সহকারী প্রধান-শিক্ষকের সাহায্য লইতে হইবে এবং তাঁহার উপর কোন কোন বিষয়ের ভার দিতে হইবে। তাহা ছাড়া উপযুক্ত শিক্ষকগণের মধ্যেও অনেক কাজ বণ্টন করিয়া দিতে পারেন। কোন্ শিক্ষক কোন্ কাজের উপযুক্ত তাহা বাছিয়া লইয়া **উপযুক্ততা অনুযায়ী তাঁহাদের মধ্যে স্কুল পরিচালনার কাজ বণ্টন** করাও প্রধান-শিক্ষকের একটা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য। কিন্তু সকল বিষয়ে **শেষ মীমাংসার ক্ষমতা তাঁহার নিজ হস্তে রাখিতে হইবে।**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সহকারী প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক

বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রধান-শিক্ষকের পরেই সহকারী প্রধান-শিক্ষকের স্থান। তাঁহাকে বস্তুতঃ শিক্ষানবীশ প্রধান-শিক্ষক বলা যায় এবং সেইরূপ মনোভাব লইয়াই তাঁহার কাজ করা উচিত। অন্যান্য শিক্ষক হইতে তাঁহার ক্ষমতা যেমন বেশী, দায়িত্বও তেমন বেশী। কারণ তাঁহাকে হেডমাষ্টারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব উভয়েরই ভাগ লইতে হয়। যে-সমস্ত কার্য-নির্বাহের ভার তাঁহার উপর দেওয়া হয় সেই সমস্ত কাজ তাঁহাকে এরূপভাবে করিতে হইবে যেন তিনিই প্রধান-শিক্ষক। যে-সমস্ত কাজের ভার অন্য শিক্ষকের উপর দেওয়া হয় সেগুলি সুসম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হেডমাষ্টার যে আদেশ বা নির্দেশ দেন বা নিয়ম প্রণয়ন করেন তদনুযায়ী কাজ হইতেছে কিনা তাহা দেখাও তাঁহার কর্তব্য। কোন বিষয়ের বিশৃঙ্খলা হইতে দেখিলে সম্ভব হইলে তিনি নিজে তাহার প্রতিকার করিবেন অথবা হেডমাষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ নিয়মমত সম্পন্ন হওয়া এবং বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় রাখার প্রতি তাঁহাকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এক কথায় বলিতে গেলে **তিনি প্রধান-শিক্ষকের দক্ষিণ হস্ত বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবেন**। তাহাকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে **বিদ্যালয় সুপরিচালনার জন্য হেডমাষ্টারের পরে তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশী দায়ী**।

সহকারী শিক্ষক। ইহা বলা বাহুল্য যে প্রত্যেক সহকারী শিক্ষককেও সুশিক্ষক এবং সুশাসক হইতে হইবে। কেননা তাঁহাদিগকে নিজ নিজ শ্রেণীতে সুশিক্ষাদান করিতে হইবে এবং সুশাসন বজায় রাখিতে হইবে। কিন্তু কেবল দক্ষতার সহিত তাহা সম্পাদন করিলেই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ হইবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সংঘের দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবেও তাঁহাদিগকে কতকগুলি কাজ করিতে হইবে। এই হিসাবে সহকারী শিক্ষকগণের প্রথম

ও প্রধান কর্তব্য তাঁহাদের উপর যে যে কাজের ভার দেওয়া হয় তাহা আগ্রহ ও বিশ্বস্ততার সহিত সম্পন্ন করা। তাঁহাদের দ্বিতীয় কর্তব্য সকল বিষয়ে প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী প্রধান-শিক্ষকের সহিত সহযোগিতা করা। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রধান-শিক্ষক যে সমস্ত আদেশ দেন বা নিয়ম প্রণয়ন করেন তাহা তাঁহাদের সৈনিকের ন্যায় পালন করিতে হইবে। অবশ্য কোন ব্যবস্থা যদি তাঁহাদের নিকট আপত্তিকর বা অনিষ্টজনক বলিয়া মনে হয় তাঁহারা সেই সম্বন্ধে প্রধান-শিক্ষকের নিকট তাঁহাদের স্বাধীন মতামত খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু প্রধান-শিক্ষকের শেষ মীমাংসা তাঁহাদের অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে এবং অন্তরের সহিত তদনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। কারণ **শিক্ষকদের মধ্যে সুশাসনের অভাব হইলে ছাত্রদের মধ্যে সুশাসন বজায় রাখা বা সুশৃঙ্খলার সহিত বিদ্যালয় পরিচালনা কিছুতেই সম্ভব নহে।** ইহাও বলা প্রয়োজন যে কেবল যন্ত্রের ন্যায় নির্দিষ্ট কাজ করিয়া গেলেই সহকারী শিক্ষকের কর্তব্য করা হয় না। কারণ সৈনিকের কাজ বা কেরাণীর কাজ ও শিক্ষকের কাজ এক রকম নহে। সর্বনিম্নতম শিক্ষককেও অনেক সময় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অবস্থোপযোগী ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং **আন্তরিক আগ্রহের সহিত কর্তব্য না করিলে কোন শিক্ষকের কাজ সন্তোষজনক বা ফলদায়ক হইতে পারে না।** অপরদিকে অনেক সহকারী শিক্ষক মনে করেন যে সময়-পত্রিকায় তাঁহাকে যে কাজ দেওয়া হইয়াছে ঠিক সময়ে তাঁহার শক্তিমত সেই কাজ সম্পাদন করিলেই হইল, ইহার বেশী তাঁহার কোন কর্তব্য বা দায়িত্ব নাই; ইহা নিতান্ত ভুল। **তাঁহার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রত্যেক সহকারী শিক্ষককেও বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বের অংশ লইতে হইবে** এবং বিদ্যালয়ের ভালমন্দের জন্য নিজেকেও দায়ী মনে করিতে হইবে। কারণ সহকারী শিক্ষক কেবল একজন দায়িত্বহীন, অধস্তন কর্মচারী নহেন, তিনি **.বদ্যালয় পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-সংঘের একজন দায়িত্বশীল সদস্য।** প্রধান-শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক উভয়েই সর্বদা এই কথা স্মরণ রাখিয়া কাজ করিলে তাঁহাদের মধ্যে প্রভু-দাস সম্বন্ধ স্থাপিত না হইয়া **নেতা ও সহকর্মীর**

সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। প্রধান-শিক্ষক ইহা বিস্মৃত হইলে তিনি সহকারী শিক্ষকগণের আন্তরিক সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হইবেন। **সহকারী শিক্ষকগণ ইহা বিস্মৃত হইলে তাঁহারা নিজেদের হীন অধস্তন কর্মচারীতে পরিণত করিবেন,** প্রধান-শিক্ষকের সহকর্মী বা শিক্ষক-সংঘের দায়িত্বশীল সদস্য-পদলাভের অযোগ্য হইবেন।

শিক্ষকগণের সভা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত কোন বিদ্যালয় সুপরিচালিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রধান-শিক্ষক আদেশ দিবেন এবং সহকারী শিক্ষকগণ কেবল আদেশ পালন করিবেন, এই ব্যবস্থা হইলে দুই পক্ষের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা হইতে পারে না। প্রকৃত সহযোগিতার জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন। সহকারী শিক্ষকগণকেও বিদ্যালয়ের কাজ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটা শিক্ষকগণের সভা গঠন করা দরকার এবং মাসে অন্ততঃ একবার এই সভার অধিবেশন হওয়া উচিত। প্রয়োজন হইলে যে কোন সময়ে ইহার বিশেষ অধিবেশন হইতে পারে। প্রধান-শিক্ষকই তাঁহার পদের দাবীতে (Ex-officio) ইহার সভাপতি হইবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহকারী প্রধান-শিক্ষকই সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। প্রধান-শিক্ষক শিক্ষকদের মধ্য হইতে একজনকে ইহার কর্মসচিব মনোনীত করিবেন।

শিক্ষকগণের এই সভায় তাঁহারা বিদ্যালয়-সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন, সকল বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারেন, এবং বিদ্যালয়ের উন্নতি-সাধনের জন্য যে কোন প্রস্তাব করিতে পারেন। এমন কি, তাঁহাদের সাধারণ (Common) অভাব-অভিযোগ থাকিলে সে সম্বন্ধেও এই সভায় আলোচনা হইতে পারে। ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে এই সভায় আলোচনা হওয়া উচিত নহে, ব্যক্তিগতভাবেই তাহা জানাইতে হয় এবং প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হয়। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা একটি **পরামর্শ সভা** (Advisory Committee) এবং বিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে

হেডমাষ্টারকে পরামর্শ দেওয়াই ইহার প্রধান বা একমাত্র কাজ। সুতরাং বিদ্যালয় সুপরিচালনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ইহাতে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইবে। প্রধান-শিক্ষক সেরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ না করিলে ইহাতে **ভোট দিয়া কোন প্রস্তাব গৃহীত বা অগ্রাহ্য হইবে না**। শিক্ষকগণের স্বাধীন মতামত শুনিয়া হেডমাষ্টার তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিবেন। সহকারী শিক্ষকগণের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত এবং বিদ্যালয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন, না হইলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। তবে উভয় পক্ষের মতামত এই সভার বিবরণীতে ঠিকভাবে লিখিতে হইবে, যাহাতে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ বা ইন্সেক্টার ইহা পাঠ করিয়া শিক্ষকদের প্রস্তাবের মূল্য এবং প্রধান-শিক্ষকের তাহা গ্রহণ করার বা না করার কারণ সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত হইতে পারেন।

শ্রেণী-শিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষক

শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষাদান-কার্য বণ্টনের সময় এক শ্রেণীতে অনেক বিষয় পড়াইবার কাজ এবং শ্রেণী পরিচালনার কাজ একজন শিক্ষককে দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহাকেই **শ্রেণী-শিক্ষক** বলা যায়। অপরদিকে এক শিক্ষককে অনেক শ্রেণীতে একই বিষয়ে শিক্ষাদানের কাজ দেওয়া যায় এবং তাঁহাকে সেই বিষয়ে **বিষয়-শিক্ষক** বলা যায়।

শ্রেণী-শিক্ষক নিয়োগের সুবিধা ও অসুবিধা

শ্রেণীগুলিই স্কুলের মানস্বরূপ এক এক অংশ (Units) ; তাহাদের ভিত্তি করিয়াই স্কুলসৌধ নির্মিত হয় এবং স্কুলের সমস্ত কার্য-ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেক শ্রেণী পরিচালনার বিশেষ কতকগুলি কাজ থাকে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদের কতকগুলি সাধারণ (Common) কাজ ও সাধারণ সমস্যা থাকে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীতে অনেক সময় সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে হয়, এবং এক এক শ্রেণীতে শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণকে পরস্পর সহযোগিতা করিয়া কাজ করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং এক এক শ্রেণীর পরিচালনার ভার এক একজন শিক্ষকের উপর দেওয়া উচিত। **ইহার সুবিধা** এই যে, (১) ইহাতে

শ্রেণীর বিশেষ কাজগুলি সুনির্বাহিত হয়; (২) শ্রেণী-শিক্ষক তাঁহার শ্রেণীর ছাত্রগণ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত খবর লইতে পারেন এবং তাহাদের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন; (৩) শ্রেণী-শাসনের কাজ সহজ হয়, (৪) শ্রেণীর শিক্ষকগণ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিতেছেন কিনা এবং তাঁহাদের শিক্ষাদান-কার্য সন্তোষজনক কিনা তাহার প্রতিও তিনি দৃষ্টি রাখিতে পারেন; (৫) শ্রেণীর সংঘবদ্ধ কাজগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হয় এবং (৬) শ্রেণীর উন্নতির জন্য শ্রেণী-শিক্ষককে বিশেষভাবে দায়ী করা যায়। ইহার অসুবিধাও আছে; যথা,—(১) একই শিক্ষক ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই শ্রেণীতে পড়াইতে গেলে উহা শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষে অপ্রীতিকর একঘেয়েমীর সৃষ্টি করে; (২) আদর্শ সুশিক্ষক না হইলে শ্রেণী-শিক্ষকের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত প্রভাব ছাত্রগণের পক্ষে মঙ্গলজনক না হইতেও পারে; (৩) নিম্নশ্রেণীতে ভিন্ন একই শিক্ষক অনেক বিষয় নিপুণতার সহিত শিক্ষা দিতে পারেন না। সুতরাং **কেবল নিম্ন শ্রেণীতেই শ্রেণী-শিক্ষক নিয়োগ বাঞ্ছনীয়**। কেবল শ্রেণী পরিচালনার বিশেষ কার্যগুলি সম্পাদন এবং ছাত্রদের কাজ ও ব্যবহার ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য উচ্চ শ্রেণীতেও শ্রেণী-শিক্ষক নিযুক্ত করা যায়। কিন্তু নিম্ন-শ্রেণীর ন্যায় উচ্চ শ্রেণীতে এক শিক্ষককে অনেক বিষয় শিক্ষাদানের কাজ দেওয়া যায় না।

শ্রেণী-শিক্ষকের কর্তব্য। শ্রেণী-শিক্ষকই শ্রেণীর হাজিরা ডাকিবেন, বেতন আদায় করিবেন, ছাত্রদের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার মন্তব্যসহ ছুটীর দরখাস্ত প্রধান-শিক্ষকের নিকট পাঠাইবেন; শ্রেণীর আসবাবপত্র যথাস্থানে রক্ষা ও শ্রেণীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির দিকেও তিনি দৃষ্টি রাখিবেন; শ্রেণীতে সুশাসন রক্ষার জন্যও তিনিই দায়ী থাকিবেন; শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রের কাজ ও ব্যবহারের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন; বিষয়-শিক্ষকদের নিকট হইতে তাহাদের কাজ ও পাঠোন্নতি সম্বন্ধে খোঁজ লইবেন এবং শ্রেণীর পাঠোন্নতির রেখাচিত্র অঙ্কিত করিবেন; তিনি শ্রেণীর পুস্তকাগারের উপযুক্ত ব্যবহারের ব্যবস্থা করিবেন ও উৎসাহ দিবেন এবং শ্রেণীর জন্য ক্রীড়া

ও প্রতিযোগিতার সুব্যবস্থা করিবেন। শ্রেণীর ছাত্রগণের সহিত তিনি খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবেন এবং তাহাদের অভাব-অসুবিধার প্রতি প্রধান-শিক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ীর অবস্থা, বাড়ীতে পড়িবার সুবিধা-অসুবিধা, অভিভাবকের উপযুক্ততা-অনুপযুক্ততা ও বাড়ীতে ছাত্রের কাজ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি খোজ লইবেন। মধ্যে মধ্যে অভিভাবকের সহিত দেখা করিয়া বিদ্যালয়ে ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে জানাইবেন এবং বাড়ীতে ছাত্রের কাজ, ব্যবহার এবং ছাত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে খোঁজ লইবেন। ছাত্রকে পরিচালনা সম্বন্ধে অভিভাবকের পরামর্শ লইবেন ও তাঁহাকে পরামর্শ দিবেন। শ্রেণীর ছাত্রগণকে তাহাদের কাজ ও ব্যবহারের দ্বারা সকল বিষয়ে তাহাদের শ্রেণীকে বিদ্যালয়ের মধ্যে আদর্শ শ্রেণীতে পরিণত করিবার জন্য উৎসাহ দিবেন। একদিকে তিনি প্রধান-শিক্ষকের প্রতিনিধিভাবে শ্রেণীর পরিচালনার দায়িত্ব লইবেন; অপরদিকে অভিভাবকের প্রতিনিধি হিসাবে ছাত্রদের সর্বপ্রকার মঙ্গল-সাধনে রত থাকিবেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে **তিনি একাধারে শ্রেণীর ছাত্রগণের শিক্ষক, শাসক, বন্ধু, পরামর্শদাতা ও পরিচালকভাবে কাজ করিবেন এবং সর্বদা শ্রেণীর ছাত্রগণের মঙ্গল বিধানের জন্য সচেষ্ট থাকিবেন।**

বিষয়-শিক্ষক নিয়োগের সুবিধা। এক একজন শিক্ষককে এক এক বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিয়োগ করা হইলে, (১) যেই বিষয়ে যাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে তিনি সেই বিষয় পড়াইবার ভার লইতে পারেন; (২) সেই বিষয় এবং তাহার শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানার্জন করিয়া তিনি সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (expert) হইবার সুযোগ ও উৎসাহ পাইয়া থাকেন; (৩) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়গুলি ভাল শিক্ষাদানের ও তাহার ভালরূপ তত্ত্বাবধানের সুবিধা হয় এবং (৪) এক এক বিষয় শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণ বিষয়-শিক্ষকের নেতৃত্বে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিলে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা হইতে পারে, (৫) কোন বিষয় বা তাহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে সকল শিক্ষক সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ

বিষয়-শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন বা তাহার সাহায্য লইতে পারেন। বস্তুতঃ বিষয়-শিক্ষক নিয়োগ না করিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষাদানের বা শিক্ষাদান-কার্যের ভাল তত্ত্বাবধানের সুব্যবস্থা করা কঠিন। কারণ প্রধান-শিক্ষক বা সহকারী প্রধান-শিক্ষকের পক্ষে সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে। যে সকল বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ অধিকার নাই, তাঁহারা সেই সকল শিক্ষাদান-কার্য তত্ত্বাবধানের ভার বিষয়-শিক্ষকের উপর দিতে পারেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, **একজন শিক্ষককে কেবল এক বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত** এবং তাঁহাকে যত বেশী শ্রেণীতে সম্ভব সেই বিষয় শিক্ষাদানের ভার দেওয়া উচিত। অবশ্য সেই বিষয়ের অতিরিক্ত অন্য ২।১ বিষয় শিক্ষাদানের কার্যও তাঁহাকে দিতে হয় এবং তাঁহার কাজের একঘেয়েমী নষ্ট করার জন্যও ইহার প্রয়োজন হয়।

বিষয়-শিক্ষকের কর্তব্য। বিষয়-শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য তাঁহার নির্দিষ্ট বিষয় ও তাহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব উচ্চজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা। তাঁহার দ্বিতীয় কর্তব্য সমস্ত বিদ্যালয়ে তাঁহার বিশেষ-বিষয় শিক্ষাদান-কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও তাহার উন্নতি-সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। এই দ্বিতীয় কর্তব্য সাধনের জন্য তিনি হেডমাষ্টারকে বলিয়া সেই বিষয় শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক ও শিক্ষা-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিবেন; বিভিন্ন শ্রেণীতে সেই বিষয় শিক্ষাদান-কার্য পরিদর্শন বা তত্ত্বাবধান করিয়া তাহার উন্নতিসাধনের জন্য উপদেশ দিতে পারেন; মাঝে মাঝে তাঁহার বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণের সভা আহ্বান করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে সেই বিষয় শিক্ষাদান সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহা ছাড়া বিষয়-শিক্ষকগণ সময় সময় নিজ নিজ বিষয়ে আদর্শ পাঠ দিতে পারেন এবং তাহার দ্বারা সেই সেই বিষয় শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণকে কার্যতঃ পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। দক্ষতার সহিত এই সকল কর্তব্য করার জন্য যে শিক্ষক যে বিষয়ে বেশী শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ তাঁহাকেই সেই বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রেণী-গঠন

প্রাচীনকালে সকল দেশের ছাত্রগণকে ব্যক্তিগতভাবেই শিক্ষা দেওয়া হইত। গুরু মহাশয়ের বা অধ্যাপকের চারিদিকে বসিয়া ছাত্রগণ নিজ নিজ কাজ করিত। যাহার যখন প্রয়োজন শিক্ষকের নিকট আসিয়া তাঁহার সাহায্য লইত। তিনিও পালাক্রমে এক একজন ছাত্রের পাঠ লইতেন বা কার্য দেখিতেন ও সংশোধন করিতেন। অনেক ছাত্রকে এক সঙ্গে বা শ্রেণীবদ্ধভাবে শিক্ষাদানের প্রথা অজ্ঞাত ছিল।

এইরূপ ব্যক্তিগত পাঠনার সুবিধা এই যে, ইহাতে শিক্ষক ছাত্রগণের প্রতি অধিকতর ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে পারেন এবং প্রত্যেক ছাত্রের জ্ঞান, শক্তি ও প্রকৃতি উপযোগী শিক্ষা দিতে পারেন। তাহা ছাড়া, ইহাতে ছাত্রগণ প্রধানতঃ আত্মচেষ্টায় শিক্ষা লাভ করিতে অভ্যস্ত হয় এবং তাহাদের স্বাবলম্বন শিক্ষা হয়। তাহারা নিজ নিজ অনুরাগ ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা করিতে পারে এবং তাহাদের প্রয়োজন মত শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং ইহাতে ছাত্রদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে ও তাহার বিকাশ হয়; কিন্তু এই ব্যবস্থার **অসুবিধাও** আছে। ইহাতে শিক্ষকের সময় ও শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় হয়, পৃথক্ ভাবে এক এক ছাত্রকে সাহায্য করার জন্য তাঁহাকে একই বিষয়ের বা কাজের বার বার আবৃত্তি করিতে হয়। এই অপব্যয়ের ফলে তাঁহার সময় ও শক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া তিনি বেশী ছাত্রকে প্রয়োজন মত সাহায্য করিতে পারেন না, এবং সাধারণতঃ তাহারা কেবল স্মৃতি-শক্তির সাহায্যেই জ্ঞানার্জনে রত থাকে। ইহাতে ছাত্রগণ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না এবং প্রতিযোগিতার অভাবে অধিকতর উন্নতির চেষ্টা করে না। একজন শিক্ষক সকল বিষয়ে সমান পারদর্শী হইতে পারেন না বলিয়া তিনি ছাত্রগণকে অনেক বিষয়

শিক্ষা দিতে পারেন না বা তাহাতে প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে পারেন না। ইহার ফলে ছাত্রগণ কতকগুলি বিষয় ভাল শিক্ষা করে এবং অন্য বিষয়ে প্রায় অজ্ঞ থাকে।

বর্তমানে শিক্ষা-বিস্তারের ফলে বড় বড় বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজন হইয়াছে এবং বিভিন্ন বয়সের বহু ছাত্রকে একই সঙ্গে শিক্ষা দিতে হয় বলিয়া তাহাদিগকে এক এক দলে বিভক্ত করিয়া শ্রেণী-গঠন করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। (শ্রেণী-পাঠনার সুবিধা ও অসুবিধা পরে আলোচিত হইবে।)

শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা

এক এক শ্রেণীতে উর্ধ্বসংখ্যা কতজন ছাত্র রাখা যাইতে পারে তাহা নির্ধারণের জন্য **দুইটি বিষয়** বিবেচনা করিতে হয়। ভালরূপ **প্রতিযোগিতার সুযোগ** পাওয়ার জন্য এবং অনেকে **একসঙ্গে কাজ করার আনন্দ উপভোগের** জন্য (for sympathy of numbers) যত বেশী ছাত্রের প্রয়োজন ততগুলি ছাত্র লইয়া এক এক শ্রেণী গঠন করা উচিত। অপর দিকে দলবদ্ধভাবে শিক্ষাদানের সময়ও যত ছাত্রের প্রতি **ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া** যায় এক শ্রেণীতে তাহার বেশী ছাত্র রাখা উচিত নহে। কার্যক্ষেত্রে এই দুই বিরুদ্ধ দাবীর মধ্যে আপোষ স্থাপন করিয়া স্থির হইয়াছে যে, বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীতে ২০ জনের কম এবং ৪০ জনের বেশী ছাত্র থাকা উচিত নহে। **নিম্ন শ্রেণীতে** বা প্রাথমিক স্তরে বেশী ব্যক্তিগত মনোযোগ দানের প্রয়োজন হয় বলিয়া তথায় এক শ্রেণীতে **২০ জনের** বেশী ছাত্র না রাখা উচিত। **উপরের শ্রেণীতে** ছাত্রগণ শিক্ষকের উপদেশ মত অনেকটা স্বচেষ্টায় কাজ করিতে পারে বলিয়া তথায় এক শ্রেণীতে **৪০ জন** পর্যন্ত ছাত্র থাকিতে পারে।

শ্রেণী-গঠনের ভিত্তি

তিনটি বিষয় বিবেচনা করিয়াই কতকগুলি ছাত্রকে একশ্রেণীভুক্ত করা যায়। যথা—(১) **তাহাদের বয়স**। বিভিন্ন বয়সের ছাত্রকে বিভিন্ন প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হয় বলিয়া যতটা সম্ভব এক বয়সের ছাত্র লইয়া একটা শ্রেণী

গঠন করা উচিত। (২) **তাহাদের জ্ঞান বা মানসিক বিকাশ।** অপরদিকে ছাত্রের জ্ঞান বা মানসিক বিকাশের উপযোগী আকারে পাঠ দিলেই তাহা তাহারা সহজে গ্রহণ করিতে পারে। কতকগুলি ছেলের জ্ঞান বেশী, কতকগুলি ছেলের জ্ঞান কম হইলে এক দলের উপযোগী আকারেই পাঠ দেওয়া যায়, অপর দলকে উপেক্ষা করিতে হয়। তাই সমান জ্ঞান ও বিকাশের ছাত্রগণকে লইয়া একটা শ্রেণী-গঠন করিলেই সন্তোষজনক ভাবে শ্রেণীপাঠনা সম্ভব হয়।

স্থতরাং একই বয়সের এবং সমান জ্ঞানযুক্ত ছাত্র লইয়াই আদর্শ শ্রেণী-গঠন করা যায়। তবে বয়সের সাধারণ তারতম্য হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু বেশী তারতম্য হইতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ বয়সের বেশী তারতম্য হইলে একই পদ্ধতিতে পাঠ দেওয়া যায় না এবং বেশী বয়সের ছাত্র অল্প বয়সের ছাত্রের উপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের বা মানসিক বিকাশের বেশী তারতম্য হওয়া অধিকতর আপত্তিজনক। কারণ এই বিষয়ে বেশী তারতম্য হইলে ছাত্রগণকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়াই কঠিন হইয়া পড়ে। (৩) **মেধা।** ইহা ছাড়া মেধা সম্বন্ধেও ছাত্রগণ সমস্থানীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে সাধারণ মেধার ভিত্তিতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্ব বর্ণিত উপায় অবলম্বন করিয়া সাধারণ-মেধার ছাত্রগণের সঙ্গে কিছু উচ্চ-মেধার ও অল্প-মেধার ছাত্রগণকেও শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু অসাধারণ-মেধা ও ক্ষীণ-মেধার ছাত্রগণকে সাধারণ-মেধার ছাত্রগণের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায় না।

বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণী-বিভাগ

তিন প্রকারে শ্রেণী-বিভাগ করা যায়। যথা—**(১) দৃঢ় প্রথা** (Rigid System)। ইহাতে শ্রেণীর সকল ছাত্রকে সকল বিষয়ে একসঙ্গে পাঠ দেওয়া হয়। প্রত্যেক বিষয়ে পাঠের পরিমাণ বৎসরের প্রথমে নির্দিষ্ট করা হয় এবং সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জন করিলেই বৎসরের শেষে প্রমোশন দেওয়া হয়। জার্মেনী দেশে এই প্রণালীতে শ্রেণী গঠন করা হয়। ভারতবর্ষেও এই প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার স্থবিধা

এই যে ইহার ব্যবস্থা অতি সহজ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ; ইহাতে সকল ছাত্রকে সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দান করা যায় এবং তাহাদের পাঠোন্নতি অনেকটা নির্দিষ্ট করা যায়। ইহার অসুবিধা এই যে কোন ছাত্রের এক বিষয়ে বেশী অনুরাগ থাকিলে এবং তাহাতে দ্রুত পাঠোন্নতি করিতে পারিলেও তাহাকে অন্য ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। অপর দিকে কোন বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র অনুরাগ না থাকিলেও তাহাকে সে বিষয়েও নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান-লাভের জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় অথবা সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা পর্যন্ত তাহার প্রমোশন বন্ধ রাখিতে হয়। কোন ছাত্র ২।১ বিষয়ে কিছু পশ্চাৎপদ হইলেও অন্য সকল বিষয়ে তাহার পাঠোন্নতি সন্তোষজনক হইলে তাহাকে প্রমোশন দিয়া উপরিউক্ত অসুবিধার কিছু প্রতিকার করা যায়।

(২) **স্বাধীন প্রথা** (Free System)। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অধ্যয়নের জন্য ছাত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। কোন ছাত্র এক বিষয়ে ৩য় শ্রেণীর উপযুক্ত হইলেও অন্য বিষয়ে ৪র্থ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট বিষয় পাঠ করিতে পারে। ইহার সুবিধা এই যে ইহাতে পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাদান-পদ্ধতি প্রত্যেক ছাত্রের শক্তি ও জ্ঞানের উপযোগী হইতে পারে এবং তাহার শক্তি অনুযায়ী সে দ্রুত বা ধীরে পাঠ করিতে পারে। এক বিষয়ে জ্ঞানের অভাব বা স্বল্পতার জন্য অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভে বাধা হয় না, কিন্তু ইহার অসুবিধা এই যে কতকগুলি নির্দিষ্ট ছাত্র লইয়া এক একটা শ্রেণী গঠন করা যায় না। কারণ তাহাদের জ্ঞানানুযায়ী তাহাদিগকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীতে গিয়া পাঠ গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া তাহারা কোন কোন বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং কোন কোন বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান লাভও না করিতে পারে। তাই এই প্রথা প্রায়ই দেখা যায় না, কেবল ডল্টন প্রণালীতেই এই ব্যবস্থা করা সম্ভব।

(৩) **মিশ্র প্রথা** (Mixed System)। ইহাতে অধিকাংশ বিষয় শ্রেণীর সকল ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়, কেবল গণিত, বিজ্ঞান, বিদেশীভাষা প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন বিষয়ের জন্য ছাত্রগণকে পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন

শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ইহার সুবিধা এই যে ইহাতে ছাত্রের শক্তি অনুযায়ী তাহাকে কোন কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের সুযোগ দেওয়া হয়। সুতরাং ইহা মেধাবী ছাত্রেরই উপযোগী। কিন্তু খুব নিম্ন শ্রেণীতে কোন কোন বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানলাভের উৎসাহ দিলে অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের সাধারণ জ্ঞানও না হইতে পারে। সুতরাং বিদ্যালয়ের নিম্নস্তরে দৃঢ় প্রথাই বেশী উপযোগী এবং উচ্চস্তরে মিশ্র প্রথানুযায়ী ব্যবস্থা করাই সমীচীন। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়সমূহে এই দুই প্রথার সংযোগ করা হয়।

যে প্রণালীতেই শ্রেণী-গঠন করা হউক না কেন **শ্রেণীর সকল ছাত্রের জ্ঞান প্রায় সমান না হইলে শ্রেণী-পাঠনার অসুবিধা হয়**। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ছাত্র ভর্তি করিবার সময় ও তাহাদিগকে প্রমোশন দেওয়ার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। বয়স ও জ্ঞান বিবেচনা করিয়া যেই ছাত্র যেই শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার উপযোগী তাহাকে তাহা হইতে উচ্চশ্রেণীতে ভর্তি করা কিছুতেই উচিত নহে। প্রায় সকল বিষয়ে কোন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান অর্জন না করিলে কোন ছাত্রকে প্রমোশন দেওয়া উচিত নহে। প্রধান শিক্ষক এই দুই বিষয়ে কিছুমাত্র দুর্বলতা দেখাইলে শ্রেণী-গঠনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন। অপরদিকে কেবল প্রমোশন দেওয়ার সময় কঠোরতা অবলম্বন ছাড়াও শ্রেণীতে ছাত্রগণের পাঠোন্নতির সমতা রক্ষার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অসুস্থতা বা অন্য কোন অপরিহার্য কারণে বৎসরের অধিকাংশ সময় শ্রেণীতে যোগ দিতে বা অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ না হইলে, সকল ছাত্র যেন বিভিন্ন বিষয়ের নির্দিষ্ট পরিমাণ সাধারণ জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং প্রমোশান পাইতে পারে, তাহাই শিক্ষকগণের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শ্রেণী-পাঠনার সুবিধা

শ্রেণী-পাঠনার অনেক সুবিধা আছে; যথা—(১) শ্রেণী গঠন করিয়া একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী অনেকগুলি বালক-বালিকাকে শিক্ষা দিতে পারেন। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রগণকে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদানের জন্য

যতজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তাহা হইতে অনেক কম শিক্ষক শ্রেণী-গঠন করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন।

(২) সময়, কার্যশক্তি ও অর্থের মিতব্যয়িতা হয়। অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে ও স্বল্পব্যয়ে অনেকগুলি ছাত্র বা ছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া যায়।

(৩) শিক্ষকদের মধ্যে শ্রমবিভাগের সুবিধা হয় এবং যে শিক্ষক যে বিষয়ে পারদর্শী তিনি প্রধানতঃ সেই বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন। ইহার ফলে তাঁহারা এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন এবং বিষয়-শিক্ষকগণের সাহায্যে সকল বিষয় শিক্ষাদানের সুবন্দোবস্ত করা যায়।

(৪) ইহাতে শিক্ষাদান-কার্য শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের নিকট ব্যক্তিগত শিক্ষাদান হইতে বেশী আনন্দদায়ক হয়। বালক-বালিকাগণ স্বভাবতঃই তাহাদের সমবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশিয়া কাজ করিতে অধিকতর আনন্দ উপভোগ করে।

(৫) সর্বসাধারণের ছেলেমেয়েদেরও অনেক শিক্ষাসরঞ্জামের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়।

(৬) পরস্পরের অনুকরণ করিয়া এবং পরস্পরের সহিত সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা করিয়া ছাত্রগণ অনেক বেশী শিক্ষালাভ করিতে পারে।

(৭) ছাত্রগণ অধিকতর সামাজিক হয়।

(৮) ছাত্রগণের নিয়মানুগামিতা শিক্ষা হয় এবং তাহারা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখে।

(৯) নানারকম খেলার ব্যবস্থা করা যায় এবং খেলার মধ্য দিয়াও ছাত্রদের অনেক শিক্ষা হয়।

(১০) নানা জাতির, নানা ধর্মের ও নানা প্রকৃতির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশার ফলে ছাত্রদের মন উদার হয় এবং লোক-চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের অধিকতর জ্ঞান হয়।

শ্রেণী-পাঠনার অসুবিধা

শ্রেণী-পাঠনার যেমন অনেক সুবিধা আছে তেমন অনেক অসুবিধাও আছে।

(১) শ্রেণী-পাঠনার সময় ছাত্রগণের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগদান কঠিন হয়। এই কারণে শ্রেণী-পাঠনার দ্বারা সকল ছাত্র সমভাবে উপকৃত হয় না।

(২) সকল সময় ছাত্রের প্রকৃতি, শক্তি ও মানসিক বিকাশের উপযোগী আকারে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না।

(৩) মেধাবী ছাত্রগণের দ্রুত পাঠোন্নতির ব্যাঘাত হয় এবং ক্ষীণমেধা ছাত্রগণকে অনেকটা অবহেলা করিতে হয়। কারণ সাধারণ মেধার ছাত্রের উপযোগী আকারেই শ্রেণীতে পাঠ দিতে হয়।

(৪) কুসংসর্গে পড়িয়া বা মন্দ ছাত্রের অনুকরণ করিয়া অনেক ছাত্রের সর্বনাশ হইতে পারে। একজন প্রভাবশালী মন্দচরিত্র ছাত্র অনেক ছাত্রকে কুপথে লইয়া যাইতে পারে।

(৫) ইহা ছাত্রদের স্বাস্থ্যের হানিকারক। অনেক ছাত্র দীর্ঘকাল একঘরে আবদ্ধ থাকিয়া মানসিক কাজ করিলে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হওয়ার সম্ভাবনা হয়।

(৬) ইহাতে সুশাসনের সমস্যা কঠিন ও জটিল হয়। ব্যক্তিগতভাবে কোন ছাত্রকে শাসন করা বা কর্তৃত্বাধীনে রাখা কঠিন নহে। কিন্তু অনেক ছাত্র একস্থানে মিলিত হইলে তাহাদের মধ্যে দলগত মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয় বলিয়া তাহাদিগকে শাসন করা বা কর্তৃত্বাধীনে রাখার কাজ কঠিনতর ও জটিলতর হয়।

(৭) সুশিক্ষাদানের সমস্যাও কঠিনতর হয়। একজন ছাত্রকে তাহার প্রকৃতি, শক্তি ও বিকাশ নির্ধারণ করিয়া তদুপযোগী শিক্ষা দেওয়া খুব কঠিন নহে। কিন্তু অনেকগুলি ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষা দিতে হইলে যতটা সম্ভব তাহাদের সকলের প্রকৃতি, শক্তি ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতে হয়। সুতরাং ইহাতে শিক্ষাদানের সমস্যা কঠিনতর হয় এবং ইহার জন্য যোগ্যতর শিক্ষকের প্রয়োজন হয়।

(৮) অনেকগুলি ছাত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার আতিশয্যে ঈর্ষা, হিংসা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে।

(৯) পাঠে মনোযোগদানের অধিকতর বাধা সৃষ্টি হইতে পারে, এক ছাত্র অন্য ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, বা কতকগুলি ছাত্র সমস্ত শ্রেণীর মনোযোগ অন্যদিকে চালিত করিতে পারে। একস্থানে অনেক লোকের উপস্থিতিই কোন বিষয়ে একাগ্র মনোযোগদানের অন্তরায় হয়।

(১০) ছাত্রদের উপর শিক্ষকের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করা এবং তাহাদিগকে নিজ ইচ্ছামত গড়িয়া তোলা কঠিন হয়।

(১১) ছাত্রগণের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হওয়ার বাধা হয়, তাহাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় এবং তাহারা সাধারণতঃ একই ছাঁচে প্রস্তুত হয়। এইজন্য তাহাদিগকে বিদ্যালয়িক শিশু (Institutionalised Children) বলা হয়।

(১২) ইহাতে ছাত্রগণ স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভের উৎসাহ পায় না ও স্বাবলম্বী হয় না।

শ্রেণী-পাঠনার সুবিধা হইতে অসুবিধা কম না হইলেও বর্তমান অবস্থায় উহা পরিহার করারও উপায় নাই। কারণ ব্যক্তিগতভাবে জাতির সমস্ত ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিতে হইলে এত বেশী শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে এবং এত বেশী অর্থব্যয় হইবে যে তাহার ব্যবস্থা করা কিছুতেই সম্ভব নহে।

সুতরাং শ্রেণী-পাঠনা ত্যাগের কথা চিন্তা না করিয়া আমাদিগকে যতদূর সম্ভব তাহার অসুবিধাগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রেণী-পাঠনার অসুবিধার প্রতিকার

(১) শ্রেণী-পাঠনার সময়ও ব্যক্তিগত মনোযোগদানের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। যথা,—চতুরতার সহিত প্রশ্ন করা, সকলের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, বোর্ডে কাজ করিতে দেওয়া, লেখা কাজ দেওয়া ও ব্যক্তিগতভাবে তাহার তত্ত্বাবধান করা ও সংশোধন করা ইত্যাদি।

(২) মানসিক শক্তি ও পাঠোন্নতি অনুযায়ী ছাত্রগণকে উত্তম, মধ্যম ও অধম তিন দলে বিভক্ত করিয়া এক এক দলকে স্বতন্ত্রভাবে পাঠ দেওয়া যাইতে

পারে। সেই সময়ে অন্যদলের ছাত্রগণকে কোন কার্যে নিযুক্ত রাখা যাইতে পারে। অবশ্য ইহাতে পাঠোন্নতি কম হইবে। যতটা সম্ভব একই বয়সের এবং সমান জ্ঞানের ছাত্র লইয়া শ্রেণী-গঠন করিলে এই দলবিভাগের প্রয়োজন হয় না।

(৩) শ্রেণীতে ছাত্রদের গড়-পড়তা বিকাশ ও জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ দেওয়া যাইতে পারে। উচ্চমেধা ও অল্পমেধা ছাত্রগণকে শ্রেণীর বাহিরে স্বতন্ত্রভাবে কাজ দেওয়া যাইতে পারে এবং সাহায্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। শ্রেণী-পাঠনার অতিরিক্ত বিভিন্ন মেধার ছাত্রগণকে ব্যক্তিগত সাহায্য করার জন্য তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে, এবং এক এক দলকে এক এক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখা যাইতে পারে।

(৪) পাঠোন্নতি অনুযায়ী বৎসরের মধ্যেই কতকগুলি ছাত্রকে প্রমোশান দেওয়া যাইতে পারে। আমেরিকায় ইহার বহুল প্রচার আছে। তবে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র এক শাখাশ্রেণীভুক্ত করিতে হয় এবং ইহাতে শ্রেণীসংখ্যা বাড়িয়া যায়। সুতরাং অভিভাবকগণ অতিরিক্ত ব্যয়বহনের জন্য প্রস্তুত হইলেই এই ব্যবস্থা করা যায়।

(৫) পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিবার জন্য ছাত্রগণকে উৎসাহ ও সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। শ্রেণীতে প্রত্যেক মন্দ ছাত্রের পার্শ্বে একজন ভাল ছাত্রকে বসিতে দেওয়া যায় এবং ভাল ছাত্রের উপর খারাপ ছাত্রকে সাহায্য করিবার ভার দেওয়া যায়।

(৬) শ্রেণী-পাঠনার সময় অমনোযোগিতার কারণগুলি নির্ধারণ করিয়া যতদূর সম্ভব তাহাদের প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয়ের আলোচনা হইবে)।

(৭) বিদ্যালয়ে ও শ্রেণীতে সুশাসন বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনমত অতিরিক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয় (চতুর্থ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইবে)।

(৮) স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়মগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যালয়ের স্থান নির্দেশ ও গৃহনির্মাণ করিলে এবং পূর্ববর্ণিত মানসিক অবসাদের কারণগুলি

স্মরণ রাখিয়া ও তাহাদের প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা দূর হইবে।

(৯) প্রতিযোগিতার খারাপ ফল দূর করিবার জন্য ঈর্ষা, হিংসা, ষড়্যন্ত্র বা কোন অসৎপন্থা অবলম্বনের প্রমাণ পাইলে, পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া উল্লেখযোগ্য উন্নতির পুরস্কার (Prize for Marked Progress) দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমিবে।

(১০) মন্দ চরিত্রের ছাত্রদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে এবং তাহারা যেন অন্য ছাত্রদের সহিত বেশী মেলামেশা করিতে বা তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে তাহার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবক বিশেষ সতর্ক থাকিতে পারেন। মন্দ চরিত্রের ছাত্রগণের সংশোধনের জন্যও নানা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। তাহা সত্ত্বেও যদি কাহারও সংশোধন না হয় এবং দেখা যায় যে সে অন্য ছাত্রগণকে কুপথে পরিচালিত করিতেছে, তবে তাহাকে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

(১১) বিদ্যালয়ের ও শ্রেণীর শাসনশৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া ছাত্রগণকে যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ-সুবিধা দিলে তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে। (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(১২) শ্রেণী-পাঠনার অনুপূরক ভাবে ডল্টন প্রণালী, সমস্যামূলক প্রণালী, সহযোগিতামূলক প্রণালী, পরিদর্শিত পাঠ প্রভৃতির সাহায্যেও শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিলে শ্রেণী-পাঠনার অনেক দোষের প্রতিকার হইবে বা অনেক অভাব পূরণ হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠ্য-বিষয় নির্বাচন

এক সময়ে শিশুর বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলি স্বতন্ত্র বলিয়া ধারণা ছিল এবং কোন্ বিষয় কোন্ মানসিক শক্তির বিকাশের সাহায্য করে কেবল তাহা বিবেচনা করিয়াই পাঠ্যবিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করা হইত। কল্পনা-শক্তির বিকাশের জন্য সাহিত্য, বিচার-শক্তির বিকাশের জন্য গণিত, স্মরণ-শক্তির বিকাশের জন্য ইতিহাস ও ভূগোল, বিচার ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। বস্তুতঃ বিভিন্ন বিষয়গুলি বিভিন্ন মানসিক শক্তির বিকাশের যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করা হইত। পরে শিক্ষাবিদ্‌গণ বুঝিতে পারেন যে, মানসিক শক্তিগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে এবং অনেক বিষয় শিক্ষা করিলে কোন মানসিক শক্তির ব্যবহার বাদ পড়ে না।

ইহার পর কিছুদিন জীবিকার্জনের সহিত যে সকল বিষয়ের সম্পর্ক আছে কেবল সে সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু শীঘ্রই উপলব্ধি করা যায় যে মানুষ কেবল খাওয়ার জন্যই জীবনধারণ করে না, এবং কেবল শারীরিক অভাব পূরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তখন জীবিকার্জনের জন্য তৈয়ার করা ছাড়া **সমাজের আদর্শ ও প্রয়োজনের দিকে** লক্ষ্য রাখিয়াও শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়।

কিন্তু তখন পর্যন্ত যে শিশু শিক্ষালাভ করিবে তাহার কথা আদৌ বিবেচনা করা হইত না। তাহার যে কোন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার যে কোন বিষয়ে অনুরাগ বা বিরাগ থাকিতে পারে, অথবা তাহার বর্তমান জীবনের কোন অভাব পূরণ করারও যে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা স্মরণ রাখিয়া পাঠ্যবিষয় নির্বাচন হইত না। বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌গণ তাঁহাদের এই ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই **এখন সমাজের আদর্শ ও প্রয়োজন এবং শিশুর শক্তি, প্রকৃতি, ক্রমবিকাশ ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি—এই উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিশুর পাঠ্যতালিকা নির্বাচন করা সমীচীন**

বলিয়া স্থির হইয়াছে। সুতরাং শিশুর জন্য আদর্শ পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখিতে হয় :—

(১) ছাত্রকে কোন বিষয়ে মহাপণ্ডিত করা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হইতে পারে না। তাহার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি (Gifts) ও প্রবৃত্তির (Instincts) বিকাশের সুযোগ দেওয়াই এই স্তরের শিক্ষার প্রধান কাজ। অধিকন্তু এই নমনীয় বয়সে নূতন নূতন বিষয়ে তাহার অনুরাগ সৃষ্টির চেষ্টা করাও আবশ্যক।

(২) শিক্ষাজীবনের দৈর্ঘ্য বিবেচনা করিয়াও শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। যে ছাত্রের পাঠ্যজীবন প্রাথমিক স্তরে বা মাধ্যমিক স্তরেই শেষ হইবে এবং যে ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করিবার সম্ভাবনা আছে এই উভয়েরই পাঠ্যতালিকা এক হইতে পারে না।

(৩) প্রাথমিক স্তরে প্রধানতঃ শিশুর প্রতি এবং তাহার সাধারণ প্রয়োজনগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করা উচিত। বিশেষতঃ শিশুর শক্তি ও ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে।

(৪) মাধ্যমিক স্তরে উদার শিক্ষা (Liberal Education) দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই স্তরে ছাত্রকে প্রায় সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দিতে হইবে, যেন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে কোন কোন বিষয়ে সে বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করিতে পারে। বস্তুতঃ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ভিত্তি যতই প্রশস্ত হয় ততই ভাল; তাহা হইলেই পরে তাহার উপর উচ্চ-জ্ঞান-সৌধ নির্মাণ করা সম্ভব হইবে।

(৫) কতকগুলি এমন সার্বজনীন বিষয় আছে এবং মানুষের জীবনের উপর তাহাদের প্রভাব এত বেশী যে কোন শিশুরই সেই সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞ থাকা উচিত নহে। যথা,—মাতৃভাষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অঙ্কনবিদ্যা ও সঙ্গীত।

(৬) বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়াও শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন করিতে হয়। যেমন, কৃষিপ্রধান গ্রামের বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষাদানের

ব্যবস্থা করা যায় ও করা উচিত। কিন্তু শিল্পপ্রধান নগরের বিদ্যালয়ে কৃষির পরিবর্তে কোন হস্ত বা যন্ত্রশিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়।

(৭) শিক্ষা সমাপ্তির পূর্বে একটা ব্যবসায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। ১৩।১৪ বৎসরের পূর্বে শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। সুতরাং প্রাথমিক স্তরে কোন ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া যায় না। এই স্তরে সাধারণ বিষয়গুলি ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দিলে এবং হাতের কাজ শিক্ষা দিলে, পরে কোন একটা ব্যবসায় অবলম্বনের সাহায্য হইবে। যাহাদের শিক্ষা প্রাথমিক বা মধ্য বাঙ্গলা স্তরেই শেষ হইবে তাহাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর আরও এক বা দুই বৎসর স্কুলে রাখিয়া কোন শিল্প শিক্ষা দেওয়া যায়। যাহাদের শিক্ষা মাধ্যমিক স্তরে শেষ হইবে তাহাদিগকে মাধ্যমিক স্তরের শেষ দুই বৎসর কোন ব্যবসায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরের শেষ দুই বৎসর ছাত্রগণকে দুইদলে বিভক্ত করিয়া একদলকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের জন্য, অপর দলকে কোন ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

পূর্বোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন স্তরের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্য-তালিকা প্রস্তুত করা যায়।

প্রাথমিক স্তর (৭—১০)—মাতৃভাষা, ব্যাকরণ, গণিত, নিজদেশের ইতিহাস, প্রাকৃতিক ভূগোল, নিজদেশের ভূগোল ও পৃথিবীর সাধারণ জ্ঞান, বস্তুপাঠ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, অঙ্কন, সঙ্গীত, ধর্ম ও নীতি, হাতের কাজ ও খেলা।

মধ্য বাঙ্গলা স্তর (১১—১২)—প্রাথমিক স্তরের অতিরিক্ত বাঙ্গলা সাহিত্য, প্রকৃতিপাঠ, ভারতের একটি সাধারণ ভাষা ও একটা হস্তশিল্প।

মাধ্যমিক স্তর (১৩—১৬)—বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, গণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, বীজগণিত (কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক বা বিজ্ঞান শিক্ষা-লাভেচ্ছুগণের জন্য), দেশের ইতিহাস ও পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাস, ভূগোল (নিজ নিজ দেশের বিস্তারিত জ্ঞান ও পৃথিবীর সাধারণ জ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ভূগোলের বিশেষ জ্ঞান), স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতি, অঙ্কন, সঙ্গীত, নাগরিক বিজ্ঞান, একটা সর্বভারতীয় ভাষা, একটা পৃথিবীর ভাষা

(ইংরেজী), একটা প্রাচীন ভাষা—সংস্কৃত, পারসী, আরবী, পালি ইত্যাদি (যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে Art শাখার শিক্ষা লাভ করিবে কেবল তাহাদের জন্য), হস্তশিল্প, ব্যায়াম (Gymnastics) ও প্রতিযোগিতামূলক খেলা এবং একটা কোন ব্যবসায়-সম্পর্কীয় শিক্ষা (যাহাদের শিক্ষা এই স্তরে শেষ হইবে কেবল তাহাদের জন্য ; মাধ্যমিক স্তরের শেষ দুই বৎসর তাহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে এই বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে।)

শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি মানুষের জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত ; সেইজন্য এইগুলিকে **মানবীয়** (Humanistic) **বিষয়** বলে। যথা,—সাহিত্য ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম ও নীতি, চারুশিল্প (অঙ্কন, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদি), নাগরিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি।

অন্য কতকগুলি বিষয় প্রকৃতির সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া তাহাদিগকে **প্রাকৃতিক** (Naturalistic) **বিষয়** বলে। যথা—অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, প্রকৃতিপাঠ ইত্যাদি (ভূগোল উভয় শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়ার কারণ ভূগোল-শিক্ষাদানের পদ্ধতির সহিত আলোচিত হইবে)।

অপর দিকে কতকগুলি বিষয়কে **জ্ঞানমূলক** (Knowledge-subjects) আর কতকগুলিকে **দক্ষতামূলক** (Skill-subjects) বলা হয়। যথা, **জ্ঞানমূলক** :—সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি ; **দক্ষতামূলক** :—লিখন, পঠন, রচনা, অঙ্কন, সঙ্গীত ও বিভিন্ন হাতের কাজ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সময়-পত্রিকা

সময়-পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব। প্রাচীনকালে ব্যক্তিগত-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত বলিয়া সময়-পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। বর্তমান সময়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রেণী-পাঠনার ব্যবস্থা হওয়ায় অনেক শ্রেণীতে শত শত ছাত্রকে একই সময়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং এখন সময়-পত্রিকা ব্যতীত সুশৃঙ্খলার সহিত কোন বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব নহে। সময়-পত্রিকা বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজের প্রতিচ্ছবি, শিক্ষকের দৈনিক কাজের পরিকল্পনা (plan) এবং ছাত্রের বিভিন্ন বিষয় পাঠের পূর্বকল্পিত কর্মসূচী। সেনাপতির পক্ষে যেমন যুদ্ধের পরিকল্পনা, নাবিকের পক্ষে যেমন সমুদ্র-পথের মানচিত্র, শিক্ষকের পক্ষে তেমন সময়-পত্রিকা। সময়-পত্রিকার সাহায্যে একদিকে শিক্ষকদিগের মধ্যে কার্যবিভাগ হয়, অপর দিকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনমত সময় বণ্টন করা হয়। ইহা প্রত্যেক পাঠ্য-বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের আবশ্যকমত মনোযোগ-দান সুনিশ্চিত করে; কখন কি কাজ করিতে হইবে তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়া ইহা সময় ও ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার নিবারণ করে; সমস্ত স্কুল-সময়ের জন্য ছাত্রগণের কাজ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া এবং তাহাদিগকে সমস্ত সময় কার্যরত রাখিয়া ইহা বিদ্যালয়ের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করে; সর্বোপরি নিয়মানুবর্তিতা এবং সঙ্কল্প-সাধনে অবিচলিত থাকিবার অভ্যাস গঠন করিয়া ইহা ছাত্রের চরিত্র-গঠনে সাহায্য করে। বস্তুতঃ সময়-পত্রিকা ব্যতীত সুশৃঙ্খলার সহিত কোন বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব নহে।

সময়-পত্রিকার গুরুত্ব যেমন বেশী তাহা প্রস্তুত করাও তেমন কঠিন। ইহা প্রস্তুত করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

(১) **সমস্ত পাঠ্য-বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা**—সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে প্রথমে দেখিতে হইবে যেন নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয় শিক্ষাদানের প্রয়োজনমত ব্যবস্থা হয়। সুতরাং পাঠ্যবিষয়ের তালিকা সামনে রাখিয়াই সময়-পত্রিকা প্রস্তুতির কার্য আরম্ভ করিতে হয়।

(২) **সমস্ত শ্রেণীগুলিকে কার্যে নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা**—প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য প্রত্যেক ঘণ্টায় কোন কার্য নির্দিষ্ট করিতে হয়, যেন ছাত্রগণ সর্বদা কোন না কোন কার্যে নিযুক্ত থাকে। একটা শ্রেণীতে কাজ দিতে ভুলিয়া গেলে তাহারা সমস্ত বিদ্যালয়ের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করিবে।

(৩) **শিক্ষকগণের মধ্যে কর্মবিতরণ**—শিক্ষকগণের মধ্যে কে কতদূর শিক্ষালাভ করিয়াছেন, কাহার কি পরিমাণ অভিজ্ঞতা আছে, কাহার কোন্ বিশেষ অধিকার বা অনুরাগ আছে, ও কাহার কিরূপ ব্যক্তিত্ব, কর্মশক্তি ও শাসনক্ষমতা আছে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের কার্য বণ্টন করিতে হয়। দক্ষতার সহিত শিক্ষকগণের মধ্যে এই কর্মবিতরণের উপর বিদ্যালয়ে সুশিক্ষাদানের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

(৪) **বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য সময় বণ্টন**—এক সপ্তাহে প্রত্যেক শ্রেণীতে কত ঘণ্টা পাঠ দেওয়া যাইতে পারে হিসাব করিয়া বিষয়ের গুরুত্ব, কাঠিন্য ও পরিমাণানুযায়ী তাহাদের মধ্যে সময় বণ্টন করিতে হয় বা বিভিন্ন বিষয়ে পাঠের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিতে হয়। তাহার পর সপ্তাহের বিভিন্ন দিবসে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। একই দিবসে একই বিষয়ে একটার অধিক পাঠ দেওয়া যায় না। অপর দিকে একই বিষয়ে দুইটি পাঠের মধ্যে এত বেশী সময়ের ব্যবধান থাকা উচিত নহে যাহাতে ছাত্রগণ পূর্বপাঠের বিষয় সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে পারে।

কোন বিষয়ের ২।৩ টা শাখা থাকিতে পারে। যথা,—গণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, অঙ্কেরই ৩টি শাখা। প্রত্যেক সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে (alternately) ইহার বিভিন্ন শাখা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। ইহাকে Spiral System

বলে। অথবা প্রত্যেক শাখাকে বিভিন্ন অংশে (units) ভাগ করিয়া এক এক অংশের শিক্ষাদান শেষ হইলে অন্য শাখার এক অংশের শিক্ষাদান-কার্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। যথা,—৩।৪ টা পাঠে গণিতের ঐকিক নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার পর বীজগণিতের Factorisation শিক্ষাদান-কার্য আরম্ভ করা যায়। এই শেষোক্ত ব্যবস্থাকে সময়-পত্রিকায় Block System বলে এবং ইহাই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া শিক্ষাবিদ্‌গণের অভিমত। কেননা Spiral Systemএ কোন শাখার এক অংশ শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই অন্য শাখার পাঠ দিতে হইতে পারে; Block Systemএ এই দোষের প্রতিকার হয়।

(৫) পাঠের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ—ছাত্রের বয়স, পাঠ্য-বিষয়ের প্রকৃতি, দিবসের কোন্ ভাগে পাঠ দিতে হইবে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া পাঠের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করিতে হয়। পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে যে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রগণ নির্দিষ্ট সময়ের বেশী একটানা মনোযোগ রাখিতে পারে না। (৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য), সুতরাং তাহাদের পাঠের দৈর্ঘ্যও তাহার বেশী হওয়া উচিত নহে।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক স্তরের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বয়সের বালক-বালিকা অধ্যয়ন করে। কিন্তু বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকায় বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পাঠের দৈর্ঘ্যের তারতম্য করা যায় না, সর্বাপেক্ষা অধিক-বয়স্ক ছাত্রের উপযোগী পাঠের দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট করিতে হয়। তবে পাঠ দেওয়ার সময় শিক্ষকগণ ছাত্রের বয়সানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠের দৈর্ঘ্যের তারতম্য করিতে পারেন। অবশিষ্ট সময় পাঠের সহিত সংশ্লিষ্ট ছবি -প্রদর্শন, কবিতা পাঠ, হাতের কাজ বা শ্রেণী-ড্রিল প্রভৃতি কাজে ব্যয় করিতে পারেন। উক্তভাবে কাজ করিলে বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকায় পাঠের দৈর্ঘ্য নিম্নলিখিত পরিমাণ করা যাইতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়—	২০।২৫ মিনিট
মধ্য বাঙ্গলা বিদ্যালয়—	৩০।৩৫ মিনিট
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়—	৪০।৪৫ মিনিট

তবে দিবসের প্রথম ভাগ হইতে শেষ ভাগে পাঠের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৫ মিনিট কম হওয়া উচিত। কারণ দিবসের শেষ ভাগে শিশুর মন অবসাদগ্রস্ত হয় বলিয়া সে পাঠ্য-বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে পারে না।

(৬) পাঠের পর্য্যায় (Succession of Lessons)—

(ক) দিবসের প্রথম ভাগে ছাত্রের মন খুব সতেজ থাকে। প্রথমে তাহার মন স্থির করিতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, ২য় ঘণ্টায় সে খুব ভাল মানসিক কাজ করিতে পারে, ৩য় ঘণ্টার পর সে অবসাদগ্রস্ত হইতে আরম্ভ করে। সুতরাং অঙ্ক, বিদেশী ভাষা, প্রাচীন ভাষা প্রভৃতি যে সকল বিষয় পাঠে অধিক মানসিক পরিশ্রম হয় সে সকল বিষয়ে দিবসের প্রথম ভাগে বা মধ্যাহ্ন-অবসরের পরে পাঠ দেওয়া উচিত। এইগুলি দিবসের শেষ ভাগে শিক্ষা দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। মাতৃভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কনবিদ্যা, হস্তশিল্প প্রভৃতি কম অবসাদকর বিষয়গুলি দিবসের শেষভাগে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

(খ) একাদিক্রমে অবসাদকর বিষয়ের পাঠ দেওয়া উচিত নহে। একটা কঠিন বিষয়ের পাঠ দেওয়ার পর একটা সহজ বিষয় শিক্ষা দেওয়া ভাল। যথা,— গণিত বা ইংরেজীর পাঠের পর মাতৃভাষা, ইতিহাস ইত্যাদির পাঠ দেওয়া যায়।

(গ) ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ, ইন্দ্রিয় বা মনোবৃত্তির ব্যবহার হয় এমন বিষয়ের পাঠ পর্যায়ক্রমে দেওয়া উচিত। যথা,—পড়ার কাজের পর লেখার কাজ, চোখের কাজের পর শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজ, স্মৃতিশক্তির কাজের পর কল্পনা-শক্তির কাজ ইত্যাদি। পর্যায়ক্রমে পাঠের ও লেখার বা হাতের কাজের বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই খুব ভাল হয়।

(ঘ) বিদ্যালয় বসিবার পরই ড্রইং, হস্তলিপি বা অন্য হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া ভাল নহে। তখন শিশুর শরীর চঞ্চল থাকে বলিয়া হাতের কাজ ভাল করিতে পারে না।

(ঙ) রবিবার বিশ্রাম করার পর সপ্তাহের প্রথম ভাগে শিশুর মন সতেজ থাকে। সপ্তাহের শেষের দিকে তাহার মন পুনঃ অবসাদগ্রস্ত হয়। সুতরাং সপ্তাহের প্রথম ভাগেই কঠিন বিষয়গুলি বেশী শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

(চ) উপর্যুপরি মৌখিক বর্ণনামূলক পাঠ দিতে হইলে শিক্ষক বেশী পরিশ্রান্ত হন। সুতরাং তাঁহাকে সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ দেওয়ার পূর্বে বা পরে গণিত, ব্যাকরণ, ভূগোল, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ইত্যাদির পাঠ দিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৭) শ্রেণী-শিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষকের কাজ। শ্রেণী-শিক্ষককে তাঁহার শ্রেণীতে যত বেশী সম্ভব কাজ দেওয়া ভাল। তাহা হইলে তিনি শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রকে ভালভাবে জানিতে পারিবেন। অপরদিকে বিষয়-শিক্ষককে তাঁহার নির্দিষ্ট বিষয়ে যত বেশী সম্ভব পাঠদানের সুযোগ দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই তিনি সেই বিষয় শিক্ষাদান-কার্যে বেশী মনোযোগ দিতে পারিবেন ও তাহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিবেন। অবশ্য শ্রেণী-শিক্ষককে অন্য শ্রেণীতে এবং বিষয়-শিক্ষককে অন্য বিষয়ে কিছু পাঠ দিতে দেওয়া আবশ্যক। নতুবা তাঁহাদের কাজ একঘেয়ে হইয়া পড়িবে।

(৮) শিক্ষক ও ছাত্রের অবসর। ছাত্রগণ তিন ঘণ্টার বেশী একটানা মানসিক পরিশ্রম করিতে পারে না। সুতরাং তিন ঘণ্টা পাঠের পর তাহাদিগকে ৩০ মিনিট অবসর দেওয়া উচিত। ইহা ছাড়া প্রত্যেক ঘণ্টার পর ৫ মিনিট অবসর দানের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, তাহা হইলে প্রত্যেক ঘণ্টা কাজের ফলে যে মানসিক অবসাদ আসে তাহা দূর হইতে পারে এবং এক বিষয় পাঠের পর নূতন এক বিষয় পাঠের জন্য ছাত্রদের মন তৈয়ার হইতে পারে। অবশ্য এই ৫ মিনিট অবসর নির্দেশের জন্য স্বতন্ত্র ঘণ্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করা কঠিন ও অসুবিধাজনক। একটা পাঠ শেষ হওয়ার ৫ মিনিট পরে ২য় পাঠ আরম্ভ করিলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

প্রত্যেক শিক্ষককে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা অবসর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা কোন শিক্ষকই এক দিবসে ৩।৪ ঘণ্টার বেশী উদ্যমের সহিত পাঠ দিতে পারেন না। তবে অবশিষ্ট সময়ে মৌখিক পাঠদানের পরিবর্তে অন্য রকম পাঠদান বা কাজ করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলেও সকল শিক্ষককে প্রত্যহ অন্ততঃ একঘণ্টা অবসর দিতেই হইবে।

শ্রেণীর সময়-পত্রিকা ও শিক্ষকের সময়-পত্রিকা

সপ্তাহের বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন ঘণ্টায় এক এক শ্রেণীর কাজ নির্দেশ করিয়া শ্রেণীর সময়-পত্রিকা তৈয়ার করা যায়। প্রত্যেক শ্রেণীতে এরূপ একটা শ্রেণী-সময় পত্রিকা রাখিতে হইবে।

সেরূপ সপ্তাহের বিভিন্ন দিবসে ও বিভিন্ন ঘণ্টায় বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রত্যেক শিক্ষকের কাজ দেখাইয়া শিক্ষকের সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করা যায়। হেড্‌মাষ্টারের কামরায় ও শিক্ষকগণের কামরায় এক একটা শিক্ষকের সময়-পত্রিকা রাখিতে হয়।

সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করিবার জন্য কতিপয় কার্যকরী ইঙ্গিত
(Practical Hints)

(১) বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে সপ্তাহে কতগুলি পাঠ দিতে হইবে শ্রেণীগুলির নামের পার্শ্বে তাহা লিখিয়া লইবেন।

(২) বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের নামের পার্শ্বে তাঁহাদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা; কোন্ বিষয়ে বিশেষ অধিকার বা অনুরাগ প্রভৃতি বিষয় লিখিয়া লইবেন।

(৩) তাহার পর দুইখানি বড় কাগজে প্রয়োজনীয় দাগ কাটিয়া লইবেন। একখানির বামধারে সমস্ত শিক্ষকের নাম, অন্যখানির বামধারে সমস্ত শ্রেণীর নাম লিখিতে হইবে।

(৪) এক্ষণে একজন শিক্ষক শ্রেণীর নামের পার্শ্বে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে, বিভিন্ন ঘণ্টায়, বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্টসংখ্যক পাঠ লিখিবেন। আর একজন শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষকের নামের পার্শ্বে অনুরূপ দিবসে ও ঘণ্টায় সেই সকল শ্রেণী ও সেই সকল পাঠ লিখিয়া ফেলিবেন।

(৫) এই ভাবে দুই কাগজেই সপ্তাহের সমস্ত কাজ নির্দেশ করা হইলে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্টসংখ্যক পাঠ দেওয়া হইয়াছে কিনা এবং সকল শ্রেণীকে প্রত্যেক ঘণ্টায় কোন না কোন কাজ দেওয়া হইয়াছে কিনা, অপর দিকে সকল শিক্ষককে সপ্তাহে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ দেওয়া ও প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পরিমাণ অবসর রাখা হইয়াছে কিনা।

ইহা বলা বাহুল্য যে বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ নির্দেশ করার সময়ে এবং শিক্ষকদের মধ্যে সেই কাজ বণ্টন করার সময়ে পূর্ববর্ণিত পাঠের পর্যায়, পাঠের দৈর্ঘ্য, পাঠ্যবিষয়ে সময়বণ্টন, শিক্ষকদের মধ্যে কার্যবণ্টন প্রভৃতি নিয়মগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে এবং সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করার পর সেইগুলির সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনমত পরিবর্তন করিতে হইবে।

বর্তমান সময়ে কড়াকড়িভাবে সমস্ত স্কুল-সময়ের জন্য ছাত্রদের কাজ নির্দিষ্ট করিয়া সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে ইহাতে ছাত্রগণের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না এবং তাহারা নিজেদের রুচি, শক্তি বা প্রয়োজনানুযায়ী কোন বিষয় অধ্যয়নে বেশী বা কম সময় দিতে পারে না। ফলে মেধাবী ছাত্রকে অল্পমেধা ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় এবং অল্পমেধা ছাত্রকে মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে গিয়া হাঁপাইয়া উঠিতে হয় বা সেই চেষ্টা ত্যাগ করিতে হয়। তাই ডল্টন লেবরেটরী পদ্ধতিতে সময়-পত্রিকা তৈয়ার করিবার প্রথা ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সময়-পত্রিকার সাহায্য ব্যতীত বহু ছাত্র, শ্রেণী ও শিক্ষক লইয়া গঠিত বিদ্যালয়গুলিতে সুশৃঙ্খলার সহিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই সম্ভব নহে। সুতরাং সময়-পত্রিকা তুলিয়া না দিয়া পূর্বোক্ত অসুবিধাগুলির প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রেণীর গড়পড়তা-মেধার ছাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিলে এবং যতটা সম্ভব একই বয়সের ও সমান জ্ঞানের ছাত্র লইয়া শ্রেণী-গঠন করিলে পূর্বোক্ত অসুবিধাগুলি অনেকটা দূর হইবে। ইহা ছাড়া ছাত্রদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত পাঠের সুযোগ দেওয়ার জন্য সময়-পত্রিকায় সপ্তাহে ২।৩ ঘণ্টা সময় স্বতন্ত্র রাখা যাইতে পারে। সেই সময় তাহারা শ্রেণীতে বসিয়া বা পুস্তকাগারে গিয়া যে বিষয়ে তাহাদের বিশেষ অনুরাগ বা অভাব আছে তাহা পাঠ করিতে পারে। শ্রেণী-পাঠনার অনুপূরকভাবে ডল্টন প্রণালী, কার্যসমস্যা-প্রণালী প্রভৃতি অনুযায়ী শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করিলে পূর্বোক্ত দোষের প্রতিকার হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছাত্রদের সহযোগিতা

বিদ্যালয় সুপরিচালনার জন্য প্রধান-শিক্ষকের পক্ষে যে কেবল সহকারী শিক্ষকগণের সহযোগিতালাভের প্রয়োজন তাহা নহে, ছাত্রগণের সহযোগিতা-লাভের প্রয়োজনও কম নহে। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যত নিয়মব্যবস্থাই করা হউক না, বা শিক্ষকগণ যতই চেষ্টা করুন না, ছাত্রগণেরও আন্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন তাঁহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হইতে পারে না। প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের নিয়মব্যবস্থা বিনা আপত্তিতে মানিয়া চলিয়া এবং আগ্রহের সহিত শিক্ষকের নির্দেশমত কাজ করিয়াই ছাত্রগণ শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে। এই সহযোগিতা লাভের জন্য ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সকল সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকেই সংঘের নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের নিয়মব্যবস্থাও তাহাদের বিনা আপত্তিতে মানিয়া চলা উচিত। অপর দিকে তাহাদিগকে ইহাও বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, শিক্ষকগণকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াই অভিভাবকগণ তাঁহাদের উপর তাহাদিগকে শিক্ষা-দানের ভার দিয়াছেন এবং ছাত্রগণ আগ্রহের সহিত তাঁহাদের নির্দেশমত কাজ করিলেই শিক্ষকগণ তাহাদিগকে ঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারেন বা গড়িয়া তুলিতে পারেন। সর্বোপরি ছাত্রগণকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে যে, শিক্ষকগণ তাহা-দিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন ও তাহাদের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু কেবল মুখে বার বার বলিলেই ইহা ছাত্রগণ হৃদয়ঙ্গম করিবে না, শিক্ষকগণকে নিজেদের কাজ ও ব্যবহারের দ্বারাই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে এবং ছাত্রদের হৃদয় জয় করিতে হইবে। যদি শিক্ষকগণ তাঁহাদের সততা, কর্তব্য-পরায়ণতা, পক্ষপাতশূন্যতা, শিক্ষাদান-কার্যে আগ্রহ এবং ছাত্রগণের প্রতি সহানুভূতির দ্বারাই তাঁহাদের হৃদয় জয় করিতে পারেন, তাহা হইলেই ছাত্রগণ তাঁহাদের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করিবে। বস্তুতঃ শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে হৃদয়ের

বন্ধন স্থাপিত না হইলে এবং ছাত্রগণ শিক্ষকদের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা না করিলে বিদ্যালয় সুপরিচালিত হইতে পারে না। ছাত্রগণের হৃদয়ে প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা জাগাইতে পারিলেও তাহারা জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষকগণের সহিত সহযোগিতা করিবে।

ইহা ছাড়া ছাত্রগণ কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা-কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়াও শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ছাত্রগণকে মনিটর, ক্যাপটেইন, প্রিফেক্ট ও বিভিন্ন ছাত্রসংঘের কর্মসচিব নিযুক্ত করিতে হয় এবং শিক্ষকদের নেতৃত্বে নানা কাজ করিবার ভার তাহাদের উপর দিতে হয়।

শ্রেণী-মনিটর

শ্রেণীশাসন-কার্যে শিক্ষককে সাহায্য করার জন্য বৎসরের প্রথমেই প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্য হইতে একজন মনিটর ও একজন সহকারী মনিটর নিযুক্ত করা ভাল। ইহারা উভয়েই ছাত্রগণকর্তৃক নির্বাচিত হইতে পারে বা প্রধান-শিক্ষককর্তৃক মনোনীতও হইতে পারে। বর্তমান গণতন্ত্রের দিনে শ্রেণী-ছাত্রগণকেই তাহাদের মনিটর ও সহকারী মনিটর নির্বাচন করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু কোন অনুপযুক্ত বা মন্দ চরিত্রের ছাত্র মনিটর বা সহকারী মনিটর নির্বাচিত হইলে শ্রেণী-শাসনের কিছুমাত্র সাহায্য না হইয়া বরং তাহাতে বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। তাই তাহাদের নির্বাচন প্রধান-শিক্ষকের অনুমোদন-সাপেক্ষ হওয়া বিধেয়। প্রয়োজন হইলে মনিটরকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও হেডমাষ্টারের হাতে রাখিতে হইবে। তবে প্রধান-শিক্ষক সহজে তাহাদের মতের বিরুদ্ধে কাজ না করিয়া যাহাতে উপযুক্ত ও চরিত্রবান্ ছাত্র মনিটর ও সহকারী মনিটর নির্বাচিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে পারেন। মনিটর নির্বাচনের পূর্বে হেডমাষ্টার বা শ্রেণীশিক্ষক মনিটরের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করিয়া এবং কিরূপ ছাত্র মনিটর পদের উপযুক্ত সেই সম্বন্ধে শ্রেণীর ছাত্রগণকে উপদেশ দিয়া ইঙ্গিতের সাহায্যে নিজের মনোমত ছাত্রকে মনিটর নির্বাচিত করাইতে পারেন। এমন কি, কোন ছাত্রকে যখন তিনি মনিটর পদের উপযুক্ত

মনে করেন তাহা ২।১ জন ভাল ছাত্রকে বিশ্বাস করিয়া বলিয়া তাহাদের দ্বারা শ্রেণীর অন্য ছাত্রের মত প্রভাবিত করিতেও পারেন।

মনিটরের কর্তব্য

মনিটরকে একদিকে শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে, অন্য দিকে ছাত্রের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে হয়। শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে তাহাকে শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে সাহায্য করিতে হইবে, শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শ্রেণীতে যেন কোন গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, শ্রেণীর কোন ছাত্র যেন অন্য কোন ছাত্রের প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করে বা শ্রেণীর ছাত্রগণের মধ্যে যেন কোন দলাদলির সৃষ্টি না হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; শ্রেণীর ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিতে চাহিলে তাহাতে বাধা দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সর্বদা শিক্ষকের নির্দেশমত কাজ করিবার জন্য প্রবর্তিত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া কেহ যেন শ্রেণীর কোন আসবাবপত্র নষ্ট না করে তাহার প্রতিও তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার সময়ে কিছুমাত্র কর্তৃত্বের ভাব না দেখাইয়া তাহাকে ছাত্রদের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও নেতাভাবেই কাজ করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় তাহার দ্বারা পরিচালিত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষকের ন্যায় মনিটরকেও কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে।

অপরদিকে ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে মনিটরকে শ্রেণীর অভাব-অভিযোগ শ্রেণী-শিক্ষক ও প্রধান-শিক্ষককে জানাইতে হইবে; শ্রেণীর কোন আসবাবপত্রের অভাব হইলে প্রধান-শিক্ষককে বলিয়া তাহা পূরণ করার চেষ্টা করিতে হইবে; শ্রেণীর সম্মান রক্ষার কাজ ও শ্রেণীর ন্যায্য অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতে হইবে। বস্তুতঃ ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য মনিটর সর্বদা চেষ্টিত থাকিলেই শ্রেণীর ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় তাহার নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে।

মনিটরদের সভা

শিক্ষকদের সভার ন্যায় প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মনিটরদের একটা সভা থাকা দরকার। প্রধান-শিক্ষকই ইহার সভাপতি হইবেন। প্রত্যেক বৎসর সকল শ্রেণীর মনিটর ও সহকারী মনিটর নির্বাচিত হওয়ার পরই মনিটরদের প্রথম সভা আহ্বান করিতে হইবে। এই সভায় প্রধান-শিক্ষক মনিটরগণকে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। তাহার পর প্রত্যেক মাসে একবার মনিটরদের সভা আহ্বান করা উচিত। এই সভায় প্রথমে মনিটরগণ তাহাদের নিজ নিজ শ্রেণীর ছাত্রদের কাজ, ব্যবহার, অভাব-অসুবিধা প্রভৃতি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু থাকিলে তাহা বর্ণনা করিবে এবং প্রধান-শিক্ষক সমস্ত মনিটরের বক্তব্য শুনিয়া প্রয়োজনমত উপদেশ দিবেন। ইহা ছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা বা কোন দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব হইতে দেখিলে মনিটরদের তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ও তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতে পারেন। বস্তুতঃ মনিটরগণকে বিদ্যালয় পরিচালনা-কার্যে শিক্ষকের সহকারী কর্মচারী হিসাবে ব্যবহার করিলে এবং তাহাদিগকে সেভাবে কাজ করিবার জন্য উৎসাহ দিলে তাহাদের দ্বারাই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে সহজে ঠিকপথে পরিচালিত করা যায়।

মনিটর ছাড়া বিদ্যালয়ে আরও অনেক ছাত্র-কর্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। যথা,—খেলার ব্যবস্থার জন্য কেপটেইন নিযুক্ত করিতে হয়। বিদ্যালয়ে সাহিত্য-সভা, স্বেচ্ছাসেবক-সংঘ, ব্রতচারী-সংঘ, স্কাউট-সংঘ, দরিদ্র সাহায্য-ভাণ্ডার, আমোদ-প্রমোদসংঘ (Symposium) ও স্কুল মেগাজিন প্রভৃতি প্রত্যেকটির জন্যও একজন বা দুইজন ছাত্র-কর্মসচিব নিযুক্ত করিতে হয়। ইহা ছাড়া কতকগুলি ছাত্রের উপর বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, স্কুল-বাগানের উন্নতি সাধন, জলখাবারের ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজের ভার দেওয়া যায়। বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ে সামাজিক জীবনের সমস্ত কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে। তাহার জন্য বিদ্যালয়ের মধ্যে পোষ্ট অফিস, সমবায় ভাণ্ডার, শিল্পাগার, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি স্থাপন করা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা হইলে তাহাদের পরিচালনার জন্যও অনেক ছাত্র-কর্মচারী নিযুক্ত করার প্রয়োজন হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার ও তাহার ব্যবহার

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটা ভাল পুস্তকাগার থাকা একান্ত প্রয়োজন। ইহাকে বিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ বলা যায়। কারণ কেবল শ্রেণীপাঠ্য-পুস্তক পড়িয়া বা শিক্ষক-প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করিয়া কোন বিষয়ে ছাত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তাহার জ্ঞান-বিস্তারের জন্য সেই বিষয়ে আরও পুস্তক পাঠ করা দরকার। বস্তুতঃ স্কুল-কলেজে কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানদান অপেক্ষা সেই বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভের আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাই বেশী। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের জ্ঞানতৃষ্ণা তৃপ্তিরও সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়ে ভাল পুস্তকাগার থাকিলেই ছাত্রগণ তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার সুযোগ পাইতে পারে। স্কুল-কলেজে পড়িবার সময়ে পুস্তকাগারের পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানার্জনের অভ্যাস হইলেই ছাত্রগণ পাঠ্য জীবনের পরেও স্বচেষ্টায় জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়াস পাইতে পারে। অপর দিকে শিক্ষকদের জন্যও পুস্তকাগারের প্রয়োজনীয়তা কম নহে। কেবল পাঠ্য-পুস্তক পড়িয়া কোন শিক্ষকই ভাল পাঠ দিতে পারেন না। পাঠ্য জীবনে তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে উচ্চজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই পরে যে সে-সকল বিষয় সম্বন্ধে আর কোন বই পড়িবার প্রয়োজন নাই তাহা নহে। ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, জ্ঞান-স্রোত কখনও নিশ্চল থাকে না। আজ যাহা কোন বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে কিছুকাল পরে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে এবং নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। জ্ঞানের এই ক্রমবিকাশের সহিত মিল রাখিয়া না চলিলে শিক্ষকগণ জ্ঞানক্ষেত্রে পিছনে পড়িয়া যাইবেন এবং দক্ষতার সহিত নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইবেন। তাই প্রকৃত শিক্ষককে আজীবন ছাত্র থাকিতে হয়। বিদ্যালয়ে ভাল পুস্তকাগার থাকিলেই শিক্ষকগণ পূর্বলব্ধ জ্ঞান-স্মৃতি জাগ্রত রাখিবার ও নূতন নূতন জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাইতে পারেন।

পুস্তক নির্বাচন

পুস্তকাগারের জন্য পুস্তক নির্বাচন একটা কঠিন কাজ। কারণ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন মানসিক স্তরের ছাত্র থাকে এবং বিভিন্ন পরিমাণ শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষকও থাকেন। ভাল স্কুল লাইব্রেরীতে এই সমস্ত স্তরের ছাত্র ও শিক্ষকের পাঠোপযোগী পুস্তক রাখিতে হয়। একদিকে ইহাতে সকল বিষয়ের শিশুপাঠ্য ও যুবক-পাঠ্য পুস্তক রাখিতে হইবে, অপরদিকে শিক্ষকগণের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের Reference পুস্তক রাখিতে হইবে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে খুব সতর্কতার সহিত শিশু বা অল্প-বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য পুস্তক নির্বাচন করিতে হয়। স্কুল পুস্তকাগারে একটি দুর্নীতিমূলক পুস্তক থাকিলে তাহার প্রভাবে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রী কুপথে পরিচালিত হইতে পারে। Reference পুস্তক নির্বাচনও কম কঠিন নহে। কারণ তাহাদের সংখ্যা ও মূল্য এত বেশী যে না দেখিয়া কোন Reference পুস্তক নির্বাচন করা যায় না। যে সকল শিক্ষক যে যে বিষয় শিক্ষা দেন তাঁহাদিগকে সেই সেই বিষয়ের পুস্তক নির্বাচন করিতে দেওয়া ভাল। তাঁহারা যে যে পুস্তক পছন্দ করেন তাহা লিখিয়া দেওয়ার জন্য একটা খাতা রাখা উচিত। তাহা দেখিয়া বিষয়-শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিষয়ের পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। এই সমস্ত তালিকা দেখিয়া প্রধান-শিক্ষকই শেষ নির্বাচন করিবেন।

পুস্তকাগার পরিচালক কর্মচারী (Librarian)

পুস্তকাগার পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ের কোন স্বতন্ত্র কর্মচারী বা লাইব্রেরিয়ান্ থাকে না। সাধারণতঃ একজন শিক্ষকের উপর লাইব্রেরী পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু একজন শিক্ষকের পক্ষে এই বোঝা খুব ভারী হয়। তাঁহার বোঝা হাল্কা করিবার জন্য ২টী ব্যবস্থা করা যায়। প্রথমতঃ লাইব্রেরীর বিভিন্ন বিষয়-শাখা পরিচালনার ভার বিভিন্ন বিষয়-শিক্ষকের উপর দেওয়া যায়। ইহাতে এই সুবিধা হয় যে, বিষয়-শিক্ষক তাঁহার বিষয়-সম্বন্ধীয় পুস্তক ব্যবহারের অধিকতর সুযোগ পান এবং ভাল ভাল পুস্তক কিনিয়া তাঁহার শাখার উন্নতিসাধন করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য

কতকগুলি পুস্তক শ্রেণী-কামরায় একটা আলমারীতে রাখা যাইতে পারে। উচ্চ শ্রেণীতে মনিটর বা অন্য কোন ছাত্রের উপর এই শ্রেণী-লাইব্রেরীর বই ধার দেওয়ার ভার দেওয়া যাইতে পারে। নিম্ন শ্রেণীতে শ্রেণী-শিক্ষককেই ইহার ভার লইতে হয়। ইহাতে আরও সুবিধা এই যে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী পুস্তক বিভিন্ন শ্রেণীতে দেওয়া যায় এবং ছাত্রেরা পুস্তকাগারের পুস্তক পড়িবার জন্য অধিকতর উৎসাহিত হয়। একমাস বা দুইমাস পর পর শ্রেণী-লাইব্রেরীর বইগুলি পাল্টাইয়া দিতে হয়। পুস্তকাগারের জন্য নিম্নলিখিত খাতাপত্র রাখিতে হয়। যথা,—

(১) পুস্তক জমা বই (Stock Register);

(২) শ্রেণী-বিভাগযুক্ত পুস্তক-তালিকা (Classified Catalogue);

(৩) শ্রেণী-লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা বই; ইহা শ্রেণী-বিভাগযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই;

(৪) শিক্ষককে পুস্তক ধার দেওয়ার বই (Teachers' Book Issue Register)।

(৫) ছাত্রদের পুস্তক ধার দেওয়ার বই (Students' Book Issue Register);

(৬) পুস্তকাগারের জমাখরচ বই (Account Book)।

পুস্তকাগারের পুস্তক পড়িবার জন্য উৎসাহ দান

অনেক বিদ্যালয়ের বহু আলমারীপূর্ণ ভাল ভাল পুস্তক থাকিলেও তাহাদের যথেষ্ট ব্যবহার হয় না। ছাত্র ও শিক্ষকগণ পুস্তকাগারের যথেষ্ট পুস্তক পাঠ না করিলে পুস্তকাগারের কোন মূল্যই থাকে না। ছাত্রদিগকে পুস্তকাগারের পুস্তক পড়িতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। যথা—

(১) প্রত্যেক শ্রেণীর সময়-পত্রিকায় সপ্তাহে ২।১ ঘণ্টা পুস্তকাগারে গিয়া পুস্তক পড়িবার জন্য নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

(২) প্রত্যেক বিষয়-শিক্ষক তাঁহার বিষয় সম্বন্ধে কি কি পুস্তক পড়া উচিত সে-সম্বন্ধে ছাত্রদের উপদেশ দিতে পারেন। তিনি পাঠ দেওয়ার সময় ভাল ভাল বইয়ের উল্লেখ করিয়া তাহাপাঠ করিবার জন্য ছাত্রদের আগ্রহ জাগাইতে পারেন।

(৩) শ্রেণী-লাইব্রেরীতে পুস্তক রাখিয়া কোন ছাত্রকে পুস্তক ধার দেওয়ার ভার দিলে ছাত্রেরা সহজে পুস্তক পাইতে পারে ও অধিকতর সংখ্যক পুস্তক পড়িতে উৎসাহিত হয়।

(৪) পুস্তক-বিক্রেতারা তাহাদের পুস্তক-তালিকায় বা বিজ্ঞাপনে পুস্তকের যে বর্ণনা দেয় বা পত্রিকায় পুস্তকের যে সমালোচনা বাহির হয় তাহা সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগারের টেবিলে রাখিলে তাহা পড়িয়া ছাত্রগণ পুস্তকগুলি পড়িতে উৎসাহিত হইবে। শিক্ষকগণ নিজেও তাহাতে কোন কোন পুস্তক সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া রাখিতে পারেন।

(৫) অধীত পুস্তকের সংখ্যানুযায়ী নম্বর দেওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা বেশী পুস্তক পড়ার জন্য কয়েকটি পুরস্কার দেওয়ারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তবে ইহার জন্য নম্বর বা পুরস্কার দিতে হইলে কোন কোন পুস্তক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া পুস্তকগুলি প্রকৃত পাঠ করিয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যে একটা পুস্তক না পড়িয়াও মিথ্যা দাবী করিতেছে প্রমাণিত হইলে সম্পূর্ণ নম্বর বা পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

খেলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা

স্কুলের ছাত্রদের খেলা ও ব্যায়ামের সুবন্দোবস্ত করাও স্কুল পরিচালনার এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। বিশেষতঃ খেলা করা বালক-বালিকাদের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং তাহাদের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির যথেষ্ট ব্যবহারের সুযোগ না দিলে তাহাদের শারীরিক বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। এবং তাহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে।

১। খেলার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা—শিশুদের পক্ষে খেলাই তাহাদের কর্ম-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। বালক-বালিকাদের জন্য খেলাই তাহাদের অতিরিক্ত কর্ম-শক্তির (Superfluous Energy) ব্যবহারের

স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক উপায়। যুবক-যুবতীদের পক্ষে খেলা কঠোর সাংসারিক জীবনে একটা আনন্দদায়ক পরিবর্তন।

(ক) **স্বাস্থ্যরক্ষা ও শারীরিক বিকাশ**। শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা ও শারীরিক বিকাশের জন্য খেলা একান্ত প্রয়োজনীয়। জন্মের পর অল্প সময়ের মধ্যে শিশু হাতপা নাড়িয়া খেলিতে আরম্ভ করে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই স্বাভাবিক অঙ্গ-সঞ্চালন প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, এবং ইহার দ্বারাই তাহার দ্রুত শারীরিক বিকাশ হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সময়ে শিশু ও বালক-বালিকাদের পক্ষে খেলা আরও বেশী প্রয়োজনীয়। কেননা, অনেকক্ষণ শ্রেণী-কক্ষে মানসিক কাজে নিযুক্ত থাকার পর, মুক্ত বাতাসে যথেষ্ট অঙ্গ-সঞ্চালনের ব্যবস্থা না করিলে তাহাদের মানসিক অবসাদ দূর হয় না। বস্তুতঃ কোন প্রকার খেলা বা ব্যায়াম না করিয়া দীর্ঘকাল মানসিক কাজে নিযুক্ত থাকিলে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়া অনিবার্য।

(খ) **আনন্দ উপভোগ**। খেলা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য এই যে কোন উদ্দেশ্য-সাধন বা অভাব দূর করিবার জন্য লোকে কাজ করে, প্রধানতঃ আনন্দ লাভের জন্যই লোকে খেলা করে। ইহার ফলে শারীরিক উন্নতি হইলেও তাহার জন্যই তাহারা খেলা করে না। সুতরাং কোন খেলার বন্দোবস্ত করিবার সময়ে দেখিতে হইবে যে তাহা প্রকৃত আনন্দদায়ক কিনা।

(গ) **নেতৃত্ব ও নিয়ম মানিয়া কাজ করার অভ্যাস গঠন**। সৈনিকের ন্যায় নেতার আদেশে পরিচালিত হইবার এবং কড়াকড়িভাবে নিয়ম মানিয়া কাজ করিবার অভ্যাস গঠন খেলার বড় শিক্ষা এবং ইহা ছাত্রগণকে ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতিলাভে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই জন্যই বলা হয়, ওয়েলিংটন রাগবী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন। সুতরাং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ছাত্রগণ কোন নেতার অধীনে নিয়ম মানিয়া খেলিতেছে কিনা, তাহা না করিলে তাহারা খেলায় প্রকৃত উপকার লাভ করিবে না।

(ঘ) **সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা শিক্ষা**। স্বপক্ষীয় খেলোয়াড়-গণের সহিত সহযোগিতা না করিয়া স্বার্থপর খেলা খেলিলে খেলায় জয়লাভ

করাও যায় না, প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভও হয় না। অপরদিকে প্রতিপক্ষের সহিত যথাশক্তি প্রতিযোগিতা করিয়া না খেলিলে খেলা আনন্দজনক হইবে না, এবং তাহার দ্বারা যথেষ্ট পরিশ্রম ও প্রয়োজনীয় শারীরিক উন্নতি হইবে না।

(ঙ) **খেলোয়াড়ের প্রকৃত মনোভাব** (Sportsmanship) **শিক্ষা**। সর্বোপরি খেলোয়াড়ের প্রকৃত মনোভাব অর্জনই খেলার সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা। খেলায় জয়লাভের যথাশক্তি চেষ্টা করা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাহার জন্য অধীর না হইয়া ও পরাজয়ে হতাশ না হইয়া, প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া এবং জয়লাভের জন্য কোন প্রকার অসদুপায় অবলম্বন না করিয়া খেলা করিতে প্রস্তুত হওয়াই প্রকৃত খেলোয়াড়ের মনোভাব। ইহার অভাবে খেলার অর্ধেক আনন্দ ও উপকারিতা নষ্ট হয়। সুতরাং ছাত্রগণ খেলোয়াড়ের প্রকৃত মনোভাব লইয়া খেলিতেছে কিনা তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

২। **খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার**। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য একটি যথেষ্ট বড় খেলার মাঠ না থাকিলে এতগুলি ছাত্রের জন্য খেলার বন্দোবস্ত করা কঠিন। ইহার অতিরিক্ত একটা ব্যায়ামাগার থাকিলে বর্ষাকালেও খেলার বা ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করার সুবিধা হয়। টীনের বা খড়ের ছাউনীযুক্ত একটা বড় খোলা ঘর তৈয়ার করিলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং ইহাতে বেশী খরচও হয় না।

৩। **ব্যায়াম-শিক্ষক**। খেলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থার ভার নেওয়ার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে একজন ব্যায়াম-শিক্ষক না থাকিলে কিছুতেই চলে না। বরং তাঁহার পক্ষে একা এতগুলি শ্রেণীর ছাত্রদের খেলা ও ব্যায়ামের তত্ত্বাবধান করা কঠিন হয়। অন্যান্য যুবক-শিক্ষকদেরও তাঁহাকে এই কার্যে সাহায্য করিতে দেওয়া প্রয়োজন হয়। মধ্য-বাংলা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র ব্যায়াম-শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। সেই সকল বিদ্যালয়ে একজন বা দুইজন শিক্ষককে ব্যায়াম শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ট্রেইনিং দেওয়া যাইতে পারে।

৪। **ক্যাপটেইন ও এ্যাসিষ্টেণ্ট ক্যাপটেইন নিয়োগ।** অন্য শিক্ষকের সাহায্য লইয়াও ব্যায়াম-শিক্ষক সকল সময় সমস্ত খেলার তত্ত্বাবধানের বন্দোবস্ত করিতে পারেন না। তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য ছাত্রদের মধ্য হইতে একজন ক্যাপটেইন ও একজন এ্যাসিষ্টেণ্ট ক্যাপটেইনও নির্বাচন করিতে হয়। বিভিন্ন খেলার জন্য এক এক জন স্বতন্ত্র ক্যাপটেইন ও এ্যাসিষ্টেণ্ট ক্যাপটেইন নির্বাচন করিলে ভাল হয়। কেননা, প্রত্যেক খেলার সময় ছাত্রগণকে কাহারও নেতৃত্বাধীন রাখা প্রয়োজন। তাহা না হইলে তাহারা নিয়মানুযায়ী খেলে না এবং পরস্পরের সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়।

৫। **খেলা ও ব্যায়াম** (Gymnastics)। খেলা যেরূপ **আনন্দদায়ক** ব্যায়াম সেরূপ আনন্দদায়ক নহে; সেইজন্য শিশু খেলিতে চাহে, ব্যায়াম করিতে চাহে না। অনেক ছেলে একসঙ্গে খেলা করিতে পারে বলিয়াও ইহা বেশী আনন্দদায়ক হয়, ব্যায়াম সাধারণতঃ ব্যক্তিগতভাবেই করিতে হয়। খেলায় কাহারও নেতৃত্বে চলিতে হয় এবং নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী কাজ করিতে হয় বলিয়া উহা ব্যায়াম হইতে বেশী **শিক্ষাপ্রদ**। খেলার ন্যায় ব্যায়াম করার সময়ে সহযোগিতার ও দলগত প্রতিযোগিতার সুযোগ পাওয়া যায় না। ইহাতে কেবল ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাই হইতে পারে। খেলায় শরীর-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে **মানসিক শক্তিরও যথেষ্ট ব্যবহার** হয়। ব্যায়ামের দ্বারা সাধারণতঃ কেবল শরীর-চর্চা হয়। খেলায় যেরূপ **সামাজিকতা শিক্ষা হয়,** ব্যায়ামের দ্বারা তাহা হয় না। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের পক্ষে খেলাই বেশী উপযোগী। খেলার একমাত্র দোষ এই যে ইহাতে **সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমান ব্যবহার হয় না**; কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতিরিক্ত ব্যবহার হইতে পারে এবং অন্য কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আদৌ ব্যবহার না হইতে পারে। সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যায়াম করা যায় এবং ইহা দ্বারা শরীরের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে। খেলা ও ব্যায়ামের মধ্যে ইহাই প্রধান পার্থক্য। **খেলার এই অভাব পূরণের জন্য অনুরূপভাবে ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।** কিন্তু অল্প বয়সে কঠিন ব্যায়াম করিলে মাংসপেশীগুলি

শক্ত হইয়া যায় এবং শরীরের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ১৩।১৪ বৎসরের কম ছেলের পক্ষে কঠিন ব্যায়াম উপযোগী নহে। তবে তাহারা সহজ সহজ ড্রিল করিয়া সমস্ত অঙ্গের ব্যবহার করিতে পারে অপর দিকে ১৪।১৫ বৎসরের পর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার হয় এরূপ যথেষ্ট ব্যায়াম করিতে শিক্ষা না দিলে তাহাদের শরীর সুগঠিত হইবে না।

৬। **বিভিন্ন প্রকারের খেলা ও ব্যায়াম**। বিদেশী খেলাগুলি বেশী **ব্যয়সাধ্য** বলিয়া কেহ কেহ সেগুলি আমাদের বিদ্যালয়ের প্রচলনের বিরোধী; বোধ হয় বিদেশী বলিয়াও তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহারা বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন। কিন্তু কোন্ খেলা **বেশী আনন্দদায়ক** ও **শিক্ষাপ্রদ** এবং কোন্ খেলার দ্বারা ছাত্রদের বেশী শারীরিক উন্নতি হইতে পারে, এই বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়াই ছাত্রদের জন্য খেলা নির্বাচন করা উচিত। বিদেশী খেলাগুলি একটু ব্যয়সাধ্য হইলেও বেশী আনন্দদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ। শিক্ষাক্ষেত্রে কোন জিনিষ বিদেশী বলিয়া পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত নহে, শিক্ষাপ্রদ ও উপযোগী হইলে তাহা গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং আমাদের দেশে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, বাস্কেটবল, ভলিবল প্রভৃতি বিদেশী খেলারও বহুল প্রচলন বাঞ্ছনীয়; অপর দিকে দেশীয় অনেক খেলাও বেশ আনন্দদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ। যথা, হাডুডু, দাঁড়িবাঁধা ইত্যাদি। বিশেষতঃ সেগুলি অল্পব্যয়সাধ্য; সুতরাং আমাদের বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাল ভাল খেলাগুলিরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বালিকাদের জন্য অল্প পরিশ্রমজনক খেলার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। বিদেশী খেলার মধ্যে ব্যাট্মিংটন ও টেনিস্ তাহাদের বিশেষ উপযোগী। বর্তমান সময়ে সকল বিষয়ে পুরুষদের সহিত পাল্লা দেওয়ার নেশায় মাতিয়া মেয়েরাও ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সেগুলি তাহাদের বিশেষ উপযোগী নহে। **নৃত্যই তাহাদের পক্ষে বেশী উপযোগী ও উপকারী**। খেলা এবং ব্যায়াম দুই আকারেই নৃত্যের ব্যবস্থা হইতে পারে, এবং তাহাই মেয়েদের শারীরিক বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট।

৭। **দৈনিক খেলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা**। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে প্রত্যেক দিন কোন না কোন খেলায় যোগ দিতে পারে বা কোন

ব্যায়াম করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বেশী হইলে এবং প্রয়োজনমত খেলার মাঠ না থাকিলে এই ব্যবস্থা করা একটা কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। নিম্নলিখিত উপায়ে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

(ক) বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে **সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন ড্রিল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত**। যাহারা যেদিন ড্রিল শিক্ষা করিবে তাহারা সেদিন কোন খেলায় যোগ না দিতে পারে।

(খ) **১৪।১৫ বৎসরের ঊর্ধ্ব-বয়স্ক ছাত্রদের** কয়েক দলে বিভক্ত করিয়া সপ্তাহে **৩ দিন** Gymnastics **শিক্ষা দেওয়া** যায়। সেই তিন দিন তাহারা কোন খেলায় যোগ দিবে না।

(গ) সাধারণতঃ ছাত্রগণ **পূর্ণ উদ্যমের সহিত খেলে না বলিয়া বেশীক্ষণ খেলিতে চাহে**। তাহাদের এই কু-অভ্যাস সংশোধন করিয়া একটানা খেলিতে দিলে তাহারা বেশীক্ষণ খেলিতে পারে না। ১২ বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক ছাত্রগণ ২০ মিনিট এবং ১৫।১৬ বৎসর বয়সের ছাত্রগণ ৩০ মিনিটকাল পূর্ণ উদ্যমের সহিত খেলিলে তাহাদের যথেষ্ট পরিশ্রম হয়।

(ঘ) অপরাহ্ণে তিনটার পর হইতে বিদ্যালয়ে খেলা আরম্ভ করা যায়। নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণকে ২০ মিনিট করিয়া খেলিতে দিলে এক ঘণ্টার মধ্যে ৩ দল ছাত্র এক এক খেলা খেলিতে পারে। একসঙ্গে ২।৩টি খেলার ব্যবস্থা করিলেও এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১৫০।২০০ ছাত্রকে খেলার সুযোগ দেওয়া যায়।

(ঙ) বিদ্যালয় ছুটির পর একই সঙ্গে বিভিন্ন খেলা আরম্ভ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর এক এক দল ছাত্রকে ৩০ মিনিট করিয়া খেলিতে দেওয়া যায়। তাহা হইলে এক ঘণ্টার মধ্যে ১ দল বা ৪৪ জন ছাত্র ফুটবল বা হকি খেলিতে পারে; ২ দল বা ২৪ জন ছাত্র ভলিবল খেলিতে পারে; ২ দল বা প্রায় ২৮ জন ছাত্র বাস্কেট বল খেলিতে পারে; ২ দল বা ৪০ জন ছাত্র হাডুডু খেলিতে পারে; এবং ২ দল বা প্রায় ৪০ জন ছাত্র দাঁড়িবাঁধা খেলিতে পারে। এইভাবে মাঠের পরিমাণানুযায়ী ও ছাত্রের সংখ্যানুযায়ী একসঙ্গে অনেক খেলার ব্যবস্থা করিয়া প্রায় সকল ছাত্রকে প্রত্যহ কোন না কোন খেলায় যোগদানের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে।

(চ) এক এক দল ছাত্রকে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া এক এক খেলা খেলিতে দিলে প্রত্যেক ছাত্র সপ্তাহে ৩ রকমের খেলা খেলিতে পারে। **নানা খেলা খেলিতে দেওয়ার প্রয়োজন এই যে, এক খেলায় যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার হয় না, অন্য খেলায় তাহাদের ব্যবহার হইতে পারে।** অবশ্য বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতার জন্য যে-সকল ছাত্রকে তৈয়ার করিতে হইবে তাহাদিগকে সপ্তাহে ৪।৫ দিন পর্যন্ত একই খেলা খেলিতে দিতে হইবে।

৮। **প্রতিযোগিতামূলক খেলা** ও Sports—বৎসরের বিভিন্ন ভাগে **বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতার** বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণী বা বিভিন্ন হাউসের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইতে পারে। ইহা ছাড়া বৎসরে অন্ততঃ **একবার** Sports-এর ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণ উৎসাহের সহিত খেলা ও ব্যায়ামের অংশ গ্রহণ করিবে।

৯। **হাউস সিষ্টেম** (House System)—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করা যায়। এই ব্যবস্থার অসুবিধা এই যে শ্রেণীর সকল ছাত্রের শারীরিক বিকাশ সমান না হইতে পারে বা সকলে খেলায় সমান পারদর্শী না হইতে পারে। সেইজন্য **সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে কয়েকটি হাউসে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন হাউসের মধ্যে প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করা ভাল।** প্রত্যেক হাউসের ছাত্রগণকে তাহাদের শারীরিক বিকাশ ও খেলায় পারদর্শিতা অনুযায়ী পুনঃ অনেকগুলি দলে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন হাউসের অনুরূপ দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যায়। এক এক হাউসের নামের সহিত এক একজন খ্যাতনামা লোকের নাম যোগ করিলে তাহার সদস্যদের মধ্যে বেশী উৎসাহের সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয়ের নোটীশ-বোর্ডের পার্শ্বে আর একটা বোর্ড স্থাপন করিয়া বিভিন্ন হাউসের মধ্যে বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতার ফলাফল লিখিয়া রাখিলে, তাহারা নিজ নিজ হাউসের সম্মান রক্ষার জন্য অধিকতর উৎসাহের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে।

নবম পরিচ্ছেদ

ছাত্রাবাস পরিচালনা

ছাত্রাবাস রাখার সুবিধা

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত এক একটা **ছাত্রাবাসও** থাকা ভাল। তাহা হইলে দূরবর্তী স্থানের ছাত্রগণও ছাত্রাবাসে থাকিয়া সে বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে। ছাত্রদের পড়াশুনা তত্ত্বাবধান করিবার অবসর বা যোগ্যতাও অনেক অভিভাবকের না থাকিতে পারে। ছাত্রাবাস থাকিলে তাঁহারা তাঁহাদের অধীনস্থ ছাত্রগণকে ছাত্রাবাসে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের দায়িত্ব শিক্ষকদের স্কন্ধে অপসারিত করিতে পারেন। সর্বোপরি ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ সম্পূর্ণভাবে শিক্ষকদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে এবং তাঁহারা তাহাদের উপর ২৪ ঘণ্টা দৃষ্টি রাখিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা ছাত্রাবাসের ছাত্রগণকে নিজ ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিতে পারেন এবং তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের অন্য ছাত্রদের সামনে আদর্শরূপে ধরিতে পারেন।

কিন্তু বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রাবাস রাখার যতটা প্রয়োজন তাহার দায়িত্ব ততোধিক। বাড়ীতে ছাত্রগণ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে থাকে, তাই গৃহে অবস্থানের সময়ে তাহাদের কুসংসর্গে পড়িবার সম্ভাবনা কম। ছাত্রাবাসের বাসিন্দাগণের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকে না। তাই তাহাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রভাব ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে, এবং তাহাদিগকে মন্দ প্রভাব হইতে মুক্ত রাখার দায়িত্ব শিক্ষকগণের স্কন্ধেই স্থাপিত হয়। বস্তুতঃ ছাত্রকে ছাত্রাবাসে পাঠাইয়া দিলে তাহার জন্য অভিভাবকের আর কিছুমাত্র দায়িত্ব থাকে না, তাহাদিগকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষকের উপর আসিয়া পড়ে। সুতরাং **সুপরিচালনার বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে বিদ্যালয়ের সহিত ছাত্রাবাস না রাখাই শ্রেয়**।

প্রধান-শিক্ষককে ছাত্রাবাস সুপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু তিনি ছাত্রাবাসের নিকট বাস না করিলে তাঁহার নির্দেশমত

ছাত্রাবাস পরিচালনার ভার একজন **সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট** ও এক জন বা বেশী **সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের** উপর দেওয়া যায়। প্রধান-শিক্ষককে খুব সতর্কতার সহিত উপযুক্ত শিক্ষকের মধ্য হইতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নির্বাচন করিতে হইবে। কেননা তাঁহাদের যোগ্যতা ও কর্তব্যপরায়ণতার উপর ছাত্রাবাস সুপরিচালনা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ইহার পর প্রধান-শিক্ষককে খুব যত্নের সহিত **ছাত্রাবাস পরিচালনার নিয়মাবলী** এবং **ছাত্রগণের সমস্ত দিনের কার্য-তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।** সর্বশেষ তাঁহাকে যত বেশী সম্ভব **ছাত্রাবাস পরিদর্শন** করিতে হইবে এবং তাঁহার নির্দেশমত কাজ হইতেছে কিনা দেখিতে হইবে।

ছাত্রাবাসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছাত্রাবাস সুপরিচালনার জন্য প্রধান-শিক্ষকের নিকট সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন। তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে অভিভাবকের সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধেই স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং ছাত্রদের খাওয়াপরা, চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত তাঁহাকে করিতে হইবে এবং ২৪ ঘণ্টা তাহাদের কাজ ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তিনি বা একজন সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সকাল-সন্ধ্যায় ছাত্রদের হাজিরা ডাকিবেন। তাঁহার এই গুরুতর দায়িত্বের সঙ্গে ছাত্রগণের উপর তাঁহাকে পূর্ণ কর্তৃত্বও দিতে হইবে, উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দিতে হইবে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সাহায্য করার জন্য ছাত্রাবাসের ছাত্রগণের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রিফেক্ট নির্বাচন করা যায়। ছাত্রাবাসের প্রত্যেক কামরায় একজন প্রিফেক্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। ছাত্রগণের খাওয়ার ব্যবস্থা করার ভার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সহ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ছাত্রদের কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটা কমিটির উপর দেওয়া ভাল। ইহা ছাড়া ইহার জন্য প্রত্যেক মাসে ছাত্রগণের মধ্য হইতে একজন বা দুইজন ম্যানেজার নিযুক্ত করাও প্রয়োজন। তাহারাই জমা-খরচের হিসাব রাখিবে। কিন্তু টাকাপয়সা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাতে জমা থাকিবে এবং তাঁহাকে সময় সময় খরচের হিসাব পরীক্ষা করিতে হইবে। ছাত্রাবাসের ছাত্রগণের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করাও

প্রয়োজন। তিনি ছাত্রাবাসের ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং প্রয়োজনমত চিকিৎসা করিবেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এ্যাসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও চিকিৎসকের বেতন ছাত্রগণের নিকট হইতেই আদায় করা যাইতে পারে।

ভাল আলো-বাতাসপূর্ণ স্বাস্থ্যকর স্থানে ছাত্রাবাস নির্মাণ করিতে হয়। অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের থাকার ঘর ছোট ছোট কামরায় বিভক্ত না হইয়া এক বা কয়েকটি বড় কামরার (Dormitory) আকারে নির্মিত হওয়া উচিত। ছাত্রগণের বাসের ঘরে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অন্ততঃ ২০ বর্গ ফুট মেঝে থাকা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া স্বতন্ত্র রোগীর কামরা, আপত্তিকর ছাত্রের বাসের কামরা (Rooms for Segregation of Boys of Objectionable Character) থাকা আবশ্যক। বড় ছাত্রাবাস হইলে একটা Common Roomও থাকা ভাল।

দশম পরিচ্ছেদ

শিক্ষক ও অভিভাবকের সহযোগিতা

শিক্ষক ও অভিভাবকের সহযোগিতার অভাবেই আমাদের বালক-বালিকাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হইতেছে না। ছাত্রগণ দিবসের কয়েক ঘণ্টা মাত্র শিক্ষকগণের সঙ্গে থাকে, অবশিষ্ট সময় তাহারা অভিভাবকদের সহিত অতিবাহিত করে। তাহা ছাড়া ছাত্রের সঙ্গে অভিভাবকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, সাধারণতঃ রক্তের সম্পর্ক থাকে। সুতরাং ছাত্রের উপর অভিভাবকের প্রভাব অনেক বেশী। শুধু তাহা নহে, ছাত্রকে অভিভাবক শিশুকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছেন, তাই ছাত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধেও শিক্ষক হইতে অভিভাবকের জ্ঞান বেশী। এই অবস্থায় অভিভাবকের সহযোগিতা না পাইলে শিক্ষক ছাত্রকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিতে পারেন না। ছাত্রের উপর শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রভাব যদি সম্পূর্ণ বিপরীত হয় বা তাঁহারা যদি ছাত্রকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালাইবার চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদের উভয়ের চেষ্টাই

ব্যর্থ হইবে এবং ছাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে। সুতরাং শিশুকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিলে শিক্ষক ও অভিভাবককে পরস্পরের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করিতে হইবে।

শিক্ষক ও অভিভাবকের মনোভাবের পরিবর্তন

শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা স্থাপন করিতে হইলে প্রথমে পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিতে হইবে। অনেক অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া এবং মাসে মাসে স্কুল-বেতন দিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করেন। তাহারা বিদ্যালয়ে কিরূপ লেখাপড়া করিতেছে বা ব্যবহার করিতেছে, সারা বৎসর সে-সম্বন্ধে কোন খোঁজ লইবার প্রয়োজন মনে করেন না। এমন কি ছাত্রের পাঠে অবহেলা বা অসন্তোষজনক ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে জানাইলেও তাঁহারা তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা করেন না। শুধু তাহা নহে, কোন কোন ধনী বা উচ্চপদস্থ অভিভাবক গরীব শিক্ষককে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন এবং শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করা বা সহযোগিতা করা তাঁহাদের পদমর্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করেন। এমন কি শিশুর সামনেই তাঁহারা শিক্ষক সম্বন্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য বা সমালোচনা করিতে ইতস্ততঃ করেন না। তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে তাঁহাদের এই কর্তব্যে অবহেলা বা আত্মাভিমানের ফলে শিক্ষক হইতে তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদেরই অধিক ক্ষতি হয়। কেননা ইহাতে ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব নষ্ট নয় এবং তাঁহার পক্ষে তাহাকে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অপর দিকে কোন কোন শিক্ষক মনে করেন যে ছাত্রদের সহিতই তাঁহাদের সম্পর্ক, অভিভাবকদের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং তাঁহারা অভিভাবকদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ছাত্রদিগকে নিজ ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে পারেন। তাঁহারা আরও মনে করেন যে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহারাই বিশেষজ্ঞ, অভিভাবকদের সে-সম্বন্ধে কিছুই বলার অধিকার নাই। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ছাত্রের উপর তাঁহাদের হইতে অভিভাবকদের প্রভাব বেশী এবং ছাত্রদের

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শিক্ষক হইতে তাঁহাদের দায়িত্বও বেশী। সুতরাং **তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া শিক্ষকগণ ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে পারেন না।**

শিক্ষক ও অভিভাবকের পরস্পরের প্রতি এইরূপ বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিবর্তন না হইলে শিশুকে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলার আশা সুদূর-পরাহত। অভিভাবককে মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষাদান একটা জটিল ও কঠিন কাজ এবং সেই কার্যে সফলতা অর্জনের জন্য বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। শিক্ষকের সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই শিক্ষকের উপর তাঁহারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার দিয়াছেন। সুতরাং রোগীর জন্য ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা না দেওয়ার ন্যায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ভার শিক্ষকের উপর দিয়া তাঁহার সহিত সহযোগিতা না করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ। অপরদিকে শিক্ষককেও মনে রাখিতে হইবে যে অভিভাবকের সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন তিনি শিশুকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিতে পারেন না। সুতরাং শিশুর শিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে শিক্ষক ও অভিভাবক **উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন এবং শিশুকে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলার কাজে উভয়ে উভয়ের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করিবেন।** শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে উভয়ের আদর্শ ও অভিপ্রায় উভয়কে জানাইতে হইবে, উভয়কে পরামর্শ করিয়া শিশুর জীবন-পথ নির্দিষ্ট করিতে হইবে এবং উভয়কে সহযোগিতা দ্বারা শিশুকে তাহার জীবনের গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইতে হইবে।

অভিভাবকের সহযোগিতা লাভের উপায়

(১) বিদ্যালয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা, বিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী, বিদ্যালয়ের আদর্শ, শিক্ষক ও অভিভাবকের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া একটা **প্রস্পেক্টাস্ (Prospectus) ছাপান যাইতে পারে** এবং প্রত্যেক ছাত্র ভর্তি হইবার সময়ে তাহার অভিভাবককে একটা Prospectus দেওয়া ভাল।

(২) অভিভাবকদের সহিত দেখা করিবার জন্য প্রধান-শিক্ষক একটা সময় নির্দিষ্ট করিতে পারেন এবং অভিভাবকদের তাহা জানাইয়া দিতে পারেন। শ্রেণী-শিক্ষক মাসে অন্ততঃ একবার ছাত্রের গৃহে গিয়া অভিভাবকের সহিত দেখা করিতে পারেন এবং ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন।

(৩) সময় সময় অভিভাবকগণকে বিদ্যালয়ে আসিয়া ছাত্রদের কাজ দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে।

(৪) বৎসরে অন্ততঃ একবার **অভিভাবকদের সভা** আহ্বান করা একান্ত আবশ্যক। সেই সভায় শিক্ষাদান সম্বন্ধে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে। পুরস্কার-বিতরণী সভায় অভিভাবকদের আহ্বান করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

(৫) বৎসরে অন্ততঃ ২।৩ বার অভিভাবকদের নিকট ছাত্রের **পাঠোন্নতির বিবরণ** পাঠাইতে হইবে। ইহাতে কেবল পরীক্ষার ফল লেখা থাকিলে চলিবে না, ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে শ্রেণী-শিক্ষক এবং প্রত্যেক বিষয়-শিক্ষকের মন্তব্য ও প্রস্তাব থাকা প্রয়োজন। অভিভাবক ইহাতে গৃহে শিশুর কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া ফেরৎ পাঠাইবেন।

(৬) যে-কোন সময় ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভাবকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কার্ড বা চিঠি ছাপা থাকিতে পারে এবং যখনই প্রয়োজন হয় তাহাতে আবশ্যকীয় বিষয় ও মন্তব্য লিখিয়া তাহা অভিভাবকের নিকট পাঠান যাইতে পারে।

(৭) কোন ছাত্রের কাজ বা ব্যবহার খুব অসন্তোষজনক হইলে বা কোন ছাত্র স্কুলে আসিবার ছলনা করিয়া স্কুল-সময় অন্যত্র অতিবাহিত করার প্রমাণ পাইলে তাহাকে কিছু সময়ের জন্য তাহার কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটা দিনলিপি (Diary) রাখিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। তাহাতে শিক্ষক ও অভিভাবক প্রত্যহ বিদ্যালয়ে ও গৃহে তাহার কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া দিবেন। অবশ্য খুব খারাপ ছাত্রের জন্য সাময়িকভাবেই এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় এবং তাহার সংশোধন হইলে ইহা বন্ধ করিতে হইবে।

(৮) **ছাত্রগণের মধ্য দিয়াও শিক্ষক ও অভিভাবকের সহযোগিতা হইতে পারে।** বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ, নিয়ম, ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে ছাত্রদের ভালরূপে বুঝাইয়া দিলে তাহারা তাহাদের অভিভাবকদের নিকট তাহা বর্ণনা করিবে। ইহার ফলে অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের কাজ, নিয়ম ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবগত থাকিবেন ও তদনুযায়ী ছাত্রকে চালাইয়া শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারিবেন।

অভিভাবকের কর্তব্য

শুধু শিক্ষক কর্তব্য করিলে এবং অভিভাবক নিরপেক্ষ দ্রষ্টা সাজিলে বা সমালোচনা করিলে সহযোগিতা হয় না। তাই শিশুর শিক্ষাদান-কার্যে শিক্ষকের সহিত সহযোগিতা করার জন্য অভিভাবকের কি কি করা কর্তব্য তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইল।

(১) অভিভাবককে দেখিতে হইবে যে তাঁহার অধীনস্থ ছাত্র প্রত্যেক দিন ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে যায় এবং ঠিক সময়ে বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসে। কেন না বিদ্যালয়ে নিয়ম-মত উপস্থিত না থাকার দরুণই অনেক ছেলে সন্তোষজনক পাঠোন্নতি করিতে অসমর্থ হয় এবং স্কুল সময়ের পূর্বে বা পরে খারাপ ছেলের সহিত মিশিয়াই অনেক ছেলে নষ্ট হয়।

(২) শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিয়া ছাত্রের জন্য **একটি দৈনিক কার্যতালিকা তৈয়ার করিতে পারেন এবং ছাত্রকে কঠোরতার সহিত তাহা অনুসরণ করাইতে পারেন।** তিনি নিজে বা পরিবারের যে-কোন লোককে গৃহে ছাত্রের কাজ ও ব্যবহারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ছাত্র ক্ষীণমেধা না হইলে বা সে কোন কারণে শ্রেণীর পিছনে পড়িয়া না গেলে গৃহশিক্ষক রাখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বিনা প্রয়োজনে গৃহশিক্ষক রাখিলে ছাত্রের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়। কেননা তাহা হইলে সে কখনও আত্মচেষ্টায় শিক্ষা করিতে পারে না এবং আত্মচেষ্টা ভিন্ন প্রকৃত শিক্ষা হয় না।

(৩) **স্কুলের বাহিরে ছাত্র যাহাতে কুসঙ্গে না পড়ে তাহার প্রতিও অভিভাবকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।** শিক্ষকগণকে স্কুলের বাহিরেও

ছাত্রের উপর দৃষ্টি রাখিতে বলিলে তাঁহাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত দাবী করা হয়। অভিভাবকেরই এই কাজ করা উচিত।

(৪) ছাত্রকে তাহার প্রয়োজনমত পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়াও অভিভাবকের একটা প্রধান কর্তব্য। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের বয়সেই ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। এই বয়সে পুষ্টিকর খাদ্য না পাইলে শিক্ষকের সর্বপ্রকার যত্ন সত্ত্বেও তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধা পাইবে। (শারীরিক শিক্ষার অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হইবে)।

(৫) **আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞান অর্জন করাও প্রত্যেক শিক্ষিত অভিভাবকের কর্তব্য।** তাহা হইলে তাঁহারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া বা তৈয়ার করার কঠিন কাজে শিক্ষকের সহিত ঠিকভাবে সহযোগিতা করিতে পারিবেন।

(৬) অবসর মত বিদ্যালয়ে গিয়া ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে খোঁজ করা এবং তাহাকে ঠিকভাবে পরিচালিত করা সম্বন্ধে শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করাও প্রত্যেক অভিভাবকের কর্তব্য।

(৭) সর্বশেষ **শিক্ষকের সহিত সম্মানজনক ব্যবহার করা** এবং ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব দৃঢ়তর করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করাও অভিভাবকের কর্তব্য। ছাত্রের সামনে অভিভাবক শিক্ষকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলে বা তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের ভক্তি থাকিবে না ও সে শিক্ষকের উপদেশমত কাজ করিবে না; শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিভাবকের কোন অভিযোগ থাকিলে প্রধান-শিক্ষক বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া তিনি তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু ছাত্রের সামনে শিক্ষকের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া ছাত্রের মনে শিক্ষকের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইতে পারেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন

(Corporate Life in School)

যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সকলে পরস্পরের সহিত স্নেহ-ভক্তি-ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না হয়, একসঙ্গে কাজ করিতে, একসঙ্গে আমোদ-উৎসব করিতে, একসঙ্গে খেলা করিতে, পরস্পরের সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে, বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের স্বার্থ ও সম্মানকে নিজের স্বার্থ ও সম্মান বলিয়া বিবেচনা করিতে না শিখে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাকে আদর্শ বিদ্যালয় বলা যায় না। বস্তুতঃ প্রকৃত বিদ্যালয় একটি দ্বিতীয় পরিবারে পরিণত হয়, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী-গণকে ছাত্রের পিতামাতার স্থান অধিকার করিতে হয় এবং ছাত্রগণকে পরস্পরকে বড় বা ছোট ভাইয়ের মত দেখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্কুল-জীবনটাকে আনন্দদায়ক করিবারও চেষ্টা করিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র-শিক্ষক সকলকে গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহাদের সামাজিক জীবন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

এইরূপ মনোভাব জাগাইবার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যায় :—

(১) পূর্ব বর্ণনানুযায়ী দলগত প্রতিযোগিতার জন্য ছাত্রগণকে লইয়া কতকগুলি House গঠন করিলে এইরূপ সামাজিক মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়।

(২) বিদ্যালয়ের **সমস্ত ছাত্রকে মিলিত হইয়া কতকগুলি কাজ করিতে দিলেও সংহতি-বোধ জাগে।** যথা—

(ক) **স্কুলের প্রারম্ভে ও শেষে প্রার্থনার** জন্য সকল ছাত্রের একস্থানে সমবেত হইবার ব্যবস্থা।

(খ) **দলবদ্ধ সঙ্গত বা আবৃত্তি** (Mass-Singing)

প্রতিদিন সমস্ত ছাত্র একত্রিত হইয়া সমস্বরে ধর্ম, নীতি বা দেশপ্রেম সম্বন্ধীয় কোন গান করিতে পারে বা কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে।

(গ) **দলবদ্ধ নৃত্য**। ব্রতচারী নৃত্যের ন্যায় দলবদ্ধ নৃত্যের ব্যবস্থা হইতে পারে।

(ঘ) **দলবদ্ধ ব্যায়াম** (Mass-Drill)। সমস্ত ছাত্র খেলার মাঠে সমবেত হইয়া একসঙ্গে Drill বা কোন ব্যায়াম করিতে পারে।

(ঙ) **পতাকা অভিনন্দন**। সকল ছাত্র সমবেত হইয়া বিদ্যালয়ের পতাকা ও জাতীয় পতাকাকে সম্মান দেখাইতে পারে।

(৩) বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের **এক প্রকার পোষাক** (Uniform) **ব্যবহার** করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহা সম্ভব না হইলে অন্ততঃ সকল ছাত্রকে **কোন প্রকার পরিচয়-চিহ্ন** (Badge) **ব্যবহার** করিতে দেওয়া যাইতে পারে। এমন কি শিক্ষকেরাও বিদ্যালয়ের কোন পরিচয়-চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারেন।

(৪) বৎসরের বিভিন্ন ভাগে **বিভিন্ন উৎসবের ব্যবস্থা** করিলেও বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন পুষ্ট হয়। যথা—

(ক) প্রত্যেক বৎসর বিদ্যালয়-স্থাপনের দিনে সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(খ) পুরস্কার-বিতরণী সভা আহ্বান এবং সমারোহের সহিত বৎসরে একবার পুরাতন ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করিয়া মিলনোৎসবের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(গ) মধ্যে মধ্যে সামাজিক মিলনের ব্যবস্থা করা যায়। সেই উপলক্ষে সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির আয়োজন হইতে পারে।

(৫) **সেবাসংঘ ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন**। আমোদ-উৎসবে সকলের অংশ গ্রহণ করা যেমন সামাজিক জীবনের অঙ্গ, তেমনি পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগরিত করিয়া আপদে বিপদে পরস্পরের সাহায্য করিতে এবং পরস্পরের অভাব পূরণের চেষ্টা করিতে শিক্ষা দিলেও বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে হৃদয়-বন্ধন স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের সেবা-সঙ্ঘ ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার গঠন করিয়া শিক্ষক ও ছাত্রগণকে এই সুযোগ দেওয়া যায়।

(৬) **অন্য বিদ্যালয়ের সহিত নানা বিষয়ের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা**। এক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রের সহিত কোন প্রতিযোগিতামূলক খেলা (Competitive Matches) খেলে, তখন বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্র তাহার বিদ্যালয়ের খেলোয়াড়-দলের সহিত সম্পূর্ণ এক বলিয়া অনুভব করে। সেরূপ আমোদ-উৎসব, সেবা, পরীক্ষায় কৃতকার্যতা প্রভৃতি বিষয়েও অন্য বিদ্যালয়ের সহিত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে সামাজিক মনোবৃত্তি জাগরিত হয়।

(৭) **শিক্ষক ও ছাত্রের সামনে বিদ্যালয় সম্বন্ধে উচ্চ আদর্শ স্থাপন** এবং তাহার জন্য সকলকে গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা-দান। বিদ্যালয়ের যাহা কিছু গৌরবের বিষয় আছে তাহা শিক্ষক ও ছাত্রের সামনে স্থাপন করিতে হইবে। যথা,—যে-সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি বা পুরস্কার লাভ করিয়াছে এবং যে-সকল পূর্বতন ছাত্র সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাদের তালিকা বিদ্যালয়ের সভাঘরের দেওয়ালে বা বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের পূর্বতন ছাত্রের মধ্যে যাঁহারা নানাক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া যশস্বী ও সম্মানার্হ হইয়াছেন তাঁহাদের ছবিও সভাগৃহের দেওয়ালে সাজাইয়া রাখা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া খেলা, ব্রতচারী, স্কাউট্ প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সাফল্যের বিবরণ একটা বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

অপরদিকে, সুযোগ হইলেই বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ ছাত্রদের সামনে ধরিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে সকলকে উৎসাহ দিতে হইবে। ছাত্রগণকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে তাহারা যেন তাহাদের বাক্যে, কার্যে ও ব্যবহারে বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখে। "এইরূপ কথা, কাজ বা ব্যবহার অমুক স্কুলের ছাত্রের উপযুক্ত নহে" এই কথা বলিয়াই তাহাদিগকে সাবধান করা যাইতে পারে। কেহ বিদ্যালয়ের বিশেষ সম্মান-হানিকর কোন কার্য করিলে তাহাকে কিছু সময়ের জন্য বিদ্যালয়ের পরিচয়-চিহ্ন ব্যবহারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করাও যাইতে পারে।

Reference

1. T. Raymont—Principles of Education, Chap. XIV.

2. P. Wren—Indian School Organisation, Chaps. I, XI, XV & XX.

3. A. H. Mackenzie—Instruction in Indian Secondary School, Chap. II.

4. Macnee—Instruction in Indian Secondary School, Chap. II.

5. J. Landon—The Principles and Practice of Teaching and Class-Management, Chaps. I and VII.

6. Valentine Davis—The Matter and Method of Modern Teaching. Chaps. I—VI.

চতুর্থ অধ্যায়

সুশাসন

(Discipline)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুশাসন কাহাকে বলে

সাধারণতঃ কোন বিদ্যালয়ে শাসন-শৃঙ্খলা বজায় থাকিলে, ছাত্রগণ কিছুমাত্র গোলমাল বা পরস্পরের সহিত ঝগড়া-বিবাদ না করিলে, সেই স্কুলে সুশাসন রক্ষিত হইতেছে বলা হয়।

কিন্তু **সুশাসনের অর্থ প্রাণহীন শান্তি নহে**। সুতরাং শাস্তির ভয়ে ছাত্রগণ চুপচাপ থাকিলেই বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষা হইয়াছে বলা যায় না। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় রাখা এক কথা নহে। ইহা শাস্তি-ভয়প্রসূত আজ্ঞানুবর্তিতাও নহে এবং সকল সময় নিষেধাত্মকও নহে। **বিদ্যালয়ে যে অবস্থা বা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইলে ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় ও তৎপরতার সহিত শিক্ষকদের আদেশ পালন করিতে ও তাঁহাদের উপদেশমত কাজ করিতে প্রস্তুত হয়, নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরস্পরের সহিত সংযত ও ন্যায্য ব্যবহার করিতে শিখে, আগ্রহের সহিত জ্ঞানার্জনে রত হয়, এবং সর্বোপরি স্বেচ্ছায় ও সতর্কতার সহিত বিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়ম-ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত হয়, তাহাকেই বিদ্যালয়ের সুশাসন বলে। সংক্ষেপে ইহাকে নিয়মানুবর্তিতা বলা যায়।** কারণ, ছাত্র-শিক্ষক সকলে নিয়মানুবর্তী হইলেই বিদ্যালয়ে পূর্ব-বর্ণিত অবস্থা বা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে এবং তাহার ফলে ছাত্রেরা শিক্ষকের আজ্ঞানুবর্তী হইবে, পরস্পরের সহিত ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবে ও আগ্রহের সহিত জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হইবে।

বিদ্যালয়ে সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা। বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র এক সঙ্গে শিক্ষালাভ করে। তাহারা যদি ঠিকভাবে পরস্পরের সহিত ব্যবহার না করে এবং কাহারও নির্দেশমত বা কোন নিয়মানুযায়ী কাজ না করে তবে বিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকিবে না। এমন কি, বিশেষ কোন মন্দ কাজ না করিয়াও তাহারা যদি এক একজন এক এক ভাবে চলে তাহা হইলেও ঘোরতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। বিদ্যালয়ে সুশাসনের অভাব হইলে শিক্ষক সফলতার সহিত পাঠ দিতে পারিবেন না, ছাত্র পাঠে মনোযোগ দিতে পারিবে না, বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণের মধ্যে সহযোগিতা হইবে না, ছাত্রগণ শিক্ষকদের নির্দেশমত জ্ঞানার্জনে রত হইবে না, যাহার যখন যাহা খুসী সে তখন তাহা করিবে এবং ফলে সমস্ত বিদ্যালয়ে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। **সুতরাং বিদ্যালয়ের সুশাসন বজায় না থাকিলে বিদ্যালয় সুপরিচালনা বা বিদ্যালয়ে সুশিক্ষাদান কিছুতেই সম্ভব হইবে না।**

অপরদিকে **শিশুর চরিত্রগঠনের জন্যও সুশাসনের প্রয়োজন কম নহে।** শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিও অত্যন্ত প্রবল, তাহার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল এবং তাহার ভালমন্দ বিচারশক্তিও নাই। সুতরাং তাহাকে শিক্ষকের নির্দেশমত বা বিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী চলিতে বাধ্য না করিলে সে ঠিকভাবে চলিতে ও ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইবে না এবং তাহার চরিত্র গঠিত হইবে না।

ইহা ছাড়া সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা ভিন্ন কোন বড় কাজ করা সম্ভব নহে। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে হইলে সকলকে কাহারও নেতৃত্বাধীনে চলিতে হয়, সৈনিকের ন্যায় কঠোরতার সহিত নিয়মপালন করিয়া নিজ নিজ কর্তব্য করিতে হয়। সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রথমে আদেশ পালন করিতে না শিখিলে আদেশ দানের ক্ষমতা লাভ করা যায় না। সুতরাং **বাল্য জীবনে নিয়মানুগামিতা শিক্ষা না হইলে, ছাত্রগণ ভবিষ্যৎ জীবনে কাহারও নেতৃত্বাধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারিবে না।** বস্তুতঃ একমাত্র সুশাসনের অভাবেই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই

বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত উপযুক্ততা থাকা সত্ত্বেও সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার অভাবে জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। জাতীয় জীবনের এই অভাব পূরণ করিয়া জাতিকে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর করিতে হইলে আমাদের বিদ্যালয়সমূহের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং বাল্যকাল হইতেই ছাত্রগণকে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দিতে হইবে।

বিদ্যালয়-শাসন সম্বন্ধে প্রাচীন ও বর্তমান ধারণা

সেকালে বিদ্যালয়সমূহে দমন-নীতির প্রচলন ছিল। বেত্রই বিদ্যালয়-শাসনের প্রধান যন্ত্র ছিল এবং তাহা মুক্তহস্তে ব্যবহার করা হইত। প্রবাদ ছিল যে "বেত্রের ব্যবহারে কার্পণ্য করিলে শিশুকে নষ্ট করা হয়।" (Spare the rod and spoil the child)। "ছাত্রের কান তাহার পিঠের উপর, তাহার পৃষ্ঠে ঘা না দিলে সে শুনে না" (A boy's ear is on his back ; he does not listen if his back is not touched)।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ইউরোপে বিদ্যালয়ের এই দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণ শিশুকে অধিকতর সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে থাকেন এবং বেত্রের ব্যবহার না করিয়া অন্য উপায়ে শিশুকে পরিচালিত করিবার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তখন **ছাত্রের উপর শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং বিদ্যালয়ে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াই ছাত্রকে নিয়মানুবর্তী করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়।** অবশ্য বিদ্যালয় হইতে বেত্রকে একেবারে বিদায় দেওয়া হয় না, কিন্তু ইহার ব্যবহার যতদূর সম্ভব কম করিবার চেষ্টা হয়। ইংলণ্ডে Rugby বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার Dr. Arnold এই মতবাদীদের আদর্শ ছিলেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যালয়ে সুশাসন সম্বন্ধে এই নীতিই প্রচলিত আছে।

কিন্তু কোন কোন শিক্ষাবিদ্ এই বিষয়ে আরও উদার মত পোষণ করেন। তাঁহারা শিশুকে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী। **তাঁহাদের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত ছাত্র অন্য কাহারও কাজে বাধা না দেয় বা কাহারও অনিষ্ট না করে, ততক্ষণ তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।**

তাঁহারা শারীরিক শাস্তিদানের সম্পূর্ণ বিরোধী ; এমন কি, ছাত্রের উপর শিক্ষকের বেশী প্রভাব বিস্তার করাও অন্যায় মনে করেন। Mr. Macmunn ও Dr. Montessorie এই দলের অগ্রণী। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, এখনও এই মত শিক্ষক-সমাজে গৃহীত হয় নাই। তাঁহারা মনে করেন যে, আমাদের শিশুগণ এখনও সেইরূপ স্বাধীনতা উপভোগের যোগ্য হয় নাই। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা এক কথা নহে। চঞ্চলমতি শিশুগণকে সংযত থাকিতে এবং নিয়মানুবর্তী হইতে বাধ্য করিলে তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় না। ইহাও না করিলে শিশুগণ তাহাদের স্বাভাবিক চঞ্চলতা বশতঃই অসংযত ব্যবহার করিবে এবং বিত্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করিবে। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে শারীরিক শাস্তি না দিয়াও শিশুদের সংযত রাখা যায় এবং নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিত্যালয়ে সুশাসন রক্ষার উপায়

(১) বিত্যালয়-পরিচালনার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা। বিত্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে বিত্যালয় সুপরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাত্রগণ যখন দেখে যে প্রত্যেক শিক্ষককে সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতে হয়, তখন তাহারাও স্বভাবতঃই নিয়মানুযায়ী তাহাদের কর্তব্যসাধনে রত হয়। তাহা ছাড়া তাহারা যখন বুঝিতে পারে যে, প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের সজাগ দৃষ্টি এড়াইয়া তাহারা কোন নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিতে পারে না, তখন তাহারা স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করিতে সাহস করে না। অপরদিকে বিত্যালয়ে সুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে অধিকাংশ ছাত্রই আগ্রহের সহিত জ্ঞানার্জনে রত হইবে, বিত্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ কোন কাজ করিতে তাহাদের প্রবৃত্তিই হইবে

না। অবশিষ্ট অল্প কয়েকজন ছাত্রকে শাসনের জন্যই অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। **সুতরাং বিদ্যালয় সুপরিচালনা ও বিদ্যালয়ে সুশিক্ষা দানের সহিত বিদ্যালয় সুশাসনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে ;** বস্তুতঃ বিদ্যালয় সুপরিচালিত হইলে এবং তথায় সুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলেই বিদ্যালয়ে সুশাসনের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। যে-বিদ্যালয়ে সুশাসনের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সে বিদ্যালয় সুপরিচালিত নহে এবং তথায় সুশিক্ষাদানের ভাল ব্যবস্থা হয় নাই।

(২) **শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাসন-ক্ষমতা।** সুপরিচালিত হইলে এবং বিদ্যালয়ে সুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে সুশাসনের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষকগণের, বিশেষতঃ প্রধান-শিক্ষকের, উচ্চ ব্যক্তিত্ব ও শাসনক্ষমতা না থাকিলে অনুকূল অবস্থায়ও বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষা হইতে পারে না। কেননা, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাসনক্ষমতার অভাব হইলে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ হইতে নিবৃত্ত বা শিক্ষকের নির্দেশমত জ্ঞানার্জনে রত না হইতে পারে। সুতরাং **শিক্ষকগণের বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাসন-ক্ষমতা না থাকিলে বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষিত হইতে পারে না।**

সুশাসকের গুণাবলী। সুশাসক হইতে হইলে **শিক্ষকের যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি ও উচ্চ-ব্যক্তিত্ব থাকা চাই।** তাঁহাকে ইতস্ততঃ ভাব পরিহার করিতে হইবে ; তৎপরতার সহিত বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবার এবং দৃঢ়তার সহিত আদেশ-দানের ও তদনুযায়ী কাজ করাইবার ক্ষমতাও তাঁহার থাকা চাই।

কিন্তু তাঁহার নিজের ভুল স্বীকার করিবার সাহসও থাকিতে হইবে, তাহাতে তাঁহার প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা কিছুমাত্র কমিবে না, বরং বাড়িবে। তাঁহার যথেষ্ট কর্মকৌশল (Tact) চাই। তৎপরতার সহিত সমস্ত দিক্ বিচার করিয়া এবং প্রত্যেক কাজের ভাবী ফল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত কর্মপন্থা নিরূপণ করিতে হইবে। তাঁহাকে ন্যায়পরায়ণ, সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য এবং **নিজে কঠোরতার সহিত নিয়মানুবর্তী হইতে হইবে।**

নতুবা ছাত্রগণ তাঁহার সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা অন্তরের সহিত মানিয়া লইবে না এবং অন্তরের সহিত তাঁহার আদেশমত কাজ করিবে না। তাঁহাকে খুব সংযত ও সহিষ্ণু হইতে হইবে। তাঁহার নিজের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব না থাকিলে তিনি ছাত্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না। তাঁহার হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আছে এবং তিনি ছাত্রগণের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার আত্মবিশ্বাস থাকা চাই। কিন্তু তাঁহাকে নিরর্থক ক্ষমতা প্রদর্শন না করিয়া শাসন করিবার কৌশলটি জানিতে হইবে। ছাত্রদের সহিত তাঁহার ব্যবহার সর্বদা সৌজন্য ও সহানুভূতি-পূর্ণ হইবে ; কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে বজ্রের মত কঠোরও হইতে হইবে। ছাত্রদের সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা তিনি যেমন বর্জন করিবেন, তেমনি তাহাদের প্রতি ঔদাসীন্য বা তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করাও যত্নের সহিত পরিহার করিবেন। কখন তাহাদের সহিত ব্যঙ্গ বা হাস্যে যোগ দিবেন এবং কখন তাহা দমন করিবেন তাহা তাঁহাকে জানিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, **ছাত্রের সহিত শিক্ষক এমন ব্যবহার করিবে। যাহাতে তাহাদের মনে তাঁহার প্রতি যুগপৎ ভয়, ভক্তি ও ভালবাসার ভাব জাগে** ; তাঁহার অসন্তোষসূচক ভ্রূকুটিই যেন সর্বাপেক্ষা বড় শাস্তি এবং তাঁহার অনুমোদন-সূচক মৃদুহাস্যই যেন সর্বাপেক্ষা বড় পুরস্কার বলিয়া তাহারা মনে করে।

(৩) নিয়ম প্রণয়ন ও নিয়ম পালন। **ছাত্রগণকে নিয়মানুবর্তী করিতে পারিলেই বিদ্যালয়ে সুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।** কিন্তু তাহাদিগকে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে **তাহাদের পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে হইবে এবং সেগুলি তাহাদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিতে হইবে।** নিয়মগুলি ছাপাইয়া রাখিতে পারিলে এবং প্রত্যেক ছাত্রকে এক এক কপি দিতে পারিলে সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। কেননা রাষ্ট্রীয় আইনের বেলা অজ্ঞতার অজুহাতে শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে না পারিলেও, কোন ছাত্র প্রকৃত অজ্ঞতাবশতঃ বিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। সে-ক্ষেত্রে তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেওয়া যায় মাত্র।

বিদ্যালয়ের **সুশাসনের নিয়মগুলি খুব চিন্তা ও যত্নের সহিত তৈয়ার করিতে হয়।** নিয়মগুলি সংখ্যায় বেশী হওয়া উচিত নহে। প্রত্যেক নিয়ম প্রণয়নের সময় তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে কিনা ভালরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়। ইহা ছাড়া যে নিয়ম প্রয়োগ করা যাইবে না তাহা তৈয়ার করাও উচিত নহে। খুব বেশী নিয়ম প্রণয়ন করিলে ছাত্রগণের পক্ষে তাহা মনে রাখা বা অনুসরণ করা কঠিন হয়। নিয়মগুলি সাধারণ রকমের হইবে। খুব খুঁটিনাটি বিষয়ে নিয়ম তৈয়ার করিলে তাহা সকল সময় ও সকল অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় না। নিয়মগুলি সরল, সহজবোধ্য ও যুক্তিযুক্ত হওয়া চাই। অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ নিয়মগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে সেগুলি পালন করিতেও পারে না। নিয়মগুলি যুক্তিযুক্ত মনে হইলেই তাহারা আগ্রহের সহিত সেগুলি পালন করিবে।

কেবল সুচিন্তিত নিয়ম প্রণয়ন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। সেগুলি **ছাত্রগণ যাহাতে নিষ্ঠার সহিত পালন করে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।** কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে প্রকৃতির শাস্তির ন্যায় অনিবার্য শাস্তি দিতে হইবে। এমন কি, তাহার ফলে কাহারও কোন ক্ষতি না হইলেও নিয়মের মর্যাদা রক্ষার জন্যও শাস্তি দিতে হইবে। নতুবা ছাত্রগণ সতর্কতার সহিত নিয়ম-পালনে অভ্যস্ত হইবে না।

(৪) **আদেশ দান।** আদেশ লিখিতও হইতে পারে, মৌখিকও হইতে পারে। সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষকে কোন সাময়িক বিষয়ে মৌখিক আদেশ দেওয়া হয়। অনেক ছাত্রকে সমরূপ অবস্থায় কোন কাজ করিবার নির্দেশ দিতে হইলে লিখিত আদেশ দেওয়া প্রয়োজন।

নিয়ম ও লিখিত আদেশের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নিয়ম সকল সময়ে সকলের উপর প্রযোজ্য। লিখিত আদেশ কোন সময়ে, বিশেষ অবস্থায় এবং নির্দিষ্ট ছাত্রগণের পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া নিয়ম ও আদেশের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই। নিয়ম প্রণয়ন সম্বন্ধে যে-সকল মন্তব্য করা হইয়াছে সেগুলি লিখিত আদেশ দেওয়ার বেলাও স্মরণ রাখিতে হইবে।

(৫) **শিক্ষকের আদর্শ। "উপদেশ হইতে উদাহরণ বেশী মূল্যবান বা কার্যকরী"** এই সারগর্ভ বাক্যটি শিক্ষাক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা বেশী খাটে। **শিক্ষকগণ নিজে কঠোরতার সহিত নিয়ম পালন করিয়াই ছাত্রদিগকে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দিতে পারেন।** শিক্ষকেরা যদি প্রধান শিক্ষকের কর্তৃত্ব মানিয়া না চলেন, সৈনিকের ন্যায় তাঁহার নির্দেশমত কতব্য না করেন, ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে না আসেন, ঠিক সময়ে শ্রেণীতে পাঠ দিতে না যান, এবং অন্য যে সকল নিয়ম তাঁহাদের বেলায়ও প্রযোজ্য তাহা মানিয়া না চলেন, তবে সেই স্কুলে সুশাসন রক্ষিত হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে **প্রথমে শিক্ষকদের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে ছাত্রদের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে।**

(৬) **প্রধান-শিক্ষকের তত্ত্বাবধান। প্রধান শিক্ষক সর্বদা সমস্ত বিদ্যালয়ের উপর সজাগ দৃষ্টি না রাখিলে বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় থাকিবে না।** শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই যদি বুঝিতে পারে যে, তাহারা প্রধান-শিক্ষকের চক্ষু এড়াইয়া কোন কাজ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে কেহই নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিতে সাহস করিবে না। অবশ্য শিক্ষকদের উপর দৃষ্টি রাখার কাজে সহকারী প্রধান-শিক্ষককে সাহায্য করিতে হইবে এবং ছাত্রদের উপর দৃষ্টি রাখার কাজে সমস্ত শিক্ষকেরই তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইবে। সমস্ত শিক্ষকের চক্ষে না দেখিলে তাঁহার পক্ষে সর্বদা সমস্ত বিদ্যালয়ের উপর দৃষ্টি রাখা সম্ভব হইবে না।

(৭) **সর্বদা কার্যে নিয়োগ। "অলস লোকের মন শয়তানের কারখানা,"** এই সারগর্ভ বাক্যটি স্কুল-শাসন ব্যাপারে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। কেননা, শিশুগণ স্বভাবতঃই চঞ্চল। **তাহাদিগকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা ও তাহাদিগকে প্রাণহীন হইতে বলা একই কথা।** তাহাদিগকে কোন সময়ে কোন ভাল কাজে নিয়োজিত না করিলে তাহারা তখন মন্দ কার্যে প্রবৃত্ত হইবে; অন্ততঃ গোলমাল করিয়া সমস্ত বিদ্যালয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করিবে। সুতরাং সমস্ত স্কুল-সময়ে সমস্ত ছাত্রকে কাজে নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা না করিলে বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় থাকিবে না।

(৮) **ছাত্রদের আত্মসম্মান-বোধ জাগরিত করা এবং বিদ্যালয়ের জন্য গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা দেওয়া।** "আমি অন্য কেহ হইতে হীন নই, আমারও একটা মর্যাদা আছে এবং কোনরূপ অন্যায় বা ঘৃণ্য কাজ করা আমার পদমর্যাদার হানিকর," এইরূপ মনোভাবকেই আত্মসম্মান-জ্ঞান বলে। ছাত্রদের মনে এরূপ আত্মসম্মান-জ্ঞান জাগাইতে পারিলে তাহারা আপনা হইতে অন্যায় কাজে নিবৃত্ত হইবে। অবশ্য নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্রগণের মনে এরূপ ভাব জাগান কঠিন। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের মনে এরূপ আত্মসম্মান-জ্ঞান জাগরিত করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। "এরূপ কাজ অমুক শ্রেণীর কোন ছাত্রের উপযুক্ত নহে," "অমুক শ্রেণীর কোন ছাত্র এরূপ কাজ করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না,"—এ রকম মন্তব্যই সাধারণ অপরাধের জন্য যথেষ্ট শাস্তি। শ্রেণীর সকল ছাত্রকে শ্রেণীর সম্মান রক্ষা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া সকল শ্রেণীর ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ের জন্য গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা দিলে তাহার সাহায্যেও তাহাদের আত্মসম্মান-বোধ জাগরিত করা যায়। "অমুক বিদ্যালয়ের ছাত্র কোন প্রকার অন্যায় বা হীন কাজ করিতে পারে না," "এরূপ কাজ অমুক বিদ্যালয়ের ছাত্রের উপযুক্ত নহে" ইত্যাদি মন্তব্য করিলে নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণের মনেও আত্মসম্মান-বোধ জাগিবে।

(৯) **স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা।** মনিটর, ক্যাপটেন, প্রিফেক্ট, নায়ক ইত্যাদি নির্বাচন করিয়া তাহাদের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসন বজায় রাখার ভার দেওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া স্বায়ত্তশাসন শিক্ষা দেওয়ার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা হইতে পারে, অন্যত্র ইহার আলোচনা হইবে।

(১০) শাস্তি—পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(১১) পুরস্কার— " " "

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শাস্তি

(Punishment)

সুশাসন রক্ষার জন্য অনেক সময় ছাত্রগণকে শাস্তি দিতে হয়। সেকালে ইহাই সুশাসন রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্তমান সময়ে খ্যাতনামা শিক্ষকগণের অভিমত এই যে, যতদূর সম্ভব শাস্তি না দিয়া শাসনের চেষ্টা করা বিধেয়। **পুনঃ পুনঃ শাস্তিদান দুর্বল শাসনেরই পরিচায়ক বলা হয়।** কিন্তু যিনি বলেন যে, শাস্তির কিছুমাত্র সাহায্য না লইয়া বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষা করা যায় তাঁহাকে খুব সাহসী বলিতে হইবে। তিনি হয়ত কোনদিন কোন বিদ্যালয় পরিচালনা করেন নাই, অথবা আদর্শ সমাজে আদর্শ-শিশুদের শিক্ষাদান করিয়াছেন। আমাদের বর্তমান সমাজে সেরূপ আদর্শ-শিশু পাওয়া যায় না। সুতরাং শাস্তিদান অপ্রীতিকর কার্য হইলেও **তাহা সম্পূর্ণ পরিহার করা যায় না।** Mr. P. Wren সুন্দর ভাষায় বলিয়াছেন, "**বিচারকের হস্তে শাস্তি পাওয়ার চেয়ে একজন বালকের পক্ষে শিক্ষকের হস্তে শাস্তি পাওয়া ভাল, জেলে আটক থাকার চেয়ে স্কুলগৃহে আটক থাকা ভাল, ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলার চেয়ে হেড-মাষ্টারের হস্তে কঠোরতম শাস্তি পাওয়া ভাল।** তাই বলিয়া **শাস্তির অপব্যবহার বা অত্যধিক ব্যবহার কিছুতেই সমর্থন-যোগ্য নহে।**"

শাস্তির উদ্দেশ্য—(১) সংশোধন, (২) নিবারণ, (৩) ক্ষতিপূরণ এবং (৪) আইনের মর্যাদা-রক্ষা।

(১) **সংশোধক শাস্তি** (Corrective or Reformative)। বিদ্যালয়ে যে শাস্তি দেওয়া হয় তাহার প্রধান উদ্দেশ্য সংশোধন। কারণ, শিশু খুব গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহার প্রতি শিক্ষকের মনে ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব জাগা বা তাহার উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হওয়া উচিত নহে। যাহাতে ছাত্র নিজের অপরাধ বুঝিতে পারে, তাহার অনুতাপ হয় ও সংশোধন হয় সেই উদ্দেশ্যেই তাহাকে শাস্তি দেওয়া কর্তব্য।

(২) **নিবারক শাস্তি** (Deterrent or Exemplary)। "নিবারণ প্রতিকার হইতে ভাল"—এই সারগর্ভ উক্তি শিক্ষাক্ষেত্রেও কম প্রযোজ্য নহে। **একজন অপরাধীকে শাস্তি পাইতে দেখিয়া যাহাতে অন্যে সেইরূপ অপরাধের কাজ হইতে বিরত হয় এই উদ্দেশ্যে যে শাস্তি দেওয়া হয় তাহাকেই নিবারক শাস্তি বলে।** একজন ছাত্র কোন অপরাধ করিলে তাহাকে সংশোধন করার জন্য যেমন শাস্তি দিতে হয়, তেমনি তাহাকে শাস্তি পাইতে দেখিয়া যাহাতে বিদ্যালয়ের অন্য ছাত্রগণ সেরূপ অপরাধের কাজ করিতে ভয় পায়, সেই উদ্দেশ্যেও শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অবশ্য গুরুতর অপরাধের জন্যই এইরূপ শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাহা প্রকাশ্যভাবে ও কঠোরতার সহিত দিতে হয়। যথা,—মোটা জরিমানা, কঠোর শারীরিক শাস্তি, সাময়িকভাবে ছাত্রের পড়া বন্ধ (Rustication) ও ছাত্রকে বিতাড়ন (Expulsion)।

(৩) **ক্ষতিপূরক শাস্তি** (Retributive)। **একজন ছাত্রের কোন কাজের ফলে অন্য ছাত্রের বা বিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের উদ্দেশ্যেও শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। তাহাকেই ক্ষতিপূরক শাস্তি বলে।** যথা,—একজন ছেলে আর একজন ছেলের জামা ছিঁড়িয়া দিলে তাহার ভাল জামাটা সেই ছেলেকে দিয়া সেই ছেলের ছেঁড়া জামাটা তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে, অথবা তাহাকে জরিমানা করিয়া তাহা হইতে সেই ছেলের জামা কিনিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কোন ছাত্র বিদ্যালয়ের কোন আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহাকে জরিমানা করিয়া তাহাদ্বারা সেই আসবাবপত্র মেরামত করা বা পুনর্নির্মাণ করা যাইতে পারে। **ইহাতে অপরাধের ফল অপরাধীর উপর ফিরিয়া আসে** বলিয়া ইহা বেশী ফলদায়ক হয়।

(৪) **আইনের মর্যাদারক্ষক শাস্তি** (Disciplinary)।

বিদ্যালয়ের কেহ কোন নিয়মভঙ্গ করিলেই অবিলম্বে বিনা ব্যতিক্রমে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত। এমন কি, সে নিয়মভঙ্গ করার ফলে অন্যের বা বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি না হইলেও তাহার জন্য কোন শাস্তি দেওয়া

প্রয়োজন। কেননা, একজন ছাত্রও যদি শাস্তি না পাইয়া কোন নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে, তাহা হইলে অনেক ছাত্র সে নিয়মভঙ্গ করিতে সাহস করিবে বা উৎসাহিত হইবে এবং ফলে বিদ্যালয়ের শাসন-শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে। বস্তুতঃ দেশ শাসনের ন্যায় বিদ্যালয় শাসনের বেলায়ও কঠোরতার সহিত আইনের মর্যাদা রক্ষা করা না হইলে বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় থাকিবে না, ছাত্রগণও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা করিবে না।

রুশোর প্রকৃতির শাসন
(Rousseau's Theory of Natural Consequences)

মনস্বী রুশো বলেন যে **অপরাধীর কাজের ফলরূপেই প্রকৃতি শাস্তি দেয়। প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া শিশুকেও তাহার কাজের ফল ভোগ করিয়াই শাস্তি পাইতে দেওয়া উচিত।** তাহাদিগকে অন্য কৃত্রিম শাস্তি দেওয়া উচিত নহে। স্পেন্সারও (Spencer) এই মতের সমর্থক। তাঁহারা বলেন যে শিশু একবার আগুনে হাত দিয়া যে শাস্তি পায় তাহা সে জীবনে ভুলে না। তাঁহারা নিম্নলিখিত সুবিধা দেখাইয়া প্রকৃতির শাস্তি সমর্থন করেন :—

(১) এই শাস্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অপরিহার্য। ইহাতে ভাল কাজের ফলে আনন্দ পাওয়া যায় এবং মন্দ কাজের ফলে দুঃখ পাইতে হয়। তাই ইহা কৃত্রিম শাস্তি হইতে বেশী ফলদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ।

(২) ইহাদ্বারা অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই জন্য শিশু নিজের দোষ বুঝিতে পারে ও সংশোধনের চেষ্টা করে।

(৩) ইহা অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী হয় এবং সাধারণতঃ অপরাধের সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়।

(৪) ইহাতে অপরাধী তাহার কাজের ফলরূপেই শাস্তি পায় বলিয়া শাস্তির ন্যায্যতা হৃদয়ঙ্গম করে। সেই জন্য তাহার মনে শাস্তিদাতার প্রতি বিদ্বেষ বা আক্রোশের সৃষ্টি হয় না।

কিন্তু প্রকৃতি অর্থে যদি **জড় প্রকৃতিই** বুঝায় তাহা হইলে উপরের সুবিধাগুলি আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কেননা—

(১) জড় প্রকৃতির শাস্তি সকল সময় অপরাধের পরিমাণানুযায়ী হয় না।

ইহাতে অনেক সময় লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়। আগুনের যে দাহিকা শক্তি আছে তাহা শিশু জানে না। এই অজ্ঞতার জন্য শিশু আগুনে হাত দিয়া তাহার একটা অঙ্গ হারাইতে পারে বা প্রাণও হারাইতে পারে।

(২) ইহাতে কাজের ফল সকল সময় সঙ্গে সঙ্গেও পাওয়া যায় না। তাই অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে কার্যকারণ-সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। যেমন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়ম-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সকল সময়ে রোগ ভোগ হয় না। তাই রোগ ভোগ করিয়াও লোকে পুনঃ পুনঃ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়ম ভঙ্গ করিতে ইতস্ততঃ করে না।

(৩) প্রকৃতির শাস্তি সকল সময় নিশ্চিতও নহে। একজন অপরাধ করিয়া শাস্তির হাত এড়াইয়া যাইতে পারে এবং অন্যে অপরাধ না করিয়াও তাহার ফলভোগ করিতে পারে। যথা, কেহ যদি একটা পুষ্করিণীর জল দূষিত করিয়া তাহার জল পান না করে তবে সে কোন শাস্তি না পাইতে পারে, অন্যে না জানিয়া তাহার জল পান করিয়া রোগগ্রস্ত হইতে পারে।

(৪) জড় প্রকৃতি অনেক অপরাধের শাস্তিই দিতে পারে না। যথা, চুরি করা, কাহাকেও অন্ধকারে আঘাত করা, অন্যের নিন্দা করা, কোন আইন বা নিয়ম ভঙ্গ করা ইত্যাদি।

(৫) সর্বোপরি জড় প্রকৃতির বিচারশক্তি নাই বলিয়া অবস্থানুযায়ী শাস্তির তারতম্য করিতে পারে না।

তবে প্রকৃতি বলিতে জড় প্রকৃতিকে না বুঝাইলে উপরি-উক্ত আপত্তির বিশেষ কারণ থাকে না। প্রকৃতির শাস্তির অর্থ যদি এই হয় যে যতটা সম্ভব **অপরাধের ফলের আকারে শাস্তি দেওয়া উচিত, অথবা অপরাধের সহিত শাস্তির কোন সম্পর্ক থাকা উচিত, এবং শাস্তি অপরাধের উপযুক্ত ও পরিমাণানুযায়ী হওয়া উচিত, তবে ইহা বাস্তবিকই ফলদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ**। যথা, বিলম্বে বিদ্যালয়ে আসার জন্য ছুটীর পর আটক রাখা, নিজের দৈনিক পাঠ অবহেলার জন্য বিদ্যালয়ে শাস্তিমূলক কাজ (Punishment task) দেওয়া, পড়ার বই ছিঁড়িলে অন্যের বই হইতে লিখিয়া পড়িতে দেওয়া, মিথ্যাকথা বলিলে তাহার সত্যকথাও অবিশ্বাস করা,

অন্যের কোন জিনিষ নষ্ট করিলে তাহার নিজের জিনিষ অন্যকে দিতে বাধ্য করা, অন্যকে শারীরিক কষ্ট দিলে তাহাকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি শাস্তি সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় ও উপকারী।

বেন্থামের শাস্তিদানের নীতি
(Bentham's Canons of Punishment)

বেন্থাম (Bentham) শাস্তিদানের যে মূলনীতিগুলি নির্ধারণ করিয়াছেন সেগুলি দেশ-শাসন ও বিদ্যালয়-শাসন উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই সেই নীতিগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল।—

(১) **শাস্তি অপরাধের পরিমাণানুযায়ী** হইবে (Punishment should be proportionate to the offence)। সুতরাং কোন অপরাধের জন্য একটা শাস্তি নির্দিষ্ট করিয়া রাখা যায় না। অবস্থানুযায়ী শাস্তির তারতম্য করিতে হয়।

(২) **অপরাধের প্রকৃতির সহিত মিল রাখিয়া শাস্তি দেওয়া** উচিত এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকা উচিত (Punishment should be characteristical); যথা, স্কুলে বিলম্বে আসার জন্য ছুটির পর কাজ করিতে বাধ্য করা; গৃহকাজ অবহেলা করার জন্য বিদ্যালয়ে সেই কাজ করিতে বাধ্য করা। অপরাধের ফলরূপে শাস্তি দেওয়ার নীতির মধ্যেও এই সত্য নিহিত আছে।

(৩) শাস্তি সংশোধক হওয়া উচিত (Punishment should be reformative)।

(৪) **শাস্তি ক্ষতিপূরক** হওয়া উচিত (Punishment should be retributive)। দোষী যে ক্ষতি করিয়াছে তাহাকেই যেন তাহা পূরণ করিতে হয়।

(৫) **শাস্তি উদাহরণস্থানীয়** বা প্রতিষেধক বা নিবারক হওয়া উচিত। (Punishment should be exemplary)।

(৬) **শাস্তির পরিমাণ যতটা সম্ভব কম** হওয়া উচিত (Punishment should be economical)। অপরাধের উপর বা অন্য ছাত্রের উপর ঈপ্সিত প্রভাব বিস্তারের জন্য যতটা দরকার তাহা হইতে বেশী শাস্তি দেওয়া উচিত নহে।

(৭) **শাস্তি জনপ্রিয়** হওয়া উচিত (Punishment should be popular)। সকলে, অন্ততঃ ভাল লোক বা ছাত্রগণ, যেন ইহা ন্যায্য বলিয়া বুঝিতে পারে, শাস্তি সেইরূপ হওয়া উচিত।

ইহা ছাড়া বিদ্যালয়ে শাস্তিদানের সময় নিম্নলিখিত নিয়মগুলিও অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

(৮) **শাস্তি সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য ও প্রতিশোধের ভাবশূন্য** হইতে হইবে।

(৯) কেবল **জ্ঞাতসারে কৃত অপরাধের জন্যই শাস্তি** দেওয়া উচিত এবং শাস্তি দেওয়ার পূর্বে অপরাধীকে অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করা উচিত (Offence must be brought home to the offender)।

(১০) অপরাধী বেশী কষ্ট পায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইরূপ শাস্তি হইতে সে **অপমান বোধ করে সেইরূপ শাস্তিই শ্রেষ্ঠ**; কিন্তু ছাত্রদের আত্মসম্মানে গুরুতর আঘাত করে এইরূপ শাস্তি দেওয়াও উচিত নয়।

(১১) ছাত্রের অন্যায় কাজ বা অবহেলার জন্যই শাস্তি দিতে হইবে, তাহার অক্ষমতার জন্য শাস্তি দেওয়া যায় না ; সেই ক্ষেত্রে বরং তাহাকে সাহায্য করিতে হয়।

(১২) প্রকাশ্যভাবে শাস্তি দেওয়া হইলে বেশী ফলদায়ক হয়। কারণ তাহাতে ছাত্র বেশী অপমান বোধ করে এবং অন্য ছাত্রের উপর তাহা প্রতিষেধকভাবে কাজ করে। কোন ছাত্র খুব গুরুতর অপরাধ করিলে ও তাহাকে উদাহরণস্থানীয় শাস্তি দিতে হইলে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষকের সভায় শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। (শারীরিক শাস্তিদানের বিশেষ নিয়মগুলির আলোচনা পরে হইবে।)

বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি

পূর্বোক্ত নিয়মগুলি অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) শিক্ষকের অসন্তোষ প্রকাশ, ভৎর্সনা ও নৈতিক প্রবর্তনা (Moral Suasion)।

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন স্থাপিত হইলে শিক্ষকের অসন্তোষ প্রকাশকে ছাত্র বড় শাস্তি বলিয়া মনে করিবে। যদি তাহাতে ফল না হয়, তবে শিক্ষক ছাত্রকে তাহার অপরাধের পরিমাণানুযায়ী মৃদু বা তীব্র ভৎর্সনা করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের জন্য উপদেশ দিতেও পারেন।

(২) অপমানজনক অবস্থান বা শ্রেণী-বিভাগ। সাধারণ অপরাধের জন্য অপমান বোধ করে এমন ভাবে দাঁড়াইতে বা বসিতে দেওয়া নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগের পক্ষে বেশ ভাল শাস্তি। যথা, কোন ছাত্রকে শ্রেণীর সামনে বা পিছনে দাঁড় করাইয়া রাখা, কাণে ধরিয়া দাঁড় করান ইত্যাদি। ইহা ছাড়া ব্যবহারানুযায়ী ছাত্রগণকে সাময়িকভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন বেঞ্চে বসিতে দেওয়া যাইতে পারে। ভাল দলের কোন ছাত্র খারাপ ব্যবহার করিলে তাহাকে খারাপ দলের বেঞ্চে অপসারিত করা যায়, খারাপ দলের কোন ছাত্রের ব্যবহার কিছুদিন ধরিয়া সন্তোষজনক বোধ হইলে তাহাকে ভাল দলের বেঞ্চে বসিতে দেওয়া যায়। তবে বাঁকা হইয়া দাঁড়াইতে হাঁটু বাঁকা করিয়া বসিতে, মাথার উপর বোঝা রাখিয়া বসিতে বা দাঁড়াইতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। তাহা ছাড়া গাধা, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি কোন অপমানজনক উপাধি দান ভাল নহে, কারণ ইহাতে তাহাদের আত্মসম্মান-বোধ কমিয়া যায় এবং তাহাদের সহপাঠিগণ পরেও তাহাদের খারাপ উপাধি ব্যবহার করিতে পারে।

(৩) ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত নম্বর হইতে বাদ দেওয়া অথবা খারাপ ব্যবহারের জন্য শাস্তিমূলক নম্বর দেওয়া। বৎসরের প্রথমে প্রত্যেক ছাত্রকে ব্যবহারের জন্য পূর্ণ নম্বর দিয়া, মন্দ ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু

নম্বর বাদ দেওয়া হইলে খুব ভাল হয়। তবে প্রত্যেক ব্যবহারের জন্য নম্বর বাদ না দিয়া সমস্ত মাসে ছাত্রের ব্যবহার দেখিয়া মাসের শেষে বাদ দেওয়া ভাল।

ইহাতে সকল ছাত্রকে প্রথমে সচ্চরিত্র বলিয়া ধরিয়া লইয়া সচ্চরিত্র হইবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয় এবং তাহাদের পতন হইতে থাকিলে তাহা তাহাদের চোখের সামনে ধরিয়া সংশোধনের সুযোগ ও প্রেরণা দেওয়া হয়। কেহ কেহ ভাল ব্যবহারের জন্য নম্বর না দিয়া খারাপ ব্যবহারের জন্য শাস্তিমূলক নম্বর দেওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু পূর্ব ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ মনে হয়।

(৪) ছুটির পর আটক রাখা। পাঠে অমনোযোগিতা, সময়ানুবর্তিতার অভাব, গৃহকার্যে অবহেলা প্রভৃতির জন্য ছুটীর পর ছাত্রগণকে কিছুক্ষণ আটকাইয়া রাখিলে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি হয়, কিন্তু সেই সময় তাহাদিগকে কোন কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। সুতরাং কোন শিক্ষককেও তাহাদের ভার লইয়া থাকিতে হয়। এক এক শিক্ষককে পালাক্রমে এক এক দিন সেই কাজের ভার দিলে কোন শিক্ষককে মাসে দুই দিনের বেশী আটক ছাত্রের জন্য অতিরিক্ত সময় থাকিতে হয় না। এই ব্যবস্থার একটা প্রধান দোষ এই যে সারাদিন মানসিক কাজের পর ছাত্রগণ অবসাদগ্রস্ত হয়। সেই অবস্থায় তাহাদিগকে আরও মানসিক কাজ করিতে দিলে তাহাদিগের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা হয়। তবে সেই সময়ে ছাত্রগণকে হস্তলিপি লিখিতে, কিছু নকল করিতে বা কোন শারীরিক কাজ করিতে দেওয়া হইলে সেই আশঙ্কা থাকে না।

(৫) খেলা বা কোন আনন্দদায়ক কাজে যোগদান করিতে না দেওয়া বা কোন লোভনীয় বস্তু হইতে বঞ্চিত করা।

শিশুমাত্রেই খেলা-প্রিয়। যখন তাহার সমপাঠীগণ আনন্দের সহিত খেলা করিতেছে, তখন কোন ছাত্রকে তাহাতে যোগ দিতে না দিলে তাহার যথেষ্ট দুঃখ ও শাস্তি হয়। সেইরূপ কোন আমোদ উৎসবে যোগ দিতে না দিলেও তাহাদের শাস্তি হয়। কোন পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সুন্দর জামা, কাপড়, ছবির বই ইত্যাদি লোভনীয় বস্তু পাওয়া হইতে

বঞ্চিত করিলেও তাহাদের কম শাস্তি হইবে না। তবে ইহার জন্য অভিভাবকের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।

(৬) **ব্যবহারের খাতায় খারাপ ব্যবহার লিপিবদ্ধ করা।**

প্রত্যেক শ্রেণীশিক্ষককে তাঁহার শ্রেণীর ছাত্রগণের ব্যবহারের লিখিত বিবরণ রাখিবার জন্য বৎসরের প্রথমেই একটা খাতা দেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে তিনি এক এক পৃষ্ঠায় এক এক ছাত্রের নাম লিখিতে পারেন এবং কোন ছাত্র পাঠে অবহেলা করিলে বা কোন খারাপ ব্যবহার করিলে তাহা লিখিয়া রাখিতে পারেন। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকগণও এই খাতায় ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া দিতে পারেন।

ইহার সুবিধা এই যে প্রত্যেক ছাত্রের ব্যবহার ও কাজ সম্বন্ধে শিক্ষকগণ সম্যক্ অবগত থাকিবেন এবং তাহাদের সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু ইহার সর্বপ্রধান উপকারিতা এই যে ছাত্রগণ যখন বুঝিতে পারে যে তাহাদের দৈনন্দিন কাজ ও ব্যবহারের লিখিত বিবরণ রাখা হইতেছে, তখনই তাহার আপনা হইতে সাবধান হইয়া যায়। তবে ইহাকে ফলদায়ক করিতে হইলে সহজে এবং অনেক ছাত্রের বিরুদ্ধে মন্তব্য লেখা উচিত নহে। তাহা করিলে ইহার ভয়ই চলিয়া যাইবে।

(৭) **অভিভাবকের নিকট সাবধানতার পত্র প্রেরণ।** অনেক সময় ছাত্র বিদ্যালয়ে কিরূপ কাজ করিতেছে বা ব্যবহার করিতেছে তাহা অভিভাবক জানিতে পারিবে না, এই বিশ্বাসে ছাত্র পাঠে অবহেলা করিতে বা বিদ্যালয়ে খারাপ ব্যবহার করিতে সাহস করে। সুতরাং তাহার পাঠ বা খারাপ ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভাবককে জানাইয়া দিলে তাহার শাস্তিও হইবে এবং তাহার সংশোধনের জন্য অভিভাবকের সহযোগিতাও পাওয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি পত্র ছাপাইয়া রাখা যায়। যখনই প্রয়োজন বোধ হয় তাহাতে ছাত্রের নাম ও অপরাধ লিখিয়া দিয়া অভিভাবকের নিকট তাহা প্রেরণ করা যায়।

(৮) **কাজ ব্যবহারের রোজ-নামচা।** যদি কোন ছাত্রের কাজ বা ব্যবহার একান্ত অসন্তোষজনক হয়, কিংবা কেহ যদি বিদ্যালয়ে না আসিয়া

সেই সময় অন্যত্র কাটায়, তবে তাহাকে কিছু সময়ের জন্য তাহার কাজ ও ব্যবহারের রোজনামচা রাখিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রত্যহ বিদ্যালয়ের ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষকগণ মন্তব্য লিখিয়া দিবেন এবং বাড়ীতে তাহার কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভাবক মন্তব্য লিখিয়া দিবেন। কেবল খুব খারাপ ছাত্রের বেলায় সাময়িক ভাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বনীয় এবং তাহার সংশোধন হইলে উহা বন্ধ করিতে হইবে।

(৯) **জরিমানা।** অনেক অপরাধের জন্য জরিমানা করিয়াও ছাত্রকে শাস্তি দেওয়া যায়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে জরিমানা করিলে ছাত্র অপেক্ষা অভিভাবকেরই বেশী শাস্তি হয়। সুতরাং যে স্থলে ছাত্রের অপরাধের জন্য অভিভাবকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব আছে বা যে স্থানে ছাত্রের সংশোধনের জন্য অভিভাবক সহযোগিতা করেন না কেবল সে স্থলেই জরিমানা করা উচিত। কেননা পকেটে হাত পড়িলে অভিভাবক আর ছাত্রের কাজ বা ব্যবহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। যদি কোন অভিভাবক তাঁহার অধীনস্থ ছাত্রকে শারীরিক শাস্তিদানের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন তবে তাহার পরিবর্তেও ছাত্রকে মোটা জরিমানা করিতে হয়। ইহা ছাড়া কোন ছাত্র অন্য ছাত্রের বা বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি করিলে তাহাকে জরিমানা করিয়া তাহার দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করিতে হয়। প্রত্যেক স্থলে অপরাধের পরিমাণ ও ছাত্রের আর্থিক অবস্থা এই দুইটিই বিবেচনা করিয়া জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। যে জরিমানাকে একজন গরীব ছাত্র বড় শাস্তি বলিয়া মনে করে তাহা একজন ধনীর পুত্রের পক্ষে কোন শাস্তিই না হইতে পারে। সুতরাং একই অপরাধের জন্যও সকল ক্ষেত্রে সমান জরিমানা করিলে তাহা ফলদায়ক হয় না।

(১০) **শারীরিক শাস্তি। অনেক শিক্ষাবিদ্ শারীরিক শাস্তিদানের সম্পূর্ণ বিরোধী।** তাঁহারা বলেন যে ইহা ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন করে, এমন কি ইহার ফলে ছাত্রের মনে শিক্ষকের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগিতে পারে; ইহা শিক্ষালাভের আনন্দ নষ্ট করে, সুতরাং ইহার ফলে জ্ঞানলাভে ছাত্রের অনুরাগ না জন্মিয়া বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারে; ইহার দ্বারা

ছাত্রের গুরুতর শারীরিক ক্ষতি হইতে পারে ; ইহা বর্বরোচিত শাস্তি, সভ্য সমাজে ইহার স্থান হওয়া উচিত নহে ; ইহা ছাত্রকে দাসোচিত আজ্ঞানুবর্তিতা শিক্ষা দেয় ; সর্বশেষ, জ্ঞানলাভে অনুরাগ বা কর্তব্যজ্ঞানের পরিবর্তে শাস্তির ভয়ে ছাত্রেরা কাজ করিলে তাহাদের নৈতিক অবনতি হয়।

কিন্তু ধীরভাবে বিচার করিল দেখা যাইবে যে **শারীরিক শাস্তি হইতে তাহার অপব্যবহারই পূর্বোক্ত কুফলগুলির জন্য বেশী দায়ী।** ন্যায্য-কারণে শারীরিক শাস্তি দিলে শিক্ষকের প্রতি ছাত্র বিদ্বেষভাব পোষণ করে না। আন্তরিক সহানুভূতির সহিত ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ছাত্রের দোষের বিচার করিয়া কর্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া শিক্ষক শাস্তি দিতেছেন, এই কথা ছাত্র বুঝিতে পারিলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন কিছুমাত্র শিথিল হয় না। পাপকে ঘৃণা করিলেও পাপীকে ভালবাসিবার জন্য ধর্মের যে উপদেশ আছে তাহা শিক্ষাক্ষেত্রেই বেশী খাটে। তবে পাঠে অমনোযোগিতা, পাঠ বা গৃহকাজ অবহেলা প্রভৃতির জন্য শারীরিক শাস্তি না দিয়া অন্য প্রকারের শাস্তি দেওয়া উচিত। তাহা হইলে শারীরিক শাস্তি দানের ফলে ছাত্রের জ্ঞানলাভে বিতৃষ্ণা জন্মিবার কারণ থাকিবে না। যাহাতে ছাত্রের কোন শারীরিক ক্ষতি না হয় সেই ভাবেই শারীরিক শাস্তি দিতে হয়। ভয় একটা অবাঞ্ছনীয় প্রবৃত্তি হইলেও ছাত্রকে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলার জন্য প্রয়োজন হইলেও উহার সাহায্য লওয়া কিছুমাত্র অন্যায় নহে। পিতামাতার ন্যায় শিক্ষকের আজ্ঞানুবর্তী হইতে বাধ্য হইলেই ছাত্রের মনে দাসমনোভাব জাগা উচিত নহে। প্রভু দাসকে নিজ স্বার্থের জন্যই আজ্ঞানুবর্তী হইতে বাধ্য করে, ছাত্র তাহার নিজের মঙ্গলের জন্যই শিক্ষকের আজ্ঞানুবর্তী হয়। সর্বশেষ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতিই সর্বাপেক্ষা প্রবল ; তাই শারীরিক কষ্টদায়ক শাস্তিই শিশুর উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে। অপরদিকে বিবর্তনবাদীদের মতে শিশু অসভ্যদের সমস্থানীয়। সুতরাং অসভ্য জাতির ন্যায় শিশুদের শাসনের জন্যও শারীরিক শাস্তির প্রয়োজন হয়।

কিন্তু সময় সময় শারীরিক শাস্তিদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও **বেত্রের বহুল ব্যবহার বা অপব্যবহার কিছুতেই সমর্থন-যোগ্য নহে।**

বিনা অপরাধে বা সামান্য অপরাধে শারীরিক শাস্তি দিলে তাহা কিছু মাত্র ফলপ্রদ না হইয়া বরং কুফল প্রসব করিতে পারে। বার বার কোন ছাত্রকে শারীরিক শাস্তি দিলে তাহার মন হইতে উহার ভয় বা উহার জন্য অপমান-বোধ চলিয়া যায়। তাহার পর তাহাকে কঠোর শারীরিক শাস্তি দিলেও কোন ফল হয় না। বস্তুতঃ শারীরিক শাস্তিদান অপেক্ষা উহার ভয় ছাত্রকে শাসন করার কার্যে বেশী সাহায্য করে। বার বার শারীরিক শাস্তি দিয়া সেই ভয় দূর করা কিছুতেই উচিত নহে। **শাসনের সর্বপ্রকার উপায় নিষ্ফল হইলে শিক্ষকের কর্তৃত্ব রক্ষার শেষ উপায় হিসাবেই শারীরিক শাস্তি দেওয়া উচিত।**

পূর্ব-বর্ণিত সুশাসন রক্ষার উপায়গুলি অবলম্বন করিলে প্রথমোক্ত নয় প্রকারের শাস্তির সাহায্যেই বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষা করা যাইতে পারে, শারীরিক শাস্তিদানের কোন প্রয়োজনই না হইতে পারে।

রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থায় শারীরিক শাস্তিদান সম্পূর্ণ বন্ধ করা হইয়াছে এবং শিক্ষক বা অভিভাবক কর্তৃক ছাত্রকে কোন প্রকার শারীরিক শাস্তি দান আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তবে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ও শাসন-কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় শারীরিক শাস্তিদান বন্ধ করিয়াও বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় রাখা সম্ভব হইয়াছে। কোন ছাত্র গুরুতর অপরাধ করিলে তাহা বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া হয় এবং শিক্ষক ও শ্রেণীর ছাত্রগণ মিলিয়া তাহার সমালোচনা করে। তাহাতেও তাহার সংশোধন না হইলে তাহার অভিভাবককে তাহা জানান হয় এবং তাহার সংশোধনের জন্য সহযোগিতা করিতে বলা হয়। অভিভাবক সহযোগিতা না করিলে শাসনকর্তৃপক্ষ নাগরিক সভার সভ্য-তালিকা হইতে সেই অভিভাবকের নাম অপসারণের আদেশ দেন। আমাদের দেশে এইরূপ সহযোগিতার ব্যবস্থা করা কতদিনে সম্ভব হইবে বলা যায় না।

শারীরিক শাস্তিদানের সময় লক্ষ্য রাখার বিষয়

(ক) পাঠে অবহেলা ও অন্য সাধারণ অপরাধের জন্য শারীরিক শাস্তি দেওয়া উচিত নহে। **তাহার জন্য পূর্ব-বর্ণিত অন্য কোন শাস্তি দেওয়া উচিত।**

কোন ছাত্রকে প্রহার করা, নৈতিক অপরাধ, অবাধ্যতা, শিক্ষকের কর্তৃত্ব অস্বীকার, বারবার বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করা ইত্যাদি অপরাধের জন্যই শারীরিক শাস্তি দিতে হয়। চুরি করা, বিদ্যালয় হইতে পলাইয়া যাওয়া, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করা প্রভৃতি অপরাধের জন্য অন্য শাস্তির অতিরিক্ত শারীরিক শাস্তিও দেওয়া যায়। **পুনঃ পুনঃ কোন অপরাধ করিতে থাকিলে এবং অন্য কোন উপায়ে সংশোধন না হইলে শারীরিক শাস্তির সাহায্যেও সংশোধনের চেষ্টা করিতে হয়।** যথা, মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস কোনমতে ত্যাগ না করিলে শারীরিক শাস্তির সাহায্যেও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই অভ্যাস সংশোধনের চেষ্টা করিতে হয়।

(খ) ছাত্রের বয়স, স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং অপরাধের গুরুত্ব ভালরূপ বিবেচনা করিয়াই শারীরিক শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়।

(গ) **উত্তেজিত অবস্থায় কোন শিক্ষকের শারীরিক শাস্তি দেওয়া উচিত নহে।** কেননা তখন তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত শারীরিক শাস্তি দিতে পারেন এবং ছাত্রের কোন গুরুতর শারীরিক ক্ষতিও করিতে পারেন।

(ঘ) **যন্ত্রণা দেওয়া হইতে অপমান বোধ জাগাইবার দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিয়া শারীরিক শাস্তি দিতে হয়।** তাই শারীরিক শাস্তি প্রকাশ্যে দেওয়াই ভাল। শিক্ষক ও ছাত্রের সভায় ছাত্রের দোষের নিন্দা করিয়া সামান্য শারীরিক শাস্তি দিলেও তাহা বেশী ফলদায়ক হয়।

(ঙ) **পনর ষোল বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক ছাত্রদের সহজে শারীরিক শাস্তি দেওয়া উচিত নহে।** তাহাতে তাহাদের সংশোধন না হইয়া তাহাদের মনে বিদ্রোহের ভাব জাগিবার সম্ভাবনাই বেশী। শারীরিক শাস্তির পরিবর্তে তাহাদিগকে বেশী জরিমানা করা বা অন্য কোন কঠোর শাস্তি দেওয়া যায়। তবে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাহাদিগকে বিদ্যালয় ত্যাগ করা বা শারীরিক শাস্তি গ্রহণ করা এই দুইয়ের মধ্যে একটা বাছিয়া লইতে দেওয়া যায়। সেস্থলে তাহারা সাধারণতঃ শারীরিক শাস্তিই গ্রহণ করে।

(চ) **ছাত্রের প্রকৃতি বা মেজাজও (temperament) বিবেচনা করিয়া শারীরিক শাস্তি দিতে হয়।** খুব উগ্র মেজাজের ছাত্রকে শারীরিক

শাস্তি দিলে বিপরীত ফল হয়। সাধারণতঃ তাহাদের বেশী আত্মাভিমান থাকে। তাই শারীরিক শাস্তির পরিবর্তে তাহাদিগকে অপমানজনক শাস্তি দিলেও তাহাদের সংশোধন হইতে পারে।

(ছ) **মুখে, মাথায়, বুকে, পেটে বা পিঠে কোন প্রকার শারীরিক শাস্তি দেওয়া যায় না।** কেননা, ইহাতে গুরুতর শারীরিক ক্ষতি হইতে পারে। পিঠে শাস্তি দিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না বলিয়া যে ধারণা আছে তাহা ভুল। পিঠে আঘাত করিলেও ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের অনিষ্ট হইতে পারে বা মেরুদণ্ডবাহী স্নায়ুগুচ্ছে আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের রোগ জন্মিতে পারে। হস্তে, উরুতে, পায়ে বা পাছার উপরে শাস্তি দেওয়াই নিরাপদ।

(জ) **চপেটাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত হইতে বেত্রাঘাতই শ্রেয়।** কারণ শেষোক্ত শাস্তির দ্বারা বেশী যন্ত্রণা পাইলেও তাহার ফলে প্রথম দুইটা হইতে শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা অনেক কম।

(ঝ) শারীরিক শাস্তিদানের জন্য বেশী মোটা, শক্ত বা ভারী বেত্র ব্যবহার করা উচিত নহে; কেননা তাহার আঘাত গুরুতর হইতে পারে।

(ঞ) শিক্ষা বিভাগের নিয়মানুযায়ী প্রধান শিক্ষক ভিন্ন অন্য কোন শিক্ষক শারীরিক শাস্তি দিতে পারেন না। ইহার কারণ এই যে, যে শিক্ষকের নিকট ছাত্র অপরাধ করে তিনি উত্তেজনা-বশে ভালরূপ বিবেচনা না করিয়া অতিরিক্ত শাস্তি দিতে পারেন বা বিনা প্রয়োজনে বেত্রের বহুল ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা ছাড়া শারীরিক শাস্তিদানের সময় বর্তমান অপরাধের সঙ্গে আরও অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। সুতরাং এই দায়িত্বজনক কাজের ভার প্রধান শিক্ষকের উপরেই দেওয়া উচিত। কিন্তু শিক্ষকগণের তাঁহার নিকট শারীরিক শাস্তিদানে সুপারিশ করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

(১১) **বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা।** যদি দেখা যায় যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও কোন ছাত্রের সংশোধন হইতেছে না এবং সে বিদ্যালয়ের অন্য ছাত্রগণের উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তবে সেই **ছাত্রকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করা যায়।**

তাহাকে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে অন্য ছাত্রগণকে তাহার খারাপ প্রভাব হইতে রক্ষা করার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

(১২) **সাময়িকভাবে পড়া বন্ধ করা** (Rustication)। **নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন ছাত্রকে কোন বিদ্যালয়ে পড়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায়।** খুব গুরুতর অপরাধের জন্য এই শাস্তি দিতে হইলে হেড্ মাষ্টারকে কমিটির নিকট রিপোর্ট করিতে হয় এবং অভিভাবককে কমিটির নিকট তাঁহার বক্তব্য জানাইবার জন্য নোটীশ দিতে হয়। কমিটি হেড্ মাষ্টারের রিপোর্ট পড়িয়া এবং অভিভাবকের বক্তব্য শুনিয়া হেড্ মাষ্টারের সুপারিশ গ্রহণ করিলে তাহা Inspectorকে জানাইতে হয়। Inspectorও তাহা অনুমোদন করিলে Circular দিয়া তাহা দেশের সমস্ত বিদ্যালয়ে জানাইয়া দেওয়া হয়, যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সে ছাত্র কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে না পারে।

(১৩) **স্থায়ী ভাবে পড়া বন্ধ করা** (Expulsion)। যে সকল অপরাধের জন্য Rusticate করা হয় সেইরূপ কিন্তু তাহা হইতেও গুরুতর অপরাধের জন্য কোন ছাত্রকে **চিরকালের জন্য বিদ্যালয়ে পড়িবার অধিকার হইতে বঞ্চিত** করা যায়। এই চরম শাস্তি দিতে হইলেও Rustication করার মত কার্য-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পুরস্কার

শাস্তি যেমন বিদ্যালয়ের সুশাসন রক্ষার একটা উপায়, পুরস্কার দানও তাহার একটা উপায়। শাস্তির ভয়ে ছাত্র মন্দ কার্য হইতে নিবৃত্ত হয়, পুরস্কারের লোভে সে সৎকার্যে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই হীন উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করে বলিয়া **কোনটাই প্রকৃষ্ট উপায় নহে।** কিন্তু শাস্তি যেমন প্রকৃষ্ট উপায় না হইলেও একটা কার্যকরী উপায় এবং অনেক সময় শাস্তি

দানের প্রয়োজন হয়, সেরূপ পুরস্কার দান প্রকৃষ্ট উপায় না হইলেও একটা কার্যকরী উপায় এবং অনেক সময় পুরস্কার দানেরও প্রয়োজন হয়। তবে পুরস্কার দান শাস্তিদান হইতেও কম আপত্তিজনক। কারণ শাস্তিদানের ন্যায় ইহা নিষেধাত্মক নহে এবং ইহার অন্য উপকারিতাও আছে। আদর্শ সমাজের আদর্শ শিশুদের বিদ্যালয়ে শাস্তির ভয় এবং পুরস্কারের লোভ উভয়ই অনাবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু আমাদের এই **ভ্রমশীল মনুষ্য সমাজের শিশুদের বিদ্যালয়ে শাস্তি এবং পুরস্কার উভয়েরই প্রয়োজন আছে।**

পুরস্কার দানের উপকারিতা। পুরস্কারের লোভে ছাত্র সৎকার্যে প্রবৃত্ত হয় এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত তাহার কর্তব্য সম্পাদন করে। পুরস্কারের জন্য ছাত্রদের মধ্যে **ভাল প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়** এবং তাহার ফলে তাহাদের অনেক বেশী উন্নতি হয়।

পুরস্কার দানের অপকারিতা। জ্ঞান লাভের বিমল আনন্দ উপভোগের জন্যই জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তাহার জন্য অন্য কোন পুরস্কার দেওয়ার প্রয়োজন হওয়া উচিত নহে। পুরস্কারের লোভে কাজ করিলে হীন উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করা হয়। পুরস্কার লাভের জন্য অনেক সময় তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় এবং তাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়। ইহার ফলে ছাত্রদের মনে অনেক সময় ঈর্ষা, হিংসা, আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি জন্মে এবং ছাত্রগণ অনেক সময় অসদুপায় অবলম্বন করিতে, এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিষ্ট করিতেও ইতস্ততঃ করে না। পুরস্কার লাভের জন্য এক সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যও নষ্ট করিতে পারে। ইহা ছাড়া পুরস্কার লাভের জন্য অল্প কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়, অধিকাংশ ছাত্র তাহাদের শক্তির বাহির বলিয়া ইহার প্রতি উদাসীন থাকে। কার্যের ফল হইতে কার্য করিবার জন্য সচ্চেষ্টাই বেশী প্রশংসার যোগ্য ; কিন্তু সাধারণতঃ কার্যের ফলের জন্যই পুরস্কার দেওয়া হয়, সচ্চেষ্টার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় না। সর্বশেষে, নৈতিক চরিত্রের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইলে অন্য ছাত্রগুলি নীতিহীন বলিয়া ইঙ্গিত করা হয়।

সমর্থন বা প্রতিকার

পুরস্কার লাভের লোভ দেখাইয়াও ভালকার্যে প্রবৃত্ত করা তেমন আপত্তি-জনক নহে। কেননা উদ্দেশ্য অনেক সময় উপায়ের সমর্থন করে। প্রতিযোগিতা যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত না হয় তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা যায়। ঈর্ষা, হিংসা, আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি খারাপ প্রবৃত্তির বা অসদুপায় অবলম্বনের প্রমাণ পাইলে পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করা যায়। সাময়িক কাজের জন্য পুরস্কার না দিয়া সারা বৎসরের কাজ বিবেচনা করিয়া পুরস্কার দিলে এক সময়ে অতিরিক্ত খাটিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার আশঙ্কা থাকে না। সকল ছাত্র যাহাতে পুরস্কার লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি **উল্লেখযোগ্য উন্নতির পুরস্কার** (Prizes for marked Progress) দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা লাভের জন্য ছাত্রকে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করিতে হয় না। পূর্ব বৎসর হইতে পরের বৎসর তাহার পাঠে বা কোন কাজে যথেষ্ট উন্নতি হইয়া থাকিলেই একজন ছাত্র এই পুরস্কার পাইতে পারে। ইহা সত্য যে সচ্চেষ্টাও কিছুমাত্র ফলবতী না হইলে তাহার জন্য পুরস্কার দেওয়া যায় না। কেননা, কিছুমাত্র ফলবতী না হইলে সচ্চেষ্টার প্রমাণও হয় না। তবে সান্ত্বনাজনক পুরস্কার (Consolatory Prize) দিয়া ইহার কিছু প্রতিকার করা যায়। নৈতিক চরিত্রের জন্য পুরস্কার দেওয়াই উচিত নহে। নৈতিক অপরাধের জন্য শাস্তি দিলেই যথেষ্ট হয়। যথা, সত্য বলার জন্য পুরস্কার না দিয়া মিথ্যা বলার জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত। তবে পূর্ব-বর্ণিত ভাবে বৎসরের প্রথমে সচ্চরিত্রতার জন্য পূর্ণ নম্বর দিয়া নৈতিক অপরাধের জন্য নম্বর কাটিয়া দেওয়া যায়।

বিভিন্ন পুরস্কার

(১) **অনুমোদন ও প্রশংসা**—ছাত্রগণের জ্ঞানলাভে আগ্রহ থাকিলে এবং ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যথোপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপিত হইলে, শিক্ষকের অনুমোদন বা প্রশংসাকেই ছাত্র যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া মনে করে।

(২) **সম্মানজনক স্থান বা শ্রেণীবিভাগ**। সন্তোষজনক কাজ বা ব্যবহারের জন্য ছাত্রগণকে কোন সম্মানজনক স্থানে বসিতে দেওয়া যাইতে পারে। "উপরে" বা "নীচে" বসিতে দেওয়ার ব্যবস্থা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বেশ কার্যকরী। তবে প্রত্যেক ঘণ্টায় স্থান পরিবর্তন করিতে দিলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এক এক পরীক্ষার পর ছাত্রগণকে পরীক্ষায় তাহাদের নিজ নিজ স্থান অনুযায়ী শ্রেণীতে বসিতে দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া শ্রেণীতে ২।১টা বেঞ্চকে সম্মানজনক কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে এবং ভাল ছাত্রগণকেই সেই বেঞ্চে বসিতে দেওয়া যাইতে পারে। অন্য বেঞ্চের যে কোন ছাত্রের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইলে তাহাকেও সেই বেঞ্চে বসিবার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে। এইভাবে ২ বা ৩টী শ্রেণী বিভাগ করিয়া ছাত্রগণকে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া যায়।

(৩) ভাল পাঠোন্নতি ও ব্যবহারের জন্য কতকগুলি **সম্মানজনক উপাধি-দানের ব্যবস্থা** করা যাইতে পারে। যথা, সত্যব্রত, ন্যায়ব্রত, জ্ঞানব্রত, বিনয়ব্রত, শ্রমব্রত ইত্যাদি। সেই সকল উপাধি লেখা কোন নিদর্শন ধারণ করিতে দিলে তাহারা আরও বেশী উৎসাহিত হইবে। তবে খুব সতর্কতার সহিত যোগ্য পাত্রেই এই সকল উপাধি দিতে হইবে এবং সেই উপাধির অযোগ্য ব্যবহারের সঠিক প্রমাণ পাইলে উপাধিচ্যুত করিতে হইবে।

(৪) **সম্মানজনক তালিকা প্রস্তুত করা**। স্কুলের সভাগৃহে একটা বোর্ড স্থাপন করিয়া তাহাতে সমস্ত বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সর্বোত্তম তাহাদের নাম লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। শিক্ষকের সভায় এই তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সমস্ত শিক্ষক একমত না হইলে কাহারও নাম এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নহে।

(৫) **বস্তু-পুরস্কার**। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানোন্নতি বা দক্ষতা, বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার, বিভিন্ন খেলা বা ব্যায়ামের প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ, সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদির জন্য নানা প্রকার বস্তু-পুরস্কারও দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুর মূল্য হইতে তাহা পাওয়ার সম্মানটাকেই বেশী মূল্যবান

মনে করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। সেই জন্য এই বস্তু-পুরস্কারগুলি প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিয়া দেওয়া উচিত। যে বিষয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বস্তু পুরস্কার দেওয়া ভাল। যেমন, কোন বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য সেই বিষয়ের ভাল পুস্তক, কোন কাজে দক্ষতার জন্য সেই কাজে ব্যবহার্য কোন জিনিষ, সময়ানুবর্তিতার জন্য ঘড়ি, ব্যায়াম-নৈপুণ্যের জন্য ব্যায়ামের জিনিষ ইত্যাদি। কোন প্রকার বিলাসের দ্রব্য না দিয়া ব্যবহারের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বস্তু দেওয়াই ভাল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রেণী-শাসন

পূর্বে বিদ্যালয়-শাসনের জন্য যে সমস্ত উপায় প্রয়োজনীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলি অবলম্বন করা হইলে শ্রেণীতে সুশাসন বজায় থাকিবার সম্ভাবনা খুব বেশী। কিন্তু শ্রেণী-শাসনের জন্য কতকগুলি বিশেষ উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। সেইগুলিই এই স্থানে আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) **শ্রেণীকক্ষে ভাল আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা এবং ছাত্রদের ভালভাবে বসিবার ব্যবস্থা।** ইহার প্রয়োজনীয়তা পুর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সুব্যবস্থা না হইলে ছাত্রগণ অস্বস্তি অনুভব করিবে ও চঞ্চল হইয়া সুশাসন নষ্ট করিবে।

(২) **ছাত্রগণের ঠিকভাবে উপবেশন ও শ্রেণী-ব্যায়াম।** পাঠদান আরম্ভ করিবার পূর্বে শ্রেণীর ছাত্রগণ ঠিকভাবে বসিয়াছে কিনা দেখিতে হইবে, ঠিকভাবে না বসিয়া থাকিলে প্রথমেই তাহাদিগকে **নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসনে বা স্থানে খাড়া হইয়া বসিতে আদেশ** দিতে হইবে। (পুর্বে বলা হইয়াছে

যে এক আসনে বেশী ছাত্র বসিবার ব্যবস্থা হইলে নম্বর দিয়া প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ভাল)। যদি শ্রেণীতে বিশেষ বিশৃঙ্খলা বা গোলমাল হয় তবে পাঠদান স্থগিত রাখিয়া ছাত্রগণকে দাঁড়াইতে এবং ২।১ মিনিট **শ্রেণী-ব্যায়াম করিতে আদেশ** দিলে বিশৃঙ্খলা অনেকটা দূর হইবে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রেণীতে শৃঙ্খলা স্থাপন না করিয়া পাঠদান আরম্ভ করা কিছুতেই উচিত নহে।

(৩) **শিক্ষকের ঠিক স্থানে অবস্থান**। শিক্ষক শ্রেণীর সামনে এমন স্থানে দাঁড়াইবেন বা আসন গ্রহণ করিবেন যেন তিনি সমস্ত ছাত্রের মুখ দেখিতে পারেন এবং তাহারা যেন কখনও তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে যাইতে না পারে। এই জন্য শিক্ষকের আসন কিছু উচ্চ হওয়াও উচিত।

(৪) **আনন্দদায়ক ও সজীব ভাবে পাঠদান**। পাঠদান আনন্দদায়ক ও সজীব হইলে ছাত্রগণের মন তাহাতে আকর্ষিত হইবে এবং আবদ্ধ থাকিবে। সুতরাং কোনরূপ গোলমাল করিবার তাহাদের প্রবৃত্তিই হইবে না। **ভাল পাঠদানের ব্যবস্থা না করিয়া শ্রেণীতে সুশাসন বজায় রাখা যায় না।** কেননা তাহার অভাব হইলে কেবল শাস্তির ভয়ে ছাত্রগণ চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে এবং সেইরূপ প্রাণহীন শান্তিকে সুশাসন বলা যায় না।

(৫) **সর্বদা কর্মে নিয়োগ রাখা**। চঞ্চলমতি শিশুগণ অল্পক্ষণও চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের হাতে কোন কাজ না থাকিলেই তাহারা গোলমাল করিবে। সুতরাং **তাহাদিগকে সর্বদা কার্যরত রাখাই শ্রেণীশাসনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়**। কেননা তাহা হইলে তাহারা গোলমাল করিয়া শ্রেণীর শাসন-শৃঙ্খলা নষ্ট করিবার কোন অবসরই পাইবে না।

(৬) **চক্ষুর শাসন**। শ্রেণীতে কোন কাজ দিলেই যে সকল ছাত্র কার্যরত থাকিবে তাহা নহে। তাহাদের উপর শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি না থাকিলে তাহারা কার্যে অবহেলা করিয়া পরস্পরের সহিত কথাবার্তায় প্রবৃত্ত হইতে পারে বা গোলমাল করিতে পারে; তাই **চক্ষুকে শ্রেণী-শাসনের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী যন্ত্র বলা হয়**। যে ছেলে আগ্রহের সহিত কাজ

করিতেছে তাহার প্রতি **অনুমোদনসূচক দৃষ্টি** নিক্ষেপ করিলে সে উৎসাহিত হইবে। যে ছাত্র লুকাইয়া কোন সাধারণ অন্যায় কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহার **মুখের উপর দৃষ্টিস্থাপন** করিয়া শিক্ষক মৃদুহাস্য করিলে সে লজ্জা পাইবে ও সেই কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবে। কোন ছাত্র বিশেষ অন্যায় কার্য করিবার চেষ্টা করিলে **ভ্রূকুটির** সাহায্যে তাহাকে শাসন করা যায়। ছাত্রের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিলে সে পাঠে অমনোযোগী হইলেও ধরা পড়িবে। বস্তুতঃ চক্ষুর ভাল ব্যবহার করিতে পারিলে এবং সমস্ত শ্রেণীর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিলে সাধারণতঃ একমাত্র তাহার সাহায্যেই শ্রেণীতে সুশাসন রক্ষা করা যায়।

(৭) **প্রশ্ন**। কোন ছাত্র পাঠে অমনোযোগী হইয়াছে বা গোলমাল করিতেছে দেখিলে তাহাকে বর্ণিত বিষয়ে একটা প্রশ্ন করিলে সে উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জিত হইবে। কোন ভাল ছাত্র যদি অহঙ্কারবশতঃ পাঠে অমনোযোগী হয় বা উদ্ধত ব্যবহার করে, তাহাকে একটা কঠিন প্রশ্ন করিয়া তাহার জ্ঞানের সীমা দেখাইয়া দিলে সে লজ্জা পাইবে ও নম্র হইবে।

(৮) **কিছুক্ষণের জন্য পাঠ স্থগিত ও শ্রেণী পর্যবেক্ষণ**। যদি পাঠদানের সময় দেখা যায় যে শ্রেণীর অনেক ছাত্র পাঠে মনোযোগী না হইয়া পরস্পরের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহার ফলে শ্রেণীতে গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে হঠাৎ পাঠ বন্ধ করিয়া শিক্ষক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিতে থাকিলে ছাত্রগণ সচকিত হইয়া পরস্পরের সহিত কথা বলা বন্ধ করিবে এবং শ্রেণীতে শান্তি স্থাপিত হইবে।

(৯) **অপরাধী ছাত্রগণের নাম লেখা**। যে সকল ছাত্র কোনরূপ গোলমাল করে তাহাদের নাম লিখিবার ভার মনিটরের উপর দেওয়া যাইতে পারে। কোন ছাত্রের নাম বার বার এই তালিকায় স্থান পাইলে তাহার সম্বন্ধে ব্যবহারের খাতায় মন্তব্য করা হইবে ইহা জানাইয়া দিলে বা তাহাকে পরে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে খুব উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রও ভয় পাইবে ও সংযত হইবে।

(১০) **আদেশ দান ও ভর্ৎসনা।** পাঠদানের সময় শ্রেণী-শাসনের জন্য জিহ্বার ব্যবহার যত কম হয় ততই ভাল। কেননা তাহাতে শিক্ষকের পাঠ বর্ণনায় এবং ছাত্রগণের পাঠে মনোযোগ দানে বাধার সৃষ্টি হয়। তাহা-ছাড়া দেখা যায় যে বার বার ছাত্রগণকে "চুপ কর" "গোলমাল কোরো না" ইত্যাদি আদেশ দিতে থাকিলে তাহা বিশেষ ফলদায়ক হয় না। একটু পরেই তাহারা পুনঃ গোলমাল করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং **পাঠদানের সময় জিহ্বার ব্যবহার না করিয়া যতদূর সম্ভব চক্ষুর সাহায্যে শাসনের চেষ্টা করা উচিত।** একান্ত প্রয়োজন হইলে **অমনোযোগী বা গোলমালকারী ছাত্রের নামোচ্চারণ** করিলেই সে সাবধান হয় ও শান্ত হয়। ইহাতে ফল না হইলে ছাত্রবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু ভর্ৎসনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সমস্ত শ্রেণীকে ভর্ৎসনা করা কিছুতেই উচিত নহে। কেননা ইহাতে প্রকৃত দোষীকে শাসন করা হয় না, অনেক নির্দোষ ছাত্র শাস্তি পায়। আদেশের সংখ্যা কম হওয়া উচিত এবং তাহা সাধারণতঃ নিষেধাত্মক না হইয়া নির্দেশাত্মক হওয়া উচিত। আদেশ দৃঢ়তার সহিত দিতে হইবে এবং ছাত্রেরা যেন তাহা তৎক্ষণাৎ কাজে পরিণত করে তাহা দেখিতে হইবে।

(১১) **শাস্তি।** পাঠদানের সময় কোন গুরুতর শাস্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, **শারীরিক শাস্তি দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে।** কেননা, তাহাতে ছাত্রের শরীর মন এতই বিচলিত হইয়া পড়ে যে সে সহজে মনস্থির করিতে পারে না। ইহাতে জ্ঞানলাভের আনন্দ নষ্ট করে। পাঠের সময় শাস্তির ভয়ে শিশুর মন আড়ষ্ট হইয়া পড়িলে সে শিক্ষকের সহিত মানসিক সহযোগিতা করিতে পারে না, এবং নিজের ভাবে কাজ করিতেও উৎসাহিত হয় না। তবে সময় সময় অল্প-বয়স্ক ছাত্রছাত্রীগণকে এই প্রকারের শাস্তি দেওয়া যায়। যথা,—দুইজন ছাত্র বারবার কথা বলিতেছে দেখিলে তাহাদিগের মধ্যে একজনকে স্থানান্তরিত করা যায়; পড়া না শেখার জন্য বা অমনোযোগিতার জন্য কোন ছাত্রকে শ্রেণীর পেছনে দাঁড়াইয়া পাঠ গ্রহণ করিতে দেওয়া যায়; কোন অন্যায় কার্য করিলে তথায় কাণে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা যায়; কোন ছাত্র গোলমাল করিয়া পাঠদানে বা অন্য ছাত্রদের পাঠে মনোযোগ দানে বাধার

সৃষ্টি করিলে এবং পূর্ব-বর্ণিত কোন উপায়ে তাহাকে সংযত করিতে না পারিলে তাহাকে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া যায়। পাঠ বা গৃহকার্যে অবহেলা করার জন্য স্কুল ছুটীর পর আটক রাখিয়া কোন কাজ করিতে দেওয়া যায়।

(১২) **গুরুতর অপরাধের শাস্তি**। যদি কোন ছাত্র পাঠদানের সময়ও গুরুতর অপরাধ করে, যথা,—শিক্ষকের সামনে অন্য ছাত্রকে গালি দেয় বা প্রহার করে, শিক্ষকের আদেশ অমান্য করে বা তাঁহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে তবে পাঠদান কিছুক্ষণ স্থগিত রাখিয়া তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ শ্রেণীতে শিক্ষকের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখিতে না পারিলে তিনি শ্রেণীকে শাসন করিতেও পারিবেন না এবং শিক্ষা দিতেও পারিবেন না। তবে সহজে ইহা করা উচিত নহে, শিক্ষকের কর্তৃত্ব রক্ষার শেষ উপায় হিসাবেই ইহা অবলম্বন করিতে হয়।

References

1. T. Raymont—The Principles of Education, Chap. XXVII
2. Do—Modern Education, Chap. X.
3. J. Landon—School Managament, Part III, Chaps. I, II and V.
4. P. Wren—The Indian Teachers' Guide. Chaps. VIII.
5. Do—Indian School Organization, Chaps. XII-XIV.
6. J. Adams—Modern Development in Educational Practice. Chap. XII.
7. শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী—সুশাসন।

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষাদানের কৌশল

(Teaching Devices)

শিক্ষাদান-পদ্ধতি আলোচনা করার পূর্বে কতিপয় শিক্ষাদানের কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। কেননা শিক্ষাদানের সময় এই সকল কৌশলের সাহায্য না লইলে কোন শিক্ষাদান-পদ্ধতি পাঠদান-কার্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে না।

১। **বর্ণনা**—মৌখিক শিক্ষাদানের একটা প্রধান অঙ্গ বর্ণনা। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি কোন কোন বিষয়ের পাঠ প্রধানতঃ বর্ণনার সাহায্যেই দিতে হয়। অন্য প্রায় সকল বিষয়ের পাঠেও বর্ণনার কিছু-না-কিছু সাহায্য লইতে হয়। বর্ণনা যতই সুন্দর, জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হয়, পাঠ ততই হৃদয়গ্রাহী হয়। সুতরাং শিক্ষকমাত্রেরই ভাল বর্ণনা দানের ক্ষমতা থাকা দরকার। কিন্তু কেবল উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিলেই ভাল বর্ণনা দেওয়া হয় না। শিক্ষাপ্রদ বর্ণনা দিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(১) শিক্ষকের উচ্চারণ বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট এবং তাঁহার স্বর প্রয়োজন মত উচ্চ হইতে হইবে।

(২) বর্ণনার ভাষা ও ভাব ছাত্রের বয়স ও মানসিক বিকাশের উপযোগী হইতে হইবে। ভাষা সুন্দর, সরল ও প্রাঞ্জল হইতে হইবে।

(৩) বর্ণনা জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হইতে হইবে। বর্ণনার ফলে ছাত্রের মানসপটে যেন বিষয়ের জলন্ত ছবি ফুটিয়া উঠে।

(৪) বর্ণনার বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের আন্তরিক অনুরাগ থাকিতে হইবে। অন্তরের সহিত কোন কথা না বলিলে তাহা শ্রোতার অন্তর স্পর্শ করে না।

(৫) বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে হইবে এবং প্রয়োজন মত শিক্ষকের স্বর পরিবর্তন করিতে হইবে। তাহা না হইলে বর্ণনা একঘেয়ে হইয়া পড়িবে।

(৬) প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ কথা ও তথ্যের উপর বেশী জোর দিয়া বর্ণনা করিতে হইবে। নতুবা তাহাদের প্রতি ছাত্রগণ প্রয়োজনমত মনোযোগ দিবে না এবং সেইগুলি স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করিবে না।

(৭) পাঠের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণনা দিতে হইবে এবং অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা পরিহার করিতে হইবে।

(৮) একটানা দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া উচিত নহে, তাহা একঘেয়ে হইয়া পড়ে। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রদীপনের ব্যবহার করিয়া ও মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া বিষয়টি ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দিতে হইবে।

২। **ব্যাখ্যা**—কেবল বর্ণনা করিলেই ছাত্র সকল বিষয় সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহা ছাত্রের বোধগম্য করার জন্য সময় সময় ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয়। কেবল যে ভাষার কাঠিন্য দূর করার জন্যই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তাহা নহে, ভাবের কাঠিন্য দূর করার জন্য তাহার আরও বেশী প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং কেবল সাহিত্যের পাঠে নহে, সমস্ত বিষয়ের পাঠেই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতে পারে।

ইহা ছাড়া কেবল শব্দের পরিবর্তে শব্দ এবং বাক্যের পরিবর্তে বাক্য ব্যবহার করিলেই ভাল ব্যাখ্যা হয় না। ভাল ব্যাখ্যার জন্য যেমন কঠিন ভাষার পরিবর্তে সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ভাবকে বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত করিয়া সহজবোধ্য করিতে হয়, এবং সম্পর্কযুক্ত সমস্ত তথ্য সরবরাহ করিতে হয়। সময় সময় উদাহরণ দান ও কার্য-প্রদর্শন (Demonstration) দ্বারাও ব্যাখ্যার কাজ হইতে পারে।

৩। **প্রদীপন। কোন নূতন বা কঠিন বিষয় উপলব্ধির সাহায্যের জন্য তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত যে সকল ছবি বা বস্তু ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয় বা যে পূর্বজ্ঞাত উদাহরণ ইত্যাদি দেওয়া হয় তাহাদিগকে প্রদীপন বলে।**

শিক্ষার **তিনটি মূল সূত্রের উপর ভিত্তি** করিয়া প্রদীপনের ব্যবহার করিতে হয়। যথা—(১) যতদূর সম্ভব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই শিশুকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন; (২) জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যেই অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া উচিত; (৩) সরল বিষয়ের সাহায্যেই জটিল বিষয়ের ভাল জ্ঞান দেওয়া যায়।

প্রদীপনের উপকারিতা:—(১) ইহা কঠিন বিষয়কে সহজবোধ্য করে; (২) ইহা ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে সুস্পষ্ট ও জীবন্ত করে; (৩) ইহা বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে; (৪) ইহা বর্ণিত বিষয়ের মানসিক চিত্রগঠনে সাহায্য করে। (৫) ইহা ছাত্রের মনে জ্ঞান গাঁথিয়া দেয় ও তাহা স্মরণ রাখার সাহায্য করে; এবং (৬) ইহা পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও বোধশক্তি বৃদ্ধি করে।

বিভিন্ন প্রকারের প্রদীপন

প্রদীপনকে **দুই শ্রেণীতে** বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) **ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা বাস্তব প্রদীপন** ও (২) **বাচনিক প্রদীপন**।

(১) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বাস্তব প্রদীপন

(ক) **বস্তু**—বস্তু প্রদর্শন না করিয়া পর্যবেক্ষণমূলক পাঠ দেওয়াই যায় না। অন্যান্য বিষয়ের পাঠেও তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বস্তুগুলি ছাত্রগণকে দেখাইতে পারিলে তাহারা সহজে পাঠ অনুসরণ করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নানারকম জিনিষ সংগ্রহ করিয়া রাখা প্রয়োজন।

(খ) **আদর্শ**—যখন কোন বস্তু প্রদর্শন সম্ভব হয় না, তখন সেই বস্তুর আদর্শ দেখাইলেও প্রদীপনের কাজ হয়। যথা,—শ্রেণীতে হ্রদ, পর্বত প্রভৃতি এবং অনেক জন্তু দেখান যায় না, কিন্তু তাহাদের আদর্শ দেখাইতে পারা যায়।

(গ) **চিত্র**। যখন বস্তু বা আদর্শ কোনটাই দেখাইতে পারা যায় না, তখন বর্ণিত জিনিষ বা বিষয়ের ছবি দেখাইতে হইবে। মৌখিক বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত জিনিষ বা বিষয়ের ছবিও দেখাইলে শিশুগণ সহজে বর্ণনা অনুসরণ করিতে পারে। তাহা ছাড়া অল্পবয়স্ক শিশুগণ স্বভাবতঃই ছবি দেখিতে ভালবাসে। সুতরাং ছবির সাহায্যে পাঠদান করিলে শিশুর নিকট তাহা

চিত্তাকর্ষক হয় ও তাহাদের বেশী স্মরণ থাকে। বর্ণনার বস্তু বা বিষয়ের ছবি দেখাইতে পারিলে প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার সাহায্য হয় বলিয়া তাহাতে বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রের সঠিক জ্ঞান হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট ছবি সংগ্রহ করিয়া রাখা দরকার। কোন জিনিষের ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে তাহাদের ছবি আঁকিয়া দিতে পারেন।

(ঘ) **নক্সা**—বর্ণনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া বা অঙ্কন করা সম্ভব না হইলে কাগজে বা ব্ল্যাকবোর্ডে তাহার নক্সা আঁকিয়া দিয়া তাহার সাহায্যে পাঠ দেওয়া যায়।

(ঙ) **মানচিত্র**। মানচিত্রের ব্যবহার না করিয়া ভূগোল শিক্ষা আদৌ দেওয়া যায় না। ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের পাঠেও কোন দেশের বা স্থানের উল্লেখ বা বর্ণনা থাকিলে মানচিত্রে তাহা দেখাইতে হইবে।

(চ) **কাজ বা অবস্থা প্রদর্শন**। কোন কাজ বা অবস্থার বর্ণনাদানের সময় সে কাজ বা অবস্থা দেখাইলেই ছাত্রের সেই সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হয়।

(ছ) **যন্ত্রের সাহায্যে প্রদর্শন** (Demonstration)। কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় তাহা যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া না দেখাইলে তাহার ভাল জ্ঞান হইতে পারে না।

(২) বাচনিক প্রদীপন

ইহা নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হইতে পারে ; যথা :—

(ক) **তুলনা**—একটা নূতন বিষয় বা বস্তুর জ্ঞানদানের সময় পূর্বজ্ঞাত কোন বিষয় বা বস্তুর সহিত তাহার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করিলে নূতন বিষয় বা বস্তুর ভাল জ্ঞান হয়।

(খ) **উদাহরণ দান**—কোন সাধারণ নিয়ম বা নীতিবাক্য বুঝাইবার সময় অথবা কোন গুণ বা বিমূর্ত (abstract) বিষয় বর্ণনার সময় তাহার উদাহরণ দিলেই তাহা শিশু ভাল উপলব্ধি করিতে পারে।

(গ) **ছোটগল্প বলা**—অনেক সময় একটা ছোট গল্প বলিয়া বর্ণিত বিষয় উপলব্ধির কাজে শিশুকে সাহায্য করা যায় এবং তাহা আনন্দদায়ক করা যায়।

(ঘ) **সদৃশ কথা বা বিষয়ের উল্লেখ** (Citing of parallel passages, instances or thoughts)—ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের সময় পাঠ্য বিষয়ের সদৃশ কোন বর্ণনা, তথ্য বা ধারণার উল্লেখ করিলে পাঠ চিত্তাকর্ষক হয় ও পাঠ্যবিষয় সহজবোধ্য হয়।

প্রদীপন ব্যবহারের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন:—

(ক) বাস্তব প্রদীপন **সুস্পষ্ট ও সঠিক জ্ঞানদায়ক** হইতে হইবে। নিম্নশ্রেণীতে যে চিত্র, ম্যাপ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় সেইগুলি রঙ্গীন হইলেই ভাল হয়।

(খ) এক সঙ্গে অনেকগুলি বস্তু, আদর্শ ইত্যাদি শ্রেণীর সামনে স্থাপন করা ভাল নহে। যখন যে প্রদীপনের ব্যবহার করিতে হইবে তখন কেবল সেইটিই শ্রেণীর সাম্‌নে উপস্থিত করা উচিত।

(গ) তৈয়ারী নক্সা, চিত্র বা ম্যাপ প্রদর্শন অপেক্ষা শ্রেণীর সামনে তাহা আঁকিয়া দিতে পারিলে প্রদীপন বেশী ফলপ্রদ হয়। তবে দ্রুত ও সঠিক ভাবে অঙ্কনের ক্ষমতা না থাকিলে শ্রেণীর সামনে আঁকিবার চেষ্টা করা উচিত নহে।

(ঘ) প্রদীপন যতটা সম্ভব **সরল ও সহজবোধ্য** হওয়া উচিত। ছাত্রগণ তাহা দেখিয়া বা শুনিয়াই যেন সঠিক ধারণা করিতে পারে। প্রদীপনের ব্যাখ্যা বা বর্ণনার প্রয়োজন হওয়া উচিত নহে।

(ঙ) **প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রদীপনের ব্যবহার করা উচিত নহে।** কোন বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য প্রদীপনের প্রয়োজন আছে কিনা তাহা না দেখিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। কোন পাঠে অনেকগুলি বাস্তব প্রদীপনের ব্যবহার করিলে তাহার দ্বারা পাঠ অনুসরণের সাহায্য না হইয়া বরং বাধা হইতে পারে।

(চ) **অবান্তর অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সম্পর্কশূন্য প্রদীপন ব্যবহার** করা কিছুতেই উচিত নহে। বাচনিক প্রদীপনের ব্যবহারেই এই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

(ছ) **প্রদীপনের ব্যবহারে যথাসম্ভব কম সময় ব্যয় করিতে হয়।** প্রদীপনের ব্যবহারে বেশী সময় ব্যয় করিলে পাঠ সম্পূর্ণ করা বা প্রয়োজন মত বিষয় শিক্ষাদান সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া ছাত্রগণ পাঠ্য বিষয় ভুলিয়া গিয়া বা তাহার সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া প্রদীপন পর্যবেক্ষণ বা শ্রবণে বৃথা সময় কাটাইতে পারে।

৩। ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার। ভাল পাঠদানের জন্য ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার অনেকটা অপরিহার্য। ইহার ব্যবহার না করিয়া গণিত ও অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষাই দেওয়া যায় না, ভূগোল ও ইতিহাসের পাঠে ইহার ব্যবহার না করিয়া পাঠ্য-বিষয় ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়া যায় না। অন্যান্য প্রায় সমস্ত বিষয়ের পাঠেও ইহার কমবেশী ব্যবহার করিতে হয়। বস্তুতঃ **ব্ল্যাকবোর্ড একেবারে ব্যবহার না করিয়া সফলতার সহিত কোন বিষয়ের পাঠ দেওয়া যায় না।**

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের উদ্দেশ্য বা উপকারিতা

(১) ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিয়া মৌখিক বর্ণনার বিষয় ছাত্রদের দর্শনেন্দ্রিয়গোচর করা যায় এবং **শ্রবণ ও দর্শন এই দুই ইন্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহারের** ফলে পাঠ্যবিষয় ভাল শিক্ষা হয় ও স্মরণ থাকে।

(২) কঠিন বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিয়া তাহার প্রতি ছাত্রের বিশেষ **মনোযোগ আকর্ষণ** করা যায়।

(৩) নূতন শব্দ, কঠিন শব্দ, নাম, তারিখ ইত্যাদি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিয়া ছাত্রদের অনেক **ভুল সংশোধন** করা যায় বা সন্দেহ দূর করা যায়।

(৪) নক্সা, চিত্র, মানচিত্র ইত্যাদি ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকিয়া দিয়া পাঠ্য-বিষয়ের ভাল **প্রদীপন** করা যায়।

(৫) ব্ল্যাকবোর্ডে ছাত্রের সামনে চিত্র আঁকিয়া দিয়া বা গণিতের অঙ্ক কষিয়া না দেখাইয়া অঙ্কন-বিদ্যা ও গণিত ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় না।

(৬) প্রয়োজনমত পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখিয়া দিয়া পাঠ্য বিষয় স্মরণ রাখিতে ছাত্রকে সাহায্য করা যায়।

(৭) সমরূপ ঘটনা, বাক্য, গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ প্রভৃতি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিয়া পাঠ চিত্তাকর্ষক করা যায়।

(৮) ছাত্রগণের সহযোগিতায় শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে কোন লেখার কাজ করিতে পারেন এবং তাহাতে ছাত্রগণের ভাল শিক্ষা হয়।

(৯) ছাত্রগণকে বোর্ডে কোন কাজ করিতে দিয়া তাহাদের **জ্ঞান পরীক্ষা** করা যায়।

(১০) ছাত্রগণকে বোর্ডে কোন কাজ করিতে দিলে তাহাদের **সাহস ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।**

বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের সময় ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার সেই সকল বিষয় শিক্ষাদান-পদ্ধতির সঙ্গেই বর্ণনা করা হইবে। **ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের সময় নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে :—**

(১) ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু লেখার পুর্বে তাহা ভাল ভাবে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হইবে।

(২) ব্ল্যাকবোর্ডের একপাশে দাঁড়াইয়া লিখিতে হইবে, যেন লেখা শরীরের দ্বারা ঢাকা না পড়ে।

(৩) ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা বেশ সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইতে হইবে।

(৪) ব্ল্যাকবোর্ডে একসঙ্গে দুই বা বহু বিষয় লেখা বা দুই বা বহু জিনিষের ছবি আঁকা ভাল নহে। তাহা করিলে ছাত্রের মনোযোগ কোন একটা বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইবে না।

(৫) ব্ল্যাকবোর্ডের লেখায় বা কাজে যেন কোন ভুল না হয় সেই সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

(৬) ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে।

(৭) ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত বা অঙ্কিত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। পরে তাহা পুনঃ দেখাইতে হইলে বোর্ড উল্টাইয়া রাখা যায়। তাহা না করিয়া অন্য বিষয়ের বর্ণনা দিতে গেলে ছাত্রগণের মনোযোগ ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার বা ছবির প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

(৮) ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার সময় শ্রেণী-শাসনের জন্য বারবার শ্রেণীর দিকে ফিরিয়া দেখা ভাল নহে। একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া লিখিলেই শ্রেণী-শিক্ষকের দৃষ্টির অন্তরালে যাইবে না। তবে এক এক অংশ লেখা বা আঁকা শেষ করিয়া শ্রেণীর ছাত্রগণ কি করিতেছে দেখা প্রয়োজন।

(৯) ব্ল্যাকবোর্ডে কোন বিষয় লেখার বা কোন চিত্র আঁকার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণকেও তাহা নিজ নিজ খাতায় লিখিতে বা আঁকিতে বলা প্রয়োজন। তাহা হইলেই তাহারা কর্মে নিযুক্ত থাকিবে ও শ্রেণীর শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে পারিবে না।

৫। মৌখিক প্রশ্ন—প্রশ্ন করিবার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাদানের কৌশলগুলির মধ্যে প্রশ্নকেই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহার সাহায্য ব্যতীত পাঠদান কার্যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করা যায় না। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ছাত্রের মানসিক সহযোগিতা ভিন্ন তাহাকে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় না এবং পাঠে ছাত্রের এই অতি প্রয়োজনীয় মানসিক সহযোগিতা লাভে প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করিতে পারে; প্রশ্নের সাহায্যে কোন বিষয়ের প্রতি ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়, তাহার ঔৎসুক্য জাগরিত করা যায়, তাহাকে চিন্তা করিতে ও পাঠ অনুসরণ করিতে বাধ্য করা যায়, তাহাকে পাঠ অনুসরণ করিতে সাহায্যও করা যায়, তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহার জ্ঞান পরীক্ষা করা যায় এবং অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া যায়; এমন কি প্রশ্নের সাহায্যে তাহাকে শাসনও করা যায়। সুতরাং শিক্ষাদান কার্যে সফলতা লাভে প্রশ্ন খুব বেশী সাহায্য করে। অবশ্য তাই বলিয়া বিনা প্রয়োজনে বা প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশ্ন করা ভাল নহে। তাহাতে শিক্ষাদানের সাহায্য না হইয়া বরং ব্যাঘাত হইতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে প্রশ্ন করা অতি সহজ কাজ, তাহার জন্য বিশেষ চিন্তা বা নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। ইহা কিছুমাত্র সত্য নহে। **দক্ষতার সহিত প্রশ্ন করার উপরই তাহার মূল্য বা উপকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।** ভাল প্রশ্ন যেমন পাঠদান কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করে, খারাপ প্রশ্ন সেরূপ তাহার যথেষ্ট ব্যাঘাত করিতে পারে। প্রশ্নের দ্বারা পূর্ব-বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলি

কতদূর সফল হইয়াছে তাহার বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে দক্ষতার সহিত প্রশ্ন করা কত কঠিন। দক্ষতার সহিত প্রশ্ন করিতে হইলে পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে এবং শিশুর প্রকৃতি ও শক্তি সম্বন্ধে শিক্ষকের ভাল জ্ঞান থাকিতে হইবে; তাহার বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকিতে হইবে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিচারশক্তি থাকিতে হইবে এবং সংক্ষেপে, সহজ ভাষায় ও পরিষ্কার ভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকিতে হইবে।

বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন। প্রশ্নকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা, (১) **পরীক্ষামূলক প্রশ্ন** (Testing questions), (২) **শিক্ষামূলক প্রশ্ন** (Training questions) এবং **শাসনমূলক প্রশ্ন** (Disciplinary questions)।

(১) **পরীক্ষামূলক প্রশ্ন।** ছাত্রের জ্ঞান পরীক্ষার জন্যই এই প্রকারের প্রশ্ন করা হয়। ইহার দ্বারা ছাত্রের মনকে পিছন দিকে লইয়া যাওয়া হয় এবং স্মৃতির সাহায্যে তাহার অর্জিত জ্ঞান পুনঃ চেতনার কেন্দ্রস্থলে আনিয়া তাহা বর্ণনা করিতে বলা হয়। পাঠের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রশ্ন করা হয়। যথা,—

(ক) **প্রস্তুতীকরণের প্রশ্ন** (Preparatory Questions)। পাঠদানের প্রথমেই এই প্রকার প্রশ্ন করা হয়। পাঠ্যবিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছাত্রের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা এবং তাহার সহিত নূতন পাঠের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া মনকে নূতন জ্ঞান গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করাই ইহার কাজ। ইহার ফলে ছাত্রের সমবেক্ষণ-মণ্ডল জাগরিত হয় এবং নূতন জ্ঞান সম্বন্ধে তাহার ঔৎসুক্য জন্মে। যথা,—হুমায়ুন সম্বন্ধে পাঠদানের পূর্বে বাবরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিতে হইবে এবং সর্বশেষে "তাঁহার মৃত্যুর পর কে দিল্লীর সম্রাট হইলেন?" এই প্রশ্নটি করিলে নূতন পাঠের সম্বন্ধে ছাত্রগণের ঔৎসুক্য জন্মিবে এবং তাহাদের মন তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে।

(খ) **পাঠানুসরণ পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন** (Questions for testing the pupil's comprehension)। কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় মধ্যে মধ্যে এই প্রকারের প্রশ্ন করিতে হয়। ইহার দ্বারা ছাত্রগণ পাঠ

অনুসরণ করিতেছে কিনা তাহার পরীক্ষা হয় এবং অন্য উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। ইহার দ্বারা একদিকে ছাত্রগণের মনোযোগ ও বোধশক্তির পরীক্ষা হয় এবং তাহাদের ভুল ধারণা সংশোধন ও সন্দেহ দূর করা যায়। অপর দিকে ইহার দ্বারা শিক্ষকের পাঠদান-পদ্ধতির কোন দোষ থাকিলে তাহাও ধরা পড়ে। যদি অনেক ছাত্র পাঠ অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতিতে কোন গুরুতর দোষ আছে। তখন শিক্ষককে আত্মপরীক্ষা করিয়া তাঁহার নিজ দোষ সংশোধন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া ইহার দ্বারা গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়, তাহাদিগকে পাঠে মনোযোগ দিতে বাধ্য করা যায় এবং পাঠের একঘেয়েমিও নষ্ট করা হয়। তবে এই প্রকারের প্রশ্ন খুব বেশী করা উচিত নহে, কারণ তাহাতে ছাত্রগণ বর্ণনার সূত্র হারাইয়া ফেলিতে পারে। একটা জীবন্ত বর্ণনার মাঝখানে আসিয়া প্রশ্ন করিতে গেলে পাঠের চিত্তাকর্ষক প্রভাবও নষ্ট হইবে।

(গ) **পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন** (Recapitulatory Questions)।

প্রত্যেক বিভাগ বা সোপানের শেষে এবং পাঠের শেষে এই প্রকারের প্রশ্ন করিতে হয়। ইহার দ্বারা পাঠদানের ফল নিরূপণ করা যায়, প্রদত্তজ্ঞান শৃঙ্খলাপুর্ণ করা যায় এবং পুনরাবৃত্তির ফলে প্রয়োজনীয় বিষয় ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়া যায়। প্রশ্নগুলি এরূপ ভাবে পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজাইতে হইবে যেন তাহাদের উত্তরের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে পাঠের সারাংশ প্রস্তুত হয়। ইহাছাড়া প্রশ্নগুলি এরূপ হওয়া উচিত যেন ছাত্র কেবল শিক্ষকের বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করিতে না পারে, তাহাকে নিজে চিন্তা করিয়া ও গুছাইয়া উত্তর দিতে হয়।

(২) **শিক্ষামূলক প্রশ্ন** (Training Questions)।

এই প্রকারের প্রশ্ন ছাত্রের মনকে সামনের দিকে চালিত করে (পরীক্ষা-মূলক প্রশ্নের বিপরীত) এবং ছাত্রকে পূর্বজ্ঞান হইতে নূতন জ্ঞানে পৌছিতে বা নূতন সত্য আবিষ্কার করিতে সাহায্য করে। লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থল সামনে রাখিয়া শিক্ষক এইরূপ প্রশ্ন করিবেন যাহাতে ছাত্র অনুসন্ধানের পথ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পায় এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া নিজ চেষ্টায় গন্তব্যস্থলে পৌছিতে

পারে। অর্থাৎ শিক্ষক এই প্রশ্নের দ্বারা ছাত্রকে ঠিকভাবে চিন্তা করিতে ও বিচার করিতে প্রবৃত্ত করিয়া নূতন তথ্য বা সত্য খুঁজিয়া বাহির করিতে সাহায্য করিতে পারেন। যথা,—

প্রশ্নঃ—একটা ভারী জিনিষ শূন্যে ছুঁড়িলে কি হয় ?

উঃ—তাহা মাটিতে পড়িয়া যায়।

প্রঃ—পাখী কিরূপে শূন্যে উঠে ?

উঃ—পাখী উড়িয়া শূন্যে উঠে।

প্রঃ—পাখী মাটিতে পড়িয়া যায় না কেন ?

উঃ—পাখী উড়িতে থাকে বলিয়া পড়িয়া যায় না।

প্রঃ—পাখী শূন্যে উঠিয়া থামিয়া থাকে না কেন ?

উঃ—থামিলে মাটিতে পড়িয়া যাইবে।

প্রঃ—এখন বল ব্যোমযান কেন মাটিতে পড়িয়া যায় না ?

উঃ—পাখীর ন্যায় আকাশে চলিতে থাকে বলিয়া মাটিতে পড়িয়া যায় না।

প্রঃ—ব্যোমযান কতক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে ?

উঃ—যতক্ষণ চলিতে থাকে।

যে সকল শিশুর বিচার-শক্তি বিকশিত হয় নাই শিক্ষামূলক প্রশ্নের সাহায্যে তাহাদিগকে বিভিন্ন জিনিষ বা ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করিতে বা কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার পর বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সাহায্য করে এমন প্রশ্ন করা যায়। যেমন, কোন অবস্থার বর্ণনা দিয়া তাহার ফল অনুমান করিতে বলা হয়, একটা গল্প বলার সময়ে মাঝে মাঝে থামিয়া ইহার পর নায়ক কি করিবে অনুমান করিতে বলা যায়, অথবা একটা যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া তাহাতে অমুক সেনাপতি কেন জয়ী হইলেন জিজ্ঞাসা করা যায়।

(৩) **শাসনমূলক প্রশ্ন**। ইহাও পরীক্ষামূলক প্রশ্নের ন্যায়, তবে ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রের জ্ঞান পরীক্ষা করা নহে, শ্রেণীতে সুশাসন রক্ষা করা। কোন ছাত্রকে পাঠে অমনোযোগী হইতে দেখিলে তাহাকে শাসনের জন্যই বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করা যাইতে পারে; ইহাতে সে লজ্জিত হইয়া

পাঠে মনোযোগী হইবে।" এমন কি শ্রেণীর অনেক ছাত্র অমনোযোগী হইলে বা গোলমাল করিলে তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করার চেয়ে শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া একটা কঠিন প্রশ্ন করিলে সকলে তাহার উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবে এবং গোলমাল আপনা হইতে থামিয়া যাইবে। যদি কোন ছাত্র বৃথা গর্বে স্ফীত হইয়া পাঠে অমনোযোগী হয় তবে তাহাকে একটা কঠিন প্রশ্ন করিয়া তাহার জ্ঞানের সীমা দেখাইয়া দিলে সে নম্র হইবে এবং পাঠে মনোযোগী হইবে।

উত্তম প্রশ্নের লক্ষণ—

(১) এরূপ প্রশ্ন করা প্রয়োজন যেন তাহার উত্তর করিতে ছাত্রকে যথেষ্ট মানসিক কাজ করিতে হয়, পর্যবেক্ষণ বা স্মরণ করিতে হয় ও চিন্তা করিতে হয়।

(২) নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করিতে হইবে; পাঠ্য বিষয়ের সহিত প্রশ্নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা এবং প্রশ্ন শিক্ষাদান-কার্যে সহায়ক হওয়া প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর প্রশ্ন করা উচিত নহে।

(৩) প্রশ্নের ভাষা এবং অর্থ সরল হইবে এবং উহা যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই ভাল। ছাত্রকে দ্ব্যর্থবোধক (Equivocal) প্রশ্ন করা উচিত নহে।

(৪) প্রশ্নের যেন একটা মাত্র উত্তর হয়। কোন প্রশ্নের অনেক উত্তর দেওয়া সম্ভব হইলে শিক্ষক কোন্ উত্তর চাহেন তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া ছাত্রগণ হতবুদ্ধি হইবে অথবা নানা ছাত্র নানা উত্তর দিয়া গোলমালের সৃষ্টি করিবে।

(৪) প্রশ্ন এরূপ কঠিন হইবে যেন ছাত্রকে কিছু চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন অতি কঠিন হইলে ছাত্র তাহার উত্তরদানের চেষ্টাও করিবে না।

(৬) উত্তর যেন শিক্ষকের কথার প্রতিধ্বনি বা পুনরাবৃত্তি না হয় অথবা "হাঁ" বা "না" না হয় সেরূপ প্রশ্ন করিতে হইবে। যথা,—আওরেঙ্গজেব বলিতেন, "শিবাজী একটা পার্বত্য মূষিক, সে আমার কি করিতে পারে?" ইহার পরই "আওরঙ্গজেব কি বলিতেন" প্রশ্ন করিলে, ছাত্র শিক্ষকের

কথার প্রতিধ্বনি করিবে। অথবা "বাবর কি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন" এই প্রশ্ন করিলে ছাত্র "হাঁ" বা "না" উত্তর দিবে। এইরূপ প্রশ্ন করা ভাল নহে।

(৭) পরীক্ষা-মূলক প্রশ্ন উত্তর-নির্দেশক (Leading) হওয়া উচিত নহে। যথা,—"বাবর কি সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করেন?" এইরূপ প্রশ্ন করা উচিত নহে। তবে শিক্ষামূলক প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকিতে পারে।

(৮) প্রশ্ন ছাত্রের বয়সের ও বিকাশের উপযোগী হইতে হইবে।

(৯) উত্তর যেন বেশী দীর্ঘ না হয় এবং ছাত্রের জ্ঞানের সীমার বাহিরে গিয়া না পড়ে এরূপ প্রশ্ন করা উচিত।

(১০) প্রশ্ন নানা প্রকারের হওয়া উচিত। একই ভাষায় বা একই আকারের প্রশ্ন করিলে তাহা একঘেয়ে হইয়া পড়ে এবং ছাত্রগণ চিন্তা না করিয়া উত্তর করিতে চেষ্টা করে। পুস্তকের ভাষায়ও প্রশ্ন করা উচিত নহে।

(১১) সুস্পষ্ট ও সমস্ত শ্রেণীর শ্রবণযোগ্য উচ্চৈঃস্বরে এবং সজীবতা ও প্রফুল্লতার সহিত প্রশ্ন করিতে হইবে। ইহা যেন সজীব ও আনন্দদায়ক কথোপকথনের আকার ধারণ করে। নির্জীব ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া, আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলে ছাত্রগণ তৎপরতার সহিত চিন্তা করিয়া তাহার উত্তর দেওয়ার জন্য উৎসাহিত হয় না।

(১২) শিক্ষামূলক ও পুনরালোচনামূলক প্রশ্নগুলি শ্রেণীবদ্ধ ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত। তাহাতে ছাত্রের জ্ঞান শৃঙ্খলাপূর্ণ হয় এবং বিভিন্ন তথ্যগুলি একসূত্রে গাঁথা পড়ে। পাঠানুসরণ করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য যে প্রশ্ন করা হয় তাহা পরস্পর সম্পর্কহীন হইতে পারে।

(১৩) প্রথমে সমস্ত শ্রেণীতে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিতে হইবে এবং তাহার পর ছাত্রবিশেষকে উত্তর দেওয়ার জন্য নির্বাচন করিতে হইবে। কেবল শাসনের জন্য বা পাঠে মনোযোগী করিবার জন্যই ছাত্রবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করা যায়।

(১৪) প্রশ্ন পাঠ এবং শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বিতরিত হইবে। পাঠের কোন্ অংশে কোন্ প্রশ্ন করিতে হইবে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সহজে

উত্তর পাওয়ার লোভে কেবল ভাল ছেলেদের প্রশ্ন না করিয়া যতদূর সম্ভব শ্রেণীর প্রায় সমস্ত ছাত্রগণের মধ্যে প্রশ্ন বিতরণ করিতে হইবে।

উত্তম উত্তর ও তাহা গ্রহণ—

(১) উত্তর যতদূর সম্ভব সঠিক হইতে হইবে তাহা **যেন জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সঠিক জ্ঞানের পরিচয় দেয়।**

(২) **উত্তর সম্পূর্ণ** হইতে হইবে। প্রশ্নে যাহা কিছু চাওয়া হইয়াছে তৎসমুদয় যেন উত্তরের মধ্যে থাকে এবং তাহার প্রত্যেক তথ্য বা ভাব যেন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা হয়।

(৩) উত্তর সম্পূর্ণ **শুদ্ধ** হইতে হইবে।

(৪) যতদূর সম্ভব **সংক্ষেপে ও সরল ভাষায়** উত্তর দিতে হইবে।

(৫) **নিজ ভাষায়, ভাল ভাবে গুছাইয়া** উত্তর দিতে হইবে। ইহা করিতে পারিলেই বুঝা যাইবে যে ছাত্র বিষয়টি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছে।

(৬) **তৎপরতার সহিত** উত্তর দিতে হইবে। তবে চিন্তা করিয়া গুছাইয়া বলিবার জন্য সময় দেওয়া প্রয়োজন।

(৭) **সুস্পষ্ট স্বরে** উত্তর দিতে হইবে, যেন শ্রেণীর সকল ছাত্র ও শিক্ষক তাহা পরিষ্কার ভাবে শুনিতে পারে।

কোন ছাত্র খুব সন্তোষজনক উত্তর করিলে তাহা প্রশংসার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। সম্পূর্ণ সন্তোষজনক না হইলেও শুদ্ধ উত্তর অনুমোদন করিতে হইবে। কাহারও উত্তর সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইলেও সে যদি শুদ্ধ উত্তর দেওয়ার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া থাকে তবে তাহাকে উৎসাহিত করিতে হইবে, কিন্তু "বেশ" "উত্তম" প্রভৃতি একই শব্দ বার বার ব্যবহার করা ভাল নহে।

মন্দ উত্তর ও তাহাদের সংশোধন

(১) সম্পূর্ণ **অশুদ্ধ উত্তর**। তাহা তৎপরতার সহিত ও দৃঢ়তার সহিত অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

(২) আংশিক **শুদ্ধ উত্তর**। যে অংশ শুদ্ধ হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে এবং অশুদ্ধ অংশের ভুল দেখাইয়া দিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

(৩) **আনুমানিক উত্তর**। এইরূপ উত্তর দেওয়ার অভ্যাস অত্যন্ত মন্দ। কারণ এই অভ্যাস হইলে ছাত্র কখনও চিন্তা করিয়া শুদ্ধ উত্তর ঠিক করিবার চেষ্টা করিবে না। প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করাইয়া ও তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিয়া বা অন্য প্রশ্ন করিয়া উত্তরের অসঙ্গতি বা অসম্ভবতা দেখাইয়া দিলে ছাত্র লজ্জা পাইবে। তাহাতেও সংশোধিত না হইলে তাহাকে ভর্ৎসনা করার বা কোন শাস্তি দেওয়ারও প্রয়োজন হইতে পারে।

(৪) **প্রশ্নের সহিত সম্পর্কশূন্য উত্তর**। ইহাও আনুমানিক উত্তরের ন্যায় সংশোধন করিতে হইবে।

(৫) **চিন্তাহীন অসতর্ক উত্তর**। ভালভাবে চিন্তা না করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে এবং প্রথমেই যে কথা মনে হয় তাহা বলিলে অসতর্ক উত্তর হইবে। প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি কারাইয়া ছাত্রকে চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে বলিলে উহার সংশোধন হইবে। তাহাতেও সংশোধিত না হইলে তাহার উত্তর অগ্রাহ্য করিয়া অন্য ছেলেকে চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে বলিলে তাহার শিক্ষা হইবে।

(৬) **দাম্ভিক উত্তর**। ছাত্র যেন উত্তর দিতে অসমর্থ হয় এরূপ একটা প্রশ্ন করিলে তাহার গর্ব খর্ব হইবে এবং সে নম্র হইবে।

(৭) **অতিরিক্ত উত্তর**। কোন কোন সময় ছাত্র নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য উত্তর দেওয়ার সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় আনিয়া ফেলে। তাহা করিতে গেলে তাহাকে তখনই থামাইয়া দিতে'হইবে এবং সে প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে লজ্জা দিতে হইবে। তাহাতেও তাহার সংশোধন না হইলে তাহাকে উত্তর দিতে না দিয়া অন্য ছাত্রকে প্রশ্ন করিতে হইবে।

(৮) **হাস্যাস্পদ উত্তর**। যদি নির্বুদ্ধিতার জন্য সেরূপ উত্তর দেয় তবে তাহাকে শাস্তি না দিয়া বরং প্রশ্নটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া ঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোন ছাত্র শিক্ষককে অপ্রস্তুত করার জন্য সেরূপ উত্তর দিয়াছে তবে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে।

(৯) **অনেক ছেলের একসঙ্গে উত্তরদান** বা তাহার জন্য নির্বাচনের পূর্বে কাহারও উত্তর দান। কোন নূতন শ্রেণীতে পাঠ দিতে হইলে' প্রথমেই

বলিয়া দিতে হইবে যে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে যেন কেহ উত্তর না দেয় ; সকলে যেন উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং যে ঠিক উত্তর দিতে পারে সে যেন হাত উঠায় ; তাহার পর উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষক যাহাকে নির্বাচন করেন সেই উত্তর দিবে। কোন ছাত্র যদি ইহার ব্যতিক্রম করে তাহাকে সেই দিনের জন্য কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। তাহা সত্ত্বেও যদি নির্বাচনের পূর্বে অনেক ছাত্র একসঙ্গে উত্তর দেয় তবে তাহাদের সকল উত্তর অগ্রাহ্য করিয়া অন্য একজনকে উত্তর দিতে বলিতে হইবে। তাহার পরও যদি একসঙ্গে উত্তর দিতে চাহে তবে অবাধ্যতার সামিল হইবে এবং তাহার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে।

(১০) শুদ্ধ উত্তর দান করিতে সমস্ত ছাত্রের অকৃতকার্যতা। যদি তাহা হয় তবে মনে করিতে হইবে যে শিক্ষকের পাঠদান-কার্যে বিশেষ কোন ভ্রমত্রুটি আছে। সুতরাং তাঁহাকে আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে এবং নিজের ভ্রমত্রুটি সংশোধন করিয়া পুনঃ বিষয়টি বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তবে যদি দেখা যায় যে ছাত্রগণ কোন কারণে দলবদ্ধ হইয়া ইচ্ছাপূর্বক উত্তর দিতেছে না তবে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজনকে খুব সহজ প্রশ্ন করিতে হইবে এবং তাহার উত্তর না দিলে অবাধ্যতার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে।

উত্তর গ্রহণে শিক্ষকের কতিপয় ভুল

(১) শিক্ষকের অভিপ্সিত আকারে বা ভাষায় প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া শুদ্ধ উত্তর অগ্রাহ্য করা। ইহা অত্যন্ত গুরুতর ভুল। কারণ ইহাতে ছাত্রকে অন্ধভাবে শিক্ষকের অনুকরণ করিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহা না করিয়া ছাত্র যদি নিজ ভাষায় গুছাইয়া শুদ্ধ উত্তর দিতে পারে তবে তাহাকে বরং প্রশংসাই করা উচিত।

(২) উত্তর প্রাপ্তির জন্য শিক্ষকের অসহিষ্ণুতা। অনেক শিক্ষক প্রশ্ন করার পর ছাত্রগণকে চিন্তা করিতে কিছুমাত্র সময় না দিয়া তখন তখনই উত্তর আদায় করিতে চাহেন এবং সেই উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের আবৃত্তি করিতে থাকেন। ইহাও শিক্ষকের ভুল। ইহাতে ছাত্রের চিন্তার ব্যাঘাত হয়।

(৩) অল্প কয়েকজন ছাত্রকেই বারবার উত্তর দানের জন্য নির্বাচন করা।

(৪) ছাত্রের প্রদত্ত উত্তর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা।

কোন কোন শিক্ষকের উত্তর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার কু-অভ্যাস আছে। ইহাতে তাঁহারা ছাত্রের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন।

(৫) উত্তর গ্রহণে বা সংশোধনে অত্যধিক সময় নষ্ট করা। অনেক সময় উত্তরের খুটিনাটি বিচারে শিক্ষক বেশী সময় নষ্ট না করেন, অথবা উত্তর গ্রহণ করিবেন কি অগ্রাহ্য করিবেন ইতস্ততঃ করিয়া সময় নষ্ট করেন। ইহাতে কেবল মূল্যবান সময় নষ্ট হয় না, পাঠের চিত্তাকর্ষক শক্তিও নষ্ট হয় এবং ছাত্রের নিকট শিক্ষকের দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

(৬) ছাত্রগণকে উত্তর সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতে দেওয়া। মৌখিক উত্তর দেওয়ার জন্য ছাত্রগণ পরস্পরকে সাহায্য করা এবং পরীক্ষায় একজন আর এক-জনকে সাহায্য করা সমান অপরাধ। সুতরাং কঠোরতার সহিত এই মন্দ অভ্যাস সংশোধন করিতে হইবে। যে ছাত্র ইঙ্গিত করিতেছে তাহাকে প্রথমে সাবধান করিতে হইবে, একটা কঠিন প্রশ্ন করিয়া লজ্জা দিতে হইবে, স্থানান্তরে বসিতে দিতে হইবে এবং সর্বশেষে প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত শাস্তিও দিতে হইবে।

(৭) শিক্ষকের নিজে প্রশ্নের উত্তর করা।

ছাত্র প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব করিলে কোন কোন শিক্ষক নিজেই প্রশ্নের উত্তর দেয় বা উত্তর সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেন। ইহাও তাঁহাদের অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক। কোন প্রশ্ন করিয়া শিক্ষকের নিজে তাহার উত্তর দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। যদি কোন ছাত্রই শুদ্ধ উত্তর দিতে না পারে তবে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার পাঠদানই ফলপ্রসূ হয় নাই। সুতরাং প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বিষয়টা পুনঃ বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দেওয়াই তাঁহার উচিত। কিন্তু যদি দেখা যায় যে ছাত্রগণ উত্তর জানে কিন্তু গুছাইয়া বলিতে পারিতেছে না, সেই কার্যে শিক্ষক তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন।

(৮) উত্তর অনুমোদন বা অগ্রাহ্য কোনটাই না করা।

কোন কোন শিক্ষক একজন ছাত্রের উত্তর অনুমোদন বা অগ্রাহ্য না করিয়াই অন্য একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করেন। ইহাতে শুদ্ধ উত্তর সম্বন্ধেও ছাত্রগণের মনে সন্দেহ থাকিয়া যাইতে পারে এবং অশুদ্ধ উত্তরকেও শুদ্ধ উত্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

(৯) নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ পায় বলিয়া ভুল উত্তর সংশোধন না করা। শিক্ষককে যাহাতে এরূপ অবস্থায় পড়িতে না হয় তাহার জন্য পাঠদানের পূর্বে তাহার ভালরূপে প্রস্তুত হওয়া উচিত। তাহা সত্ত্বেও যদি কোন বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ থাকে তবে তাহা এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নহে। শ্রেণীতেই অভিধান বা reference পুস্তক দেখিয়া তাঁহার নিজ সন্দেহ দূর করিতে পারেন অথবা পরের দিন সঠিক উত্তর দিবেন বলিতে পারেন। এমন কি নিজের কোন ভ্রমপ্রমাদ হইলে তাহাও সরলভাবে স্বীকার করা উচিত, তাহাতে তাঁহার প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা বাড়িবে বই কমিবে না ; বরং তাঁহার ভুল চাপা দিতে গেলেই ছাত্রের শ্রদ্ধা হারাইবেন। শিক্ষকের ভুল না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ভুল হইলে তাহা সরল ভাবে স্বীকার করা উচিত।

৬। **পাদপূরণ** (Ellipses)

একটা বাক্য বা বর্ণনার মধ্যে একটা বা বেশী শব্দ উহ্য রাখা যায় এবং ছাত্রদিগকে তাহা পূরণ করিতে বলা যায়। ইহাকেই পাদপূরণ বলে। প্রশ্নের ন্যায় ইহা **মৌখিক** এবং **লেখ্য** দুই রকমই হইতে পারে। পূর্বে কেবল সাহিত্যের পাঠেই ইহার ব্যবহার হইত। বর্তমানে প্রায় সকল পাঠে ইহার ব্যবহার হয়। পাঠদানের সময় পরীক্ষা ও শিক্ষার জন্য ইহার মৌখিক ব্যবহার হইতে পারে। ইহাও অনেকটা প্রশ্নের সমরূপ, তবে প্রশ্ন হইতে ইহার উত্তর দেওয়া সহজ হয় এবং উত্তরদানকার্যে শিক্ষক সহযোগিতা ও সাহায্য করিতে পারেন ; তাই ইহা শিশুগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

পাদপূরণের উদাহরণ—(১) মানুষ কেবল—পূরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। (২) ঈশ্বর আমাদিগকে যেমন—করিয়াছেন— করিতেছেন,

তেমন—করিতেও পারেন। (৩) খৃঃ পূঃ—অব্দে—যুদ্ধে আলেকজাণ্ডার পুরুকে—করেন, তাহার পর তিনি সসৈন্যে—নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু —সম্রাটের——কথা শুনিয়া তাঁহার সৈন্যগণ——এবং তাহারা——অস্বীকার করে। তখন তিনি—নদী পর্যন্ত যান। তথা হইতে—নদী বাহিয়া—নিকট সমুদ্রোপকূলে পৌছিলেন।

(৪) ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তে—পূর্বপার্শ্বে—দক্ষিণপার্শ্বে—ও পশ্চিম পার্শ্বে—।

পাদপূরণ কৌশলের বিশেষ সুবিধা

(১) অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ অনেক সময় প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কি আকারে উত্তর দিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে পারে না। পাদপূরণ কৌশলের সাহায্যে উত্তরের কাঠাম সরবরাহ করিয়া এই অসুবিধা দূর করা যায়।

(২) প্রশ্নের উত্তরদান হইতে অধিকতর তৎপরতার সহিত পাদপূরণ করা যায়। তাই ইহার ব্যবহার করিলে ছাত্রগণকে তৎপরতার সহিত মনোযোগ দিতে হয় ও চিন্তা করিতে হয় এবং তাহারা ইহাতে আনন্দ উপভোগ করে।

(৩) ইহার সাহায্যে দ্রুত অনেক বিষয় ছাত্রের সামনে ধরা যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে ও সংক্ষেপে পুনরালোচনা করা যায়।

(৪) ইহাতে ছাত্র সংক্ষেপে ও সম্পূর্ণ আকারে প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং সঠিকভাবে, সরল ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে।

(৫) ইহাতে সহজে ও সঠিকভাবে উত্তরের মূল্য নিরূপণ করা যায়।

(৬) ইহাদ্বারা ছাত্রকে চিন্তা করিতে ও শিক্ষা করিতে উৎসাহ দেওয়া যায় এবং তাহার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

(৭) শ্রেণীবদ্ধ পাদপূরণের ব্যবহার করিয়া ছাত্রকে বিচার ও সিদ্ধান্ত করার কার্যে সাহায্য করা যায় বা পরিচালিত করা যায়।

(৮) ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্য ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়া যায়।

(৯) ইহা দ্বারা পাঠে একটা আনন্দদায়ক পরিবর্তন হয়।

পাদপূরণের ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধানতা

(১) নিম্ন শ্রেণীতে ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার সময়ই ইহার বেশী ব্যবহার করা উচিত। উপরের শ্রেণীতে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস করিতে হয়। তবে নূতন প্রণালীতে লেখা পরীক্ষার জন্য উচ্চ শ্রেণীতেও ইহার ব্যবহার করা যায়।

(২) কেবল মাত্র এই কৌশলের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া কঠিন, প্রশ্নের সহযোগেই ইহার ব্যবহার করিতে হয়।

(৩) পাদপূরণ করিতে দিলে অনেক ছাত্রের একসঙ্গে উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা বেশী, অথচ তৎপরতার সহিত উত্তর দিতে না দিলে ইহার মূল্য থাকে না। এই উভয় বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিক্ষক ব্ল্যাক-বোর্ডে পাদপূরণের প্রশ্ন লিখিয়া দিতে পারেন এবং শ্রেণীর ছাত্রগণকে তাহা পড়িতে ও চিন্তা করিতে কিছুক্ষণ সময় দিতে পারেন। তাহার পর তৎপরতার সহিত এক এক ছাত্রকে এক একটা পাদপূরণ করিতে বলিতে পারেন।

(৪) পাদপূরণের উত্তর দেওয়া সহজ হইলেও ইহা ঠিকভাবে তৈয়ার করিবার জন্য শিক্ষককে যথেষ্ট চিন্তা করিতে হয়। সুতরাং পাঠ দেওয়ার পুর্বেই ইহা তৈয়ার করা প্রয়োজন।

৭। সরব পঠন ও নীরব পঠন

পাঠদানের সময় সরব পঠন ও নীরব পঠন উভয়েরই প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু সকল স্থলে উভয়ে সমান উপযোগী নহে। তাই নিম্নে তাহাদের মূল্য ও ব্যবহার সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করা হইল।

সরব পঠনের উপকারিতা

(১) সরব পঠনের দ্বারা ভাল উচ্চারণ শিক্ষা হয় এবং মৌখিক বর্ণনা দেওয়ার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(২) ইহাতে ভাষার প্রতি বেশী লক্ষ্য থাকে এবং শিশুর ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

(৩) ইহার দ্বারা পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগ দানের সাহায্য হয়। কারণ ইহাতে দর্শন, শ্রবণ ও বাক্ এই তিন ইন্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহার হয়। সুতরাং ইহা ছোট শিশুগণের বেশী উপযোগী।

(৪) বেশী মনোযোগ দান করার ফলে বিষয় স্মরণ রাখারও সাহায্য হয়। বিশেষতঃ অক্ষরশঃ স্মরণ রাখার জন্য ইহা বেশী উপযোগী।

(৫) কোন কোন বিষয় আবৃত্তি বা অভিনয়ের আকারে পাঠ করিলে বেশী শিক্ষা হয় ও স্মরণ থাকে।

অসুবিধা বা অপকারিতা

(১) ইহাতে কোন বিষয় পাঠের জন্য বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়, তাই পাঠোন্নতি কম হয়।

(২) ভাব হইতে ভাষার দিকে বেশী লক্ষ্য থাকায় ইহাতে মর্মানুসরণে বাধা হইতে পারে বা ছাত্র মর্মানুসরণ না করিয়াও পড়িতে পারে।

(৩) বেশী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে মনোযোগ দানের সাহায্য না হইয়া বরং বাধা হইতে পারে এবং ইহাতে ছাত্রের বেশী পরিশ্রম হয়। নিজে শিক্ষা করিবার জন্য পড়িতে হইলে নিজের উচ্চারণ সুস্পষ্টভাবে নিজের কানে পৌঁছে এইরূপ স্বরে পরা ভাল, তাহা হইতে উচ্চ বা নিম্নস্বরে পড়া উচিত নহে। শ্রেণীতে পড়িবার সময় শ্রেণীর সকল ছাত্র শুনিতে পায় এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে হয়, কোন সময়েই চেঁচাইয়া পড়া উচিত নহে।

(৪) ইহার দ্বারা পরস্পরের পাঠে ব্যাঘাত হয়। তাই বেশী ছাত্র একস্থানে, একসঙ্গে পড়িতে পারে না।

নীরব পঠনের উপকারিতা

(১) ইহা মর্মানুসরণের সাহায্য করে। কারণ ইহাতে ভাষা হইতে ভাবের প্রতিই বেশী লক্ষ্য থাকে।

(২) ইহার সাহায্যে অল্প সময়ে বেশী বিষয় পাঠ করা যায়।

(৩) সরব পঠন হইতে ইহাতে কম পরিশ্রম হয়।

(৪) অনেক ছাত্র একস্থানে বসিয়া নীরবে পাঠ করিতে পারে এবং বিভিন্ন বিষয় পাঠ করিতে পারে।

(৫) ইহাদ্বারা ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের শক্তি ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়। কারণ ইহাতে তদুভয়ের যথেষ্ট ব্যবহার হয়।

(৬) ইহাদ্বারা শিশু স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

(৭) মৌখিক বর্ণনা শ্রবণের বা সরব পঠনের পর নীরব পাঠ করিতে দিলে হিতকারী পরিবর্তন হয়।

(৮) ইহার অভ্যাস হইলে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার সাহায্যে নানা পুস্তক পড়িয়া তাহার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারে। বস্তুতঃ বয়স্ক লোকে সাধারণতঃ নীরব পঠনের সাহায্যেই জ্ঞানার্জন করে।

অপকারিতা বা অসুবিধা

(১) ইহা ছোট শিশুর পক্ষে উপযোগী নহে। কারণ ইহাতে বেশী ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতে হয় এবং কেবল একটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিতে হয়।

(২) ইহাতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা হয় না ও মৌখিক বর্ণনাশক্তি বৃদ্ধি পায় না।

(৩) ইহাতে ভাষার প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হয় না এবং ফলে ভাল ভাষাজ্ঞান হয় না।

(৪) ইহাতে শিশুর ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে না।

অল্পবয়স্ক শিশুগণের পক্ষে সরব পঠনই বেশী উপযোগী। বস্তুতঃ ইহার সাহায্য ব্যতীত তাহারা জ্ঞানার্জন করিতে পারে না। সুতরাং নিম্ন শ্রেণীতে ইহার বেশী ব্যবহার করিতে হয়। বিশেষতঃ সাহিত্য ও অন্যান্য বর্ণনামূলক পাঠের জন্য সরব পঠনই বেশী উপযোগী। কিন্তু বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণকে নীরব পঠনের জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তাই উচ্চ শ্রেণীতে ইহারই বেশী ব্যবহার করা উচিত। বিশেষতঃ আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে এত বেশী বাচনিক পাঠ দেওয়া হয় যে, সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা নীরব পঠনের ব্যবস্থা করিলে একটা হিতকারী পরিবর্তন হইবে এবং ছাত্রদের একটা ভাল অভ্যাসও গঠিত হইবে। তবে সাহিত্য পাঠের জন্য সকল স্তরেই সরব পঠন বেশী উপযোগী।

গণিত বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পাঠের জন্য নীরব পঠনই শ্রেষ্ঠ। উচ্চ শ্রেণীতে সাহিত্যের পাঠেও সরব পঠনের পর নীরব পঠনের ব্যবস্থা বিধেয়।

(৮) পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা (Repetition and Recapitulation)।

পাঠ্যবিষয় ঠিকভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হয় না, তাহা তাহাদের মনে গাঁথিয়া দেওয়াও প্রয়োজন। তাহা না করিলে পাঠ্যবিষয় বেশীদিন স্মরণ থাকিবে না। ইহার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা যায়, পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা তাহাদের মধ্যে দুইটি। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর জোর দিয়া বর্ণনা করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি ২।১ বার পুনরাবৃত্তি করাও প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের দ্বারাও পুনরাবৃত্তি করাইতে পারা যায়। তাহার পর এক এক সোপানের শেষে এবং পাঠের শেষে প্রশ্নের সাহায্যে বিষয়টি ছাত্রের দ্বারা পুনরালোচনা করাইলে তাহা আরও বেশী স্মরণ থাকে।

কিন্তু দীর্ঘকাল স্মরণ থাকার জন্য ইহাও যথেষ্ট নহে। স্মৃতিশক্তির অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে হইলে শিক্ষা করার এক বা দুইদিন পরে তাহার পুনরাবৃত্তি বা পুনরালোচনা করা প্রয়োজন। শ্রেণীতে তাহা করা সম্ভব নহে, সুতরাং ছাত্রকে বাড়ীতেই তাহা করিতে হয়। কিন্তু শিক্ষক পরের দিন সেই বিষয়ে নূতন পাঠ দেওয়ার পূর্বে কয়েকটি প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের পূর্বপাঠ কতটা স্মরণ আছে পরীক্ষা করিতে পারেন। ইহার পর খুব ছোট শিশুর বেলায় সপ্তাহের শেষে, তাহা হইতে বড় ছেলেমেয়ের বেলায় মাসের শেষে এবং আরও বয়স্ক ছাত্রছাত্রীর বেলায় এক এক termএর শেষে অধীত বিষয়ের মৌখিক বা লেখ্য পরীক্ষা করিলেই তাহার পুনরালোচনা হইবে। এক এক term-এর ও বৎসরের শেষ ভাগে সমস্ত অধীত বিষয়ের পুনরালোচনামূলক পাঠ দিলে তাহা আরও দীর্ঘকাল স্মরণ থাকিবে।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিষয়ভেদে পুনরালোচনার আকারও ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করিয়াও তাহার ভাল পুনরালোচনা করা যায়। যথা—গণিতের কোন নিয়মের অঙ্ক করিলে, জ্যামিতির extra করিলে,

ভূগোলে কোন দেশের মানচিত্র অঙ্কিত করিলে, সাহিত্যে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে রচনা লিখিলে, ইতিহাসে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর করিলেও তাহাদের ভাল পুনরালোচনা হইবে।

৯। সারাংশ গঠন

পাঠ্যবিষয় ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়ার ইহাও একটা উৎকৃষ্ট উপায়। পাঠের সারাংশে কেবল খুব প্রয়োজনীয় কথা বা তথ্যগুলিই থাকে এবং তাহার দ্বারা সেইগুলির প্রতি বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় এবং সেইগুলি ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়া হয়। ইহার সাহায্যে ছাত্রগণ পরেও প্রয়োজনীয় বিষয়-গুলির প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়া অধীত বিষয়ের পুনরালোচনা করিতে পারে। পাঠের সারাংশ যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে এবং ছাত্রগণের সহযোগিতায় তাহা গঠন করিতে হইবে। অবশ্য সকল বিষয়ে পাঠের সারাংশ গঠন করার প্রয়োজন হয় না বা সম্ভব হয় না। যেমন ইতিহাসের পাঠে সারাংশ গঠন করিয়া তাহা ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া দেওয়া যায়, এবং ছাত্রগণকেও লিখিয়া লইতে বলা যায়। প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠেও ইহার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য বিষয়ের পাঠে সকল সময় সারাংশ গঠনের প্রয়োজন হয় না। গণিত, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে যে নিয়ম বা সূত্র গঠন করা হয় তাহা লিখাইয়া দিলেই হয়। সাহিত্যের পাঠে কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ, বাক্যের ব্যাখ্যা ইত্যাদি লিখাইয়া দিতে হয়।

১০। নোট গ্রহণ বা ছাত্রদের নিজে সারমর্ম লেখা।

পাঠের সারমর্ম ছাত্রগণ নিজে লিখিয়া লইতে পারিলেই তাহারা যে পাঠানুসরণ করিয়াছে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাহা নহে, ইহাতে পাঠ্যবিষয় উপলব্ধি করার কার্যেও তাহাদের সাহায্য হয় এবং অর্জিত জ্ঞান তাহাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব হয়। ইহার সাহায্যে তাহারা ভবিষ্যতেও বিষয়টি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে পারে এবং ইহা তাহাদিগকে স্বচেষ্টায় জ্ঞানার্জনের জন্যও তৈয়ার করে। কেননা এই অভ্যাস গঠিত হইলে তাহারা সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া বা নূতন নূতন পুস্তক পড়িয়া তাহার সারমর্ম লিখিয়া রাখিতে পারে এবং এইরূপে তাহাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারে।

বস্তুতঃ জ্ঞানসাগর এত বিশাল ও গভীর যে বর্ণনা শুনিয়া বা পুস্তক পড়িয়া সারমর্ম লিখিয়া লওয়ার কাজে দক্ষতা অর্জন করিতে না পারিলে কেহই জ্ঞানসাগরে ডুব দিয়া বিচক্ষণ ডুবুরীর ন্যায় মণিমুক্তা সংগ্রহ করিতে পারে না। কিন্তু শিশুগণ প্রথমে নিজে এই কাজ দক্ষতার সহিত করিতে পারে না। প্রথমে শিক্ষককেই তাহাদের সহযোগিতায় পাঠের সারাংশ গঠন করিয়া তাহা বোর্ডে লিখিয়া দিতে হয়। ইহার পর মধ্য বাঙ্গলা স্তরে সময় সময় সারাংশ গুছাইয়া মুখে বলিয়া ছাত্রগণকে লিখিয়া লইতে দেওয়া যায়। আরও পরে সময় সময় পাঠের শেষে ছাত্রগণকেই সারাংশ লিখিয়া ফেলিতে বলা যায়। সর্বশেষে (উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে স্তরের শেষভাগে) ছাত্রগণকে শিক্ষকের কোন বর্ণনা শুনিয়া বা পুস্তক পড়িয়া তাহার সারমর্ম লিখিয়া লইতে শিক্ষা দেওয়া যায়। এই ভাবেই ছাত্রগণকে নিজে নোট লিখিবার জন্য প্রস্তুত করা যায়। নূতন শিক্ষাদান-প্রণালীতে ছাত্রের নোট গ্রহণ বা সারাংশ লিখিয়া লওয়ার উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পাঠে, পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র এরূপ নোট বা সারাংশ লিখিয়া যাইবে যাহার সাহায্যে সে ঠিক ভাবে পাঠ্য পুস্তক পড়িতে পারে, এমন কি তাহার পরিবর্তেও ব্যবহার করিতে পারে। [J. Adams—Modern Developments in Education. p. 215.]

১১। পরীক্ষা

পরীক্ষার দ্বারাও অধীত বিষয়ের পুনরালোচনার ব্যবস্থা করা যায়। নিম্ন শ্রেণীতে ছাত্রেরা লিখনকার্যে দক্ষতা লাভ করে না বলিয়া চতুর্থ মান পর্যন্ত গণিত ও মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা ভাল। আরও উপরের শ্রেণীতে সমস্ত বিষয়ে লেখা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এই পরীক্ষা সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক হইতে পারে। প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে এক এক বিষয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। ইহার সুবিধা এই যে প্রায় এক মাসের পর প্রত্যেক বিষয়ের একটা পরীক্ষা হয় এবং এক এক বিষয়ের পরীক্ষা হয় বলিয়া ছাত্রগণকে এক সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না। মধ্য বাঙ্গলা স্তর পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই ভাল। তিন মাস পর পর বা এক এক

termএর শেষেও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে ইহাই বেশী উপযোগী। ইহাতে একসঙ্গে সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা করিতে হয় এবং ছাত্রগণকে এক সময়ে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া কেহ কেহ এই স্তরেও সাপ্তাহিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী।

এখন দেখা প্রয়োজন যে, বাৎসরিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না। সমস্ত বিষয়ে এক বৎসরে অর্জিত জ্ঞানের এক সঙ্গে পরীক্ষা হয় বলিয়া ইহাতে ছাত্রগণকে এক সময়ে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং ইহার দ্বারা না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়াও উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে। এই জন্য কেহ কেহ বার্ষিক পরীক্ষার বিরোধী, সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফল বিবেচনা করিয়াই ছাত্রগণকে প্রমোশান দিতে বলেন। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা তুলিয়া দিলে বিষয়ের এক এক অংশের সাপ্তাহিক পরীক্ষা হওয়ার পর সেই সেই অংশের আর পুনরালোচনা না হইতে পারে এবং সমস্ত বিষয়ের একসঙ্গে পুনরালোচনারও কোন ব্যবস্থা হয় না। সমস্ত বৎসর নিয়ম মত অধ্যয়ন করিলে এবং কিছু সময় পর পর পুনরালোচনা করিলে বার্ষিক পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না। ঠিকভাবে শিক্ষা দিলেও চতুরতার সহিত (Skilfully) প্রশ্ন করিলে না বুঝিয়া মুখস্থ করার অভ্যাসও হইতে পারে না। সুতরাং সাপ্তাহিক বা ত্রৈমাসিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বার্ষিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তবে কেবল বার্ষিক পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত বৎসরের পরীক্ষার ফল এবং গৃহকাজও বিবেচনা করিয়া ছাত্রের পাঠোন্নতি নির্ধারণ করা যায় এবং প্রমোশান দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিষয়ে সমস্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত এবং গৃহকাজের জন্য প্রাপ্ত নম্বরগুলির গড় নির্ধারণ করিয়া তাহার দ্বারাই ছাত্রের পাঠোন্নতি নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

বহিঃপরীক্ষা (External or Public Examination)।

বিভিন্ন স্তরের শেষে বর্তমানে যে বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উঠিয়াছে। যথা,—

(১) ইহার জন্য ছাত্রকে এক সময়ে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং তাহার ফলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয়।

(২) ইহার দ্বারা ভালভাবে উপলব্ধি না করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিষয় শিক্ষার বা মুখস্থ করার (cramming) উৎসাহ দেওয়া হয়।

(৩) ইহার দ্বারা সকল সময়ে প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বিষয়ের ভালজ্ঞান অর্জন করিয়াও পরীক্ষার সময় সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না, অন্য কেহ কেহ ভালভাবে বিষয়গুলি অধ্যয়ন না করিয়াও নির্বাচিত কতিপয় প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা করিয়াই পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

(৪) ইহার ফলে জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে পরীক্ষা পাশই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে।

(৫) রচনার আকারে উত্তর দিতে হয় বলিয়া ইহাদ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হইতে ভাষাজ্ঞান এবং গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতারই অধিকতর পরীক্ষা হয়।

(৬) পরীক্ষকের মতামত, মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা উত্তরের মূল্য নিরূপণ প্রভাবিত হয়। ইহা দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন পরীক্ষক একই উত্তরের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন। ২০ নম্বরের একটা প্রশ্নের একই উত্তরের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষক ৬ হইতে ১৬ নম্বর দিয়াছিলেন। এমন কি একই পরীক্ষক বিভিন্ন সময়ে একই উত্তরে বিভিন্ন মূল্য নিরূপণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বর্তমান বহিঃপরীক্ষা-পদ্ধতির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলিও আছে।—

(১) ইহা এক স্তরে অধীত সমস্ত বিষয়ের পুনরালোচনার এবং অর্জিত জ্ঞান পরীক্ষার সুযোগ দেয় এবং পরের স্তরে পাঠের উপযুক্ততা নির্ধারণ করে।

(২) ইহার দ্বারা ছাত্রগণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান গুছাইয়া নিজের ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি লাভ করে এবং তাহাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

(৩) বহুসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া, ইহা জ্ঞান লাভে ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে প্রবল প্রেরণা দেয়।

(৪) ইহার সাহায্যে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন করা যায়।

সুতরাং দেখা যায় যে নানা দোষ সত্ত্বেও বহিঃপরীক্ষার যথেষ্ট সুবিধা বা উপকারিতাও আছে। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় উহা কিছুতেই বন্ধ করা যায় না। তবে উহার পূর্ববর্ণিত দোষগুলির প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যায়।

(১) ছাত্রের দৈনন্দিন কাজ এবং বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলির ফল সন্তোষজনক না হইলে তাহাকে বহিঃপরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায়।

(২) নিজে চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে হয় এবং উত্তর খুব দীর্ঘ না হয় এরূপ অনেকগুলি প্রশ্ন করিলে, মুখস্থ করিয়া বা কতিপয় নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা পাশের সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে। নূতন পরীক্ষা-প্রণালীতে এইরূপ ছোট ছোট অনেক প্রশ্ন করিতে বলা হইয়াছে।

(৩) শিক্ষাদান-পদ্ধতির উন্নতিসাধন করিয়াও পরীক্ষার অনেক দোষের প্রতিকার করা যায়। প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়া জ্ঞানতৃষ্ণা জাগরিত করিতে পারিলে, ছাত্রগণ পরীক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়া জ্ঞানার্জনে রত হইবে।

(৪) বিভিন্ন স্তরের শেষ পরীক্ষার সংখ্যা হ্রাস করা যায়। প্রাথমিক স্তরের এবং মাধ্যমিক স্তরের শেষে এক একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হয়।

(৫) সংখ্যার দ্বারা উত্তরের মূল্য নিরূপণ না করিয়া, উত্তরগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এক এক বিষয়ের বিভিন্ন উত্তরের অধিকাংশ যেই শ্রেণীভুক্ত হয় তাহার দ্বারা সেই সেই বিষয়ের উত্তরের মূল্য নির্ধারণ করা যায়। যথা,—কোন বিষয়ের ১০টা প্রশ্নের মধ্যে ৬টা প্রশ্নের উত্তর ক শ্রেণীভুক্ত হইলে, সেই বিষয়ের মোট উত্তরই ক শ্রেণীভুক্ত করা যায়। সেইরূপ আটটি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটি বিষয়ে কোন ছাত্র 'ক' পাইলে তাহাকে সেই পরীক্ষায় 'ক' বা ১ম শ্রেণীভুক্ত করা যায়। অথবা বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার ফল বিভিন্ন

শ্রেণীভুক্ত করা যায়। যথা,—বাংলা, ইতিহাস (ক), গণিত, ভূগোল (গ), বিজ্ঞান, অঙ্কন (ঘ)।

(৬) রচনার আকারে উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (Subjective Tests) এবং নির্দিষ্ট আকারে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (Objective Tests) সমান সমান থাকিলে উভয় প্রকারের পরীক্ষার উপকার পাওয়া যাইতে পারে এবং কুফল নিবারিত হইতে পারে।

নির্দিষ্ট আকারে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (Objective tests)। এইরূপ প্রশ্নের উত্তর কেবল একটা হইতে পারে এবং উহা খুব সংক্ষেপে দেওয়া যায়। ইহার দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়, এবং পরীক্ষকের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা ইহার উত্তরের মূল্য নিরূপণ প্রভাবিত হয় না।

এই প্রশ্ন পাঁচ প্রকারের হইতে পারে। যথা,—

(১) সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন (True-false Test)। ইহাতে সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত থাকে এবং তাহার মধ্য হইতে সত্য তথ্যগুলি বাছিয়া লইয়া চিহ্নিত করিতে হয়। যথা,—

মানুষই একমাত্র দ্বিপদ জীব। খেচর মৎস্য আছে। সূর্য প্রত্যহ পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। ভূচর ও জলচর পক্ষী আছে। আলেকজাণ্ডার চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করিয়া মৌর্য সাম্রাজ্য অধিকার করেন। বলি দ্বীপ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত।

(২) নানাপ্রকার উত্তর হইতে শুদ্ধ উত্তর বাছিয়া লওয়ার প্রশ্ন (Multiple Choice)। যথা,—

(ক) ওয়াশিংটন, (খ) লিন্‌কলন, (গ) কলাম্বাস—আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

(৩) দুই শ্রেণীর কতকগুলি বস্তু বা তথ্য হইতে সম্পর্কযুক্ত দুই দুই বস্তু বা তথ্য বাছিয়া লইয়া যুক্ত করা (Matching) ; যথা,

৪৮৩ খৃঃ পূঃ	পাণিপথের ৩য় যুদ্ধ হয়।
১৭৬১ খৃঃ অঃ	পলাশীর যুদ্ধ হয়।
১৭৫৭ খৃঃ অঃ	বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়।

(৪) সম্পূর্ণ করার প্রশ্ন (Completion)।

(ক) কলাম্বাস............. খৃষ্টাব্দে.................মহাদেশ আবিষ্কার করেন।

(খ) বাবর.................. খৃষ্টাব্দে...........কে...........যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

(৫) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন (Short answer Test)।

(ক) মাধ্যাকর্ষণ কে আবিষ্কার করেন ?

(খ) কোন্ বৈদেশিক আক্রমণকারী সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ?

(গ) ঐতিহাসিক যুগের সর্বপ্রথম ভারত-সম্রাট কে ?

(ঘ) কোন্ দেশকে এশিয়ার বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জ বলা হয় ?

(ঙ) কোন্ দেশের অধিবাসীর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ?

১০। গৃহকাজ

বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের পর বাড়ীতে ছাত্রকে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন কাজ করিতে দেওয়াও শিক্ষাদানের একটা প্রকৃষ্ট উপায় বলা যাইতে পারে। কেননা, ছাত্র বিদ্যালয়ে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা থাকে, অবশিষ্ট ১৯ ঘণ্টা সে গৃহে অবস্থান করে। এই সময়ের মধ্যে খেলাধূলা, আহার-বিহার ও নিদ্রার জন্য ১১।১২ ঘণ্টা রাখিয়া দিলেও সে ৭।৮ ঘণ্টা শিক্ষার কাজ করিতে পারে। সুতরাং ছাত্রজীবনের মূল্যবান্ সময় নষ্ট না করিয়া তাহাকে গৃহে অবস্থানের সময়ও কিছু শিক্ষার কাজ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু গৃহকাজের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌গণ একমত নহেন। তাই এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইল।

গৃহকাজের উপকারিতা :—

(১) ইহার দ্বারা বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার **পুনরালোচনা ও প্রয়োগের** ব্যবস্থা হয়।

(২) **নূতন বিষয় শিক্ষার জন্য ছাত্রকে নিজে প্রথম চেষ্টা করিবার সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়া হয়।** শিক্ষা করা প্রকৃতপক্ষে ছাত্রেরই কাজ, শিক্ষক তাহাকে এই কঠিন কাজে সাহায্য করিতে পারেন মাত্র। সুতরাং ছাত্রকেই শিক্ষার জন্য প্রথম চেষ্টা করিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে সে কৃতকার্য হইতে না পারিলেও নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন হয়, শিক্ষকের নিকট হইতে কি সাহায্য পাওয়া দরকার তাহা ঠিক করিয়া রাখিতে পারে, এবং অধিকতর মনোযোগের সহিত পাঠ গ্রহণ করে।

(৩) বিদ্যালয়ের বাহিরেও তাহাকে কার্যে নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা হয় এবং তাহার ফলে সে কুচিন্তায় মগ্ন হইবার, কুকাজে রত হইবার বা কুসঙ্গে মিশিবার সময় পায় না।

(৪) বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায় ছাত্র **স্বচেষ্টায় তাহার অতিরিক্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারে।**

(৫) ইহাতে আত্মচেষ্টা ও আত্মনির্ভরতার উৎসাহ দেওয়া হয়।

(৬) সততার সহিত লিখিত গৃহকাজ করিলে ছাত্রের জ্ঞানোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্রকে অতিরিক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়।

গৃহকাজের অপকারিতা :—

(১) ইহাতে **ছাত্রের কাজের বোঝা বেশী হইতে পারে** এবং ফলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে।

(২) প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধানের অভাবে ছাত্র ভুল করিতে পারে এবং তাহা ভালরূপে সংশোধিত না হইলে সে **ভুল শিক্ষা করিতে পারে।**

(৩) লিখিত গৃহকাজ করিবার জন্য ছাত্র অসদুপায় অবলম্বন করিতে পারে এবং তাহার ফলে তাহার জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষকের ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে।

(৪) **শিক্ষক লিখিত গৃহকাজ সংশোধনের সময় না পাইতে পারেন** অথবা ইহাতে তাঁহার কাজের বোঝা অত্যন্ত ভারী হইয়া পড়িতে পারে। শিক্ষকগণের ইহা সাধারণ অভিযোগ এবং তাহা একান্ত ভিত্তিহীন নহে।

(৫) সংশোধিত গৃহকাজ ছাত্র নিজে পুনঃ পড়িয়া না দেখিতে পারে এবং তাহার **ভুল সংশোধন না হইতে পারে**। ইহা হইলে **গৃহকাজের দ্বারা ছাত্রের কোন উপকার** হইবে না, তাহা সংশোধনের জন্য শিক্ষকের শক্তির অপব্যয় হইবে মাত্র।

(৬) শিক্ষক শ্রেণীতে দক্ষতার সহিত পাঠদানের চেষ্টা না করিতে পারেন। তিনি গৃহকার্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াও তাহা পরীক্ষা করিয়া বা সংশোধন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন। ইহাতে শিক্ষক কেবল কার্য-আদায়কারী (Task Master) হইয়া পড়েন।

প্রতিকার ঃ—

(১) **বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট অনুশীলনের পূর্বে ছাত্রগণকে কোন গৃহকাজ দেওয়া উচিত নহে।** যে শ্রেণীতে যে রকম গৃহকাজ দেওয়া প্রয়োজন প্রথমে সে রকমের যথেষ্ট কাজ ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে করাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সময়-পত্রিকায় **শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি পাঠের** (Supervised Study) **বন্দোবস্ত** করিতে হইবে।

(২) ছাত্রের বয়স ও বিকাশ অনুযায়ী গৃহকাজের প্রকৃতি ও পরিমাণের তারতম্য করিতে হইবে। প্রথমে **কেবল পুনরালোচনামূলক কাজ করিতে পারে। তাহার পর প্রয়োগের কাজ করিতে পারে। সর্বশেষে নিজ চেষ্টায় শিক্ষার চেষ্টা করিতে পারে।**

(৩) গৃহকাজের, বিশেষতঃ লিখিত গৃহকাজের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া ছাত্রগণকে চিন্তা করিয়া ও সাবধানতার সহিত গৃহকাজ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। চিন্তা করিয়া ও সাবধানতার সহিত অল্প কাজ করিলেও ছাত্রগণের বেশী শিক্ষা হইবে।

(৪) গৃহকাজ যেন বিদ্যালয়ে প্রদত্ত পাঠের সহায়ক ও অনুপূরক হয়, কিন্তু পাঠের স্থান অধিকার না করে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৫) লেখা গৃহকাজের সমস্ত ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহার যেন পুনরাবৃত্তি না হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (৩২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

(৬) লেখা গৃহকাজ ছাত্রের নিজ কাজ নহে বলিয়া সন্দেহ হইলে শিক্ষক তাহা সংশোধন করিবেন না। ছাত্রের জ্ঞান ও তাহার লেখা কাজের প্রকৃতি (Quality) তুলনা করিয়া বুদ্ধিমান শিক্ষক সহজে ইহা নির্ধারণ করিতে পারিবেন। ইহার পরও সন্দেহ থাকিলে সেই সম্বন্ধে ২।১টি প্রশ্ন করিলে অথবা বিদ্যালয়ে সে কাজ পুনঃ করিতে দিয়া তাহা আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।

(৭) মধ্যে মধ্যে শ্রেণীতে গৃহকাজ করিতে দিলে ছাত্রের পাঠোন্নতির সঠিক প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

(৮) গৃহকাজের জন্য নম্বর দেওয়াও মন্দ নহে। ইহাতে ছাত্র অধিকতর যত্ন ও সাবধানতার সহিত গৃহকাজ করিতে উৎসাহিত হয়। তবে তাহা ছাত্রের নিজের কাজ নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহার জন্য যে কেবল কোন নম্বর দেওয়া হইবে না তাহা নহে, পূর্বে যে নম্বর দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও কিছু নম্বর বাদ দিতে হইবে।

বিভিন্ন স্তরে ছাত্রের গৃহকাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ।

শিশুশ্রেণী ঃ এই শ্রেণীতে গৃহকাজ দেওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ, এই বয়সের শিশু অন্যের সাহায্য না লইয়া লেখাপড়ার কাজ করিতে পারে না। তবে গৃহে তাহার কাজ তত্ত্বাবধানের উপযুক্ত লোক থাকিলে কেবল প্রাতে সে ২ ঘণ্টা লেখার ও পড়ার অভ্যাস করিতে পারে।

১ম ও ২য় মান (৬—৭ বৎসর) প্রাতে ২ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ১ ঘণ্টা মোট ৩ ঘণ্টার গৃহকাজ। বিদ্যালয়ে অধীত বিষয় পুনরধ্যয়ন ও হস্তলিপি।

৩য় ও ৪র্থ মান (৮—৯ বৎসর) প্রাতে ২॥ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ১॥ ঘণ্টা মোট ৪ ঘণ্টার গৃহকাজ। বিদ্যালয়ে অধীত বিষয় পুনরধ্যয়ন, নামতা শিক্ষা, হস্তলিপি, গণিতের অঙ্ক (প্রয়োগ) ইত্যাদি।

৫ম ও ৬ষ্ঠ মান (১০—১১ বৎসর) প্রাতে ৩ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ২ ঘণ্টা মোট ৫ ঘণ্টার গৃহকাজ পুনরধ্যয়ন ও প্রয়োগ (গণিতের অঙ্ক কষা, ব্যাকরণের উদাহরণ লেখা, অনুবাদ, রচনা ইত্যাদি)।

৭ম ও ৮ম মান (১২—১৩ বৎসর) প্রাতে ৩॥ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ২॥ ঘণ্টা, মোট ৬ ঘণ্টার গৃহকাজ। পুনরধ্যয়ন, প্রয়োগ, ও নূতন পাঠ শিক্ষার প্রথম চেষ্টা।

৯ম ও ১০ম মান (১৪—১৫ বৎসর) প্রাতে ৪ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ৩ ঘণ্টা, মোট ৭ ঘণ্টার গৃহকাজ। পুনরধ্যয়ন, প্রয়োগ, স্বচেষ্টায় নূতন বিষয় শিক্ষা এবং পাঠ্য বিষয়ে অন্য পুস্তক পাঠ।

লেখা গৃহকাজ সংশোধন ঃ

লেখা গৃহকাজ মাত্রেরই সংশোধন একান্ত আবশ্যক। কেননা, ভুল সংশোধন না করিলে ছাত্রগণ ভুল শিক্ষা করে। সুতরাং সংশোধনের ব্যবস্থা না করিয়া লেখা কাজ দেওয়াই উচিত নহে। অপরদিকে শিক্ষক লেখাকাজের ভুল সংশোধন করিয়া দিলেও ছাত্রগণ সকল সময় তাহার দ্বারা উপকৃত হয় না। কারণ, অনেক সময় তাহারা সংশোধিত লেখা পুনঃ পড়িয়াও দেখে না। সুতরাং ছাত্রগণের প্রকৃত উপকার হয় এমনভাবে লেখাকাজ সংশোধনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে ঃ—

(১) যখনই **সম্ভব ছাত্রগণের দ্বারাই তাহাদের ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করা যায়।** ইহাতে ছাত্রগণ তাহাদের ভুল সম্বন্ধে বেশী সচেতন হয় এবং অধিকতর মনোযোগের সহিত শুদ্ধ আকার শিক্ষা করে। যথা ঃ—

(ক) সহজ সহজ ভুলগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়া ছাত্রগণকে স্বচেষ্টায় তাহা সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা নিজে সংশোধন করিতে না পারিলেই শিক্ষকের সাহায্যপ্রার্থী হইবে।

(খ) পুস্তক দেখিয়া বা আদর্শ দেখিয়া সংশোধন করা সম্ভব হইলে শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে খাতা বিনিময় করিয়া তাহাদিগকেই পরস্পরের ভুল সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। অন্যের ভুল সংশোধন করিতে গিয়া তাহাদের নিজেরও শিক্ষা হইবে।

(গ) কেবল এক রকম শুদ্ধ আকার হইলে তাহা ব্ল্যাক-বোর্ডে লিখিয়া দিয়া ছাত্রগণকেই নিজ ভুল সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

(ঘ) এক একজন ছাত্রকে তাহার লেখা পড়িতে দিয়া শ্রেণীর সহযোগিতায় তাহা সংশোধন করা যাইতে পারে। নিম্নশ্রেণীতে প্রত্যেক ছাত্রকেই সমস্ত অংশ পড়িতে দিতে হইবে ও তাহা সংশোধন করিতে হইবে। উচ্চ শ্রেণীতে ২।৩ জন ছাত্রকে এক এক অংশ পড়িতে দিয়া এবং তাহা শ্রেণীর সহযোগিতায় সংশোধন করিয়া, অন্য ছাত্রগণকে সেই সেই অংশ সংশোধন করিয়া লইতে বলা যায়। অবশ্য অন্য কেহ সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে লিখিয়া থাকিলে তাহাকেও তাহার লেখা পড়িতে দিতে হইবে এবং তাহা সংশোধন করিতে হইবে। এইভাবে সংশোধিত কাজ ছাত্রগণকে পুনঃ লিখিতে হইবে এবং শিক্ষককে তাহা দেখাইতে হইবে। (গ্রন্থকার ৯ম এবং ১০ম শ্রেণীতেও এইভাবে অনুবাদ সংশোধন করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহাতে তাহাদের ভুল সংশোধিত হয় ও তাহারা উপকৃত হয়।)

(২) নিম্ন শ্রেণীর গৃহকাজ যতদূর সম্ভব শ্রেণীতেই সংশোধন করা উচিত, উচ্চ শ্রেণীতেও সময় সময় তাহা করা যায়। শ্রেণীর ছাত্রগণকে কোন কার্যে নিযুক্ত করিয়া এক একজন ছাত্রের লেখাকাজ শ্রেণীতেই সংশোধন করা যায়। ইহার বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাতে ছাত্রগণকে ব্যক্তিগতভাবে শুদ্ধ আকার শিক্ষা দেওয়া যায়। সুতরাং ইহা নিম্ন শ্রেণীর বেশী উপযোগী। ইহাতে পাঠদান-কার্য স্থগিত রাখিতে হয় বলিয়া উচ্চশ্রেণীতে ইহার বহুল ব্যবহার করা যায় না।

(৩) কতকগুলি লেখা কাজ ছাত্রদের দ্বারা বা শ্রেণীতে সংশোধন করা যায় না। যথা—**রচনা, সারাংশ** (Substance) এবং উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের **অনুবাদ** সাধারণতঃ শ্রেণীতে সংশোধন করা যায় না। এই সকল বিষয়ে

গৃহকাজের খাতা শিক্ষককে বাড়ীতে লইয়া গিয়া সংশোধন করিতে হয়।

(৪) কোন ছাত্র যদি মনোযোগ ও যত্নের সহিত গৃহকাজ না করে বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে তাহা না লেখে, শিক্ষক তাহা সংশোধন করিতে অস্বীকার করিবেন এবং ছাত্রকে তাহা পুনঃ করিতে বা লিখিতে দিবেন।

(৫) ব্যক্তিগতভাবে কোন গৃহকাজ সংশোধন করিলে ভুল হওয়ার কারণ দেখাইয়া দিয়াই শুদ্ধ আকার দেওয়া উচিত। শ্রেণীর বাহিরে সংশোধন করিলে **খাতা ফেরত দেওয়ার সময় সাধারণ ভুলগুলি ও তাহাদের শুদ্ধ আকার বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া উচিত** এবং ভুলের কারণ আলোচনা করা কর্তব্য।

(৬) কোন ছাত্র বেশী ভুল করিলে তাহাকে সংশোধিত কাজ পুনঃ লিখিতে দিতে হইবে। কেহ **ভুলের পুনরাবৃত্তি করিলে তাহাকে শুদ্ধ আকার অনেকবার লিখিতে দেওয়া উচিত** এবং সংশোধিত কাজ পুনঃ লিখিয়া দেখাইবার পূর্বে তাহার নূতন গৃহকাজ সংশোধন করা উচিত নহে। প্রয়োজন হইলে তাহাকে ছুটির পর আটক রাখিয়াও সংশোধন কাজ পুনঃ লেখাইতে পারা যায়। উপরিউক্ত প্রণালীতে গৃহকাজ সংশোধন করিলে, শিক্ষকের কাজের বোঝা হালকা হইবে, অথচ ছাত্রগণ বেশী উপকৃত হইবে।

References

1. T. Raymont—Principles of Education, Chap. VII.
2. G. Landon– Principles and Practice of Teaching, Chap. VI.
3. J. Adams—Expositions and Illustrations in Teaching, Chaps. V-XV.
4. P. A. Col—The Method and Technique of Teachings, Chaps. XV-XVI.
5. P. Wren—The Indian Teachers' Guide, Chap. IX.
6. O. B. Douglas and B. D. Holland—Fundamentals of Educational Psychology, Chap. XX.

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষাদান-পদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষাদান-পদ্ধতির অর্থ

শিক্ষাদান বা পাঠদান-কার্যে সফলতা লাভের জন্য যে পূর্বনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় তাহাকেই শিক্ষাদান-পদ্ধতি বলে। শিক্ষা বা পাঠের লক্ষ্য কাজে পরিণত করিতে পারিলেই শিক্ষক শিক্ষাদান-কার্যে সফলতা লাভ করিয়াছেন বলা হয়। **সুতরাং শিক্ষার বা পাঠের লক্ষ্য সাধনের জন্য যে সুচিন্তিত উপায় বা কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় তাহাকেই শিক্ষাদান-পদ্ধতি বলা যায়।** শিক্ষাদানের বা পাঠদানের সম্যক্ কার্যপ্রণালীই শিক্ষার বা পাঠের লক্ষ্যসাধনের উপায়। যেমন, কিভাবে পাঠদান-কার্য আরম্ভ করিবে, কি আকারে ও পর্যায়ে পাঠ্য বিষয় ছাত্রের সামনে স্থাপন করিবে, পাঠে ছাত্রের মনোযোগ লাভের জন্য বা পাঠ চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য কি কি শিক্ষাকৌশল অবলম্বন করিতে হইবে বা কি শিক্ষাসরঞ্জাম ব্যবহার করিবে, পাঠদান-কার্যে শিক্ষক ও ছাত্র কিভাবে সহযোগিতা করিবে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় শিক্ষার বা পাঠের লক্ষ্যসাধনের উপায়; সুতরাং তাহাদিগকে শিক্ষাদান-পদ্ধতির অংশ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

শিক্ষাদান-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদান-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া একজন লেখক বলিয়াছেন, **"পূর্বে শিশু পাঠ শিক্ষা করিত এবং শিক্ষকের নিকট পাঠ বলিত, বর্তমান সময়ে শিক্ষকই পাঠ শিক্ষা করে এবং ছাত্রদের নিকট পাঠ বলে।"** এই মন্তব্য করার কারণ

এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে শিক্ষকেরা কেবল পাঠ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন এবং ছাত্রগণ তাহা গৃহে শিক্ষা করিয়া আসিয়া শিক্ষকের নিকট পাঠ বলিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রেণীবদ্ধভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়ার পর শিক্ষকগণ পাঠ বর্ণনা করিতেন এবং ছাত্রেরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতা সাজিত। বিশেষ ভাবে সেই সময়ে Joseph Lancaster মনিটারের সাহায্যে শত শত ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা করেন তাহার সম্বন্ধে এই উক্তির সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। তাহার পর জার্মান দার্শনিক Herbart যখন পাঠ চিত্তাকর্ষক করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তখন শিক্ষকগণ শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য নিজেই শিক্ষাদানের সমস্ত কাজ করিতে আরম্ভ করেন। তাই ইহাকে Soft Pedagogy আখ্যা দেওয়া হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই শিক্ষকগণ তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন। তখন তাঁহারা শিক্ষাদান-কার্যে শিশুকে সহযোগিতা করিতে দিতে আরম্ভ করেন। **বর্তমান সময়ে শিক্ষা করা প্রধানতঃ শিশুর কার্য এবং তাহাকে শিক্ষালাভে সাহায্য করাই শিক্ষকের কার্য বলিয়া স্থির হইয়াছে।** সুতরাং এখন শিক্ষকের শিক্ষাদান এবং ছাত্রের শিক্ষালাভ এই উভয় কার্য যেন যুগপৎ হইতে পারে সেইভাবেই শিক্ষাদান করিতে হয়। শিক্ষক ছাত্রকে জ্ঞানলাভের পর প্রদর্শন করিবেন, ছাত্র সেই পথ অনুসরণ করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিবে বা শিক্ষা করিবে।

প্রকৃষ্ট শিক্ষাদান-পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ

(১) **শিশুর সহযোগিতা লাভ।**

শিক্ষকের, শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শিশু যদি শিক্ষালাভ না করে, তবে শিক্ষাদান-কার্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলা যায় না। কারণ, শিক্ষা প্রধানতঃ শিশুরই কাজ, শিক্ষক তাহাকে এই কার্যে সাহায্য করিতে পারেন মাত্র। শিশু যেন একজন ভ্রমণকারী, আর শিক্ষক যেন

তাহার পরিচালক বা পথপ্রদর্শক। শিক্ষক পথ দেখাইয়া শিশুকে গন্তব্য-স্থলে লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু কেবল তিনি ভ্রমণ করিলেই শিশুর ভ্রমণ করা হইবে না বা তাহার ফলে শিশু গন্তব্য-স্থানে পৌছিবে না। সুতরাং যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিলে শিক্ষালাভের জন্য শিশুর আগ্রহ হয় এবং শিক্ষকের নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় চেষ্টা করিয়া শিশু তাহার শক্তিমত শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহাই প্রকৃষ্ট শিক্ষাদান-প্রণালী। অতএব, শিক্ষাদানের সময় দেখিতে হইবে যে, তাহার ফলে যেন শিক্ষালাভের জন্য শিশুর আন্তরিক আগ্রহ জাগে এবং **সে মানসিক প্রচেষ্টা করে।** এই মানসিক প্রচেষ্টা ভিন্নও শিশুকে শিক্ষাদান-কার্যে আরও নানাভাবে সহ-যোগিতা করিতে বা অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ পাঠদানের সময় শিক্ষকের পরিচালনাধীনে ছাত্রকে যত বেশী কাজ করিতে দেওয়া হয়, পাঠ ততই ফলপ্রসূ হয়।

(২) **সুস্পষ্ট লক্ষ্য সামনে স্থাপন**—তাহার পর দেখা যাইবে যে শিক্ষাদান-কার্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে **শিক্ষার বা পাঠের সুনির্দিষ্ট ও উপযুক্ত লক্ষ্য শিক্ষকের সাম্‌নে থাকিতে হইবে।** সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সাম্‌নে না রাখিলে শিক্ষক শিশুকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন না এবং গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইতে পারিবেন না। এমন কি, শিশুকেও পাঠের লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে শিশু শিক্ষকের নেতৃত্বে গন্তব্য স্থলে যাইবার চেষ্টা করিতে পারিবে না। অন্ধভাবে শিক্ষকের অনুসরণ করিলে তাহার ঠিক শিক্ষা হইবে না। কেননা তাহাতে তাহার প্রয়োজনীয় মানসিক কাজ হইবে না এবং ভবিষ্যতে সে স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভের শক্তি অর্জন করিবে না। তবে **পাঠের দুই প্রকার লক্ষ্য থাকে।** যথা,—(১) **উপস্থিত বা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য** এবং (২) **চরম বা পরোক্ষ লক্ষ্য।** পাঠ্য-বিষয়ের জ্ঞানলাভকে উপস্থিত বা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য বলে। সেই বিষয়ে শিশুর অনুরাগ সৃষ্টি ও তাহার মানসিক বিকাশ চরম বা পরোক্ষ লক্ষ্য বলে। শিশু কেবল উপস্থিত বা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য সাম্‌নে রাখিয়া কাজ করিতে পারে। শিক্ষককে প্রত্যক্ষ লক্ষ্যের

সঙ্গে সঙ্গে চরম বা পরোক্ষ লক্ষ্যও স্মরণ রাখিতে হয় এবং তাহাও সাধনের চেষ্টা করিতে হয়।

(৩) পাঠের বিষয় নির্বাচন ও তাহাকে ঠিক আকার দান— কিন্তু পাঠের বিষয় নির্বাচন না করিয়া তাহার উপযুক্ত লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা যায় না। সুতরাং প্রকৃষ্ট পাঠদানের জন্য শিক্ষককে যত্নের সহিত শিশুর বিকাশের উপযোগী পাঠের নির্বাচন করিতে হইবে। পাঠ্য-বিষয় অতি সহজ হইলে তাহা শিক্ষার জন্য শিশুর আগ্রহ হইবে না, অতি কঠিন হইলে শিশু তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না। এক পাঠে কি পরিমাণ বিষয় শিক্ষা দিবেন তাহাও ঠিক করিতে হইবে। পরিমাণ খুব কম হইলে মেধাবী ছাত্র নিরুৎসাহ হইবে এবং বেশী হইলে সাধারণ ছাত্র হাঁফাইয়া পড়িবে। সুতরাং গড়পড়তা ছাত্রের উপযোগী বিষয়ের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে। সর্বশেষ, পাঠ্য-বিষয় ছাত্রের উপযোগী আকারে গুছাইয়া লইতে হইবে।

(৪) পাঠ্য-বিষয়ের জ্ঞানদান বা জ্ঞানলাভে সাহায্য করা— ইহাই পাঠদান-কার্যের প্রধান অংশ। পূর্ববর্ণিত কাজগুলি শিক্ষককে ইহার জন্যই প্রস্তুত করে। শিশুকে ঠিকভাবে জ্ঞানদান বা জ্ঞানলাভে সাহায্য করার জন্য (ক) প্রথমে তাহার পূর্বজ্ঞান নির্ধারণ করিতে হইবে এবং তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নূতন জ্ঞান দিতে হইবে।

(খ) সময় ও শক্তির মিতব্যয়িতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৎ-পরতার সহিত পাঠ আরম্ভ করিতে হইবে। পাঠের প্রারম্ভে সুদীর্ঘ ভূমিকা দেওয়া বা ছাত্রকে প্রথমেই সমস্ত পাঠের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। তাহার পর বিষয়-বর্ণনার সময়ও মিতব্যয়িতা করিতে হইবে। অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর বিষয় সম্পূর্ণ পরিহার করিতে হইবে।

(গ) পাঠ অনুসরণে শিশুকে প্রয়োজনমত সাহায্য করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই নানা প্রদীপনের ব্যবহার করা হয়। তবে শিশুকে অতিরিক্ত সাহায্য করা বা তাহার পথের সমস্ত বাধা দূর করাও উচিত নহে। কেননা, পাঠ্য-বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য শিশুরও কিছু মানসিক চেষ্টা করা প্রয়োজন।

তাহা করিতে না হইলে সে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা সাজিবে, তাহার প্রকৃত শিক্ষা হইবে না। শিশুকে ঠিকভাবে চিন্তা করিতে সাহায্য করিলেই সে স্বচেষ্টায় নূতন বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিবে।

(ঘ) নূতন জ্ঞান এভাবে ছাত্রের সাম্‌নে স্থাপন করিতে হইবে যেন ছাত্রও পাঠাদান-কাজে সহযোগিতা করিতে পারে এবং সেই বিষয়ে অতিরিক্ত জ্ঞানলাভের জন্য তাহার আগ্রহ হয় ও শক্তিলাভ হয়।

(৫) **নূতন জ্ঞান স্মরণ রাখার সাহায্য করা**—শিশুকে কোন নূতন জ্ঞান দান করিলেই তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাহা তাহার মনে গাঁথিয়া দেওয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি, সারাংশ-গঠন, নোট গ্রহণ, কিছু সময় পর পর শিক্ষা দান প্রভৃতি শিক্ষাকৌশল অবলম্বন করিতে হয়।

(৬) **নূতন জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যবস্থা**—অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করিতে না পারিলে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার পর যত শীঘ্র সম্ভব শিশু যাহাতে তাহার অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বারবার ব্যবহারের দ্বারাই নূতন জ্ঞান শিশুর সম্পূর্ণ নিজস্ব হইতে পারে এবং স্থায়িভাবে স্মরণ থাকিতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কতিপয় পাঠদান-পদ্ধতি

হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি

(The five-step method of Herbart)

পঞ্চসোপান পদ্ধতির মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

শিক্ষালাভের জন্য শিশু যে মানসিক কাজ করে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই জার্মান দার্শনিক হার্বার্ট পাঠদানের জন্য তাঁহার **পঞ্চসোপান-পদ্ধতির** সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মতে ছাত্রের শিক্ষাকাজকে প্রথমে

দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) **মনঃসংযোগ** এবং (২) **চিন্তন**। মনঃসংযোগ দ্বারা শিশু কোন বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে এবং চিন্তনের সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করে, সুশৃঙ্খল করে, তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করে এবং সেই সিদ্ধান্তানুযায়ী কাজ করে। হার্বার্ট মনঃসংযোগ কার্যকে পুনঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন—(১) **উপলব্ধি** ও (২) **তুলনা**। তিনি চিন্তন-কার্যকেও পুনঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন—(১) **সিদ্ধান্ত করা** বা সূত্র-গঠন এবং (২) **তাহার প্রয়োগ**। হার্বার্টের পরবর্তিগণ উপলব্ধির কাজকে পুনঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।—(১) **প্রস্তুতিকরণ** বা সূচনা ও (২) **জ্ঞানদান**। এইরূপে পাঠদানের পাঁচটি সোপানের সৃষ্টি হয় :—

(১) **প্রস্তুতিকরণ বা সূচনা** (Preparation or Introduction),
(২) **জ্ঞানদান** (Presentation),
(৩) **তুলনা** (Association),
(৪) **সিদ্ধান্ত বা সূত্রগঠন** (Generalisation) এবং
(৫) **প্রয়োগ** (Application),

নিম্নে প্রত্যেক সোপানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) প্রস্তুতিকরণ বা সূচনা—

প্রথম সোপানে নূতন জ্ঞান গ্রহণের জন্য ছাত্রের মনকে প্রস্তুত করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া ও সমবেক্ষণ মণ্ডল জাগরিত করিয়া তাহার সহিত নূতন জ্ঞানের কোন সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ সেই বিষয়ে পূর্ব পাঠে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহাই তাহার পূর্বজ্ঞান এবং তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু যদি পূর্ব পাঠের সহিত বর্তমান পাঠের কোন সম্পর্ক না থাকে তাহা হইলেও প্রথমে পূর্ব পাঠের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহার পর ছাত্রের অন্য কোন পূর্ব জ্ঞানের সহিত **নূতন জ্ঞানের** সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহা গ্রহণের জন্য ছাত্রের মন প্রস্তুত করিতে হইবে। এই সোপানের শেষে নূতন পাঠের উদ্দেশ্য ঘোষণা করাও প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে এমন একটা প্রশ্ন করা যায় যেন তাহার উত্তরের দ্বারা পূর্ব পাঠের সহিত নূতন পাঠের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

সেই প্রশ্ন এমনও হইতে পারে যে, ছাত্রগণ তাহার উত্তর দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। তখন শিক্ষককেই তাহার উত্তর দিয়া নূতন পাঠ ঘোষণা করিতে হইবে। ইহার জন্য সাধারণতঃ তিনটি কি চারিটি প্রশ্ন করিলেই যথেষ্ট হইবে। তবে নূতন পাঠের সমস্ত অংশের সহিত পূর্ব জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই। নূতন বিষয়টির সূচনা করিলেই হইবে। এই প্রস্তুতিকরণ বা সূচনা খুব দীর্ঘ করা উচিত নহে।

(২) **নূতন জ্ঞানদান** (Presentation)—দ্বিতীয় সোপানে নূতন পাঠের বিষয় ছাত্রের সম্মুখে স্থাপন করিতে হইবে। ইহার জন্য বিষয়টিকে কয়েক অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক শীর্ষের বর্ণনা দিতে হইবে। (তিনটির বেশী শীর্ষ করা ভাল নহে।) নূতন জ্ঞানদানের সময়ও ছাত্রগণ যে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা সাজিবে তাহা নহে। যতদূর সম্ভব তাহাদিগকেও পাঠদান-কার্যে সহযোগিতা করিতে দিতে হইবে। অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া তাহারা বর্ণনা অনুসরণ করিতেছে কিনা দেখিতে হইবে। এক এক শীর্ষ শিক্ষা দেওয়ার পর প্রশ্নের সাহায্যে তাহার পুনরালোচনা করা প্রয়োজন এবং সম্ভব হইলে সারাংশ গঠন করাও আবশ্যক। এইরূপে সমগ্র বিষয়টি ছাত্রকে শিক্ষা দিতে হইবে। বর্ণনামূলক পাঠেই উপরিউক্ত প্রণালী ভালভাবে অনুসরণ করা যায়। (অন্যান্য বিষয়ের পাঠে এই জ্ঞানদান-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইবে। যথা,—সাহিত্যের পাঠে ছাত্রগণকে এই সোপানে নির্বাচিত অংশ পাঠ করিতে ও অর্থ-শিক্ষা ও মর্ম-গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। পর্যবেক্ষণের পাঠে শিক্ষকের নেতৃত্বাধীনে ছাত্রগণ নিজে পর্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞান অর্জন করিবে; গণিতের পাঠে শিক্ষক ছাত্রদের সহযোগিতায় ব্ল্যাকবোর্ডে কয়েকটি অঙ্ক কষিয়া দেখাইবেন। বিজ্ঞানের পাঠে পরীক্ষার সাহায্যে সত্য আবিষ্কার করিতে দিতে হইবে।)

(৩) **তুলনা** (Association)—এই সোপানে ছাত্রের পূর্বজ্ঞাত কোন বিষয়ের সহিত দ্বিতীয় সোপানে প্রদত্ত জ্ঞানের তুলনা করিতে হইবে। ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই তুলনার কাজ ছাত্রেরাই করিবে। শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে দুই বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের প্রতি তাহাদের মনোযোগ

আকর্ষণ করিবেন মাত্র। (নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে সকল সময় বিস্তারিত তুলনা করা সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া অনেক সময় একই পাঠে বিস্তারিত তুলনা করার সময়ও পাওয়া যাইবে না। সেই সকল ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সোপানে নূতন জ্ঞানদানের সময়েই পূর্বজ্ঞাত কোন বিষয়ের সহিত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে)।

(৪) **সিদ্ধান্ত বা সূত্র-গঠন** (Generalisation)—এই সোপানে নূতন জ্ঞান হইতে ছাত্রকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে বা একটা সূত্র-গঠন করিতে হইবে। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পাঠে কোন সূত্র-গঠনের প্রয়োজন হয় না। সেই সকল ক্ষেত্রে এই সোপানে দ্বিতীয় সোপানে প্রদত্ত জ্ঞানের পুনরালোচনা করা যায়। ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে সূত্রগঠন বা পুনরালোচনা ছাত্রেরই কাজ। শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে তাহাদিগকে এই সূত্র-গঠনে সাহায্য করিবেন বা তাহাদের নিকট হইতে পূর্বপ্রদত্ত জ্ঞান আদায় করিবেন। অবশ্য শিক্ষক তাহা ঠিক আকারে ও ভাষায় লিখিয়া দিতে পারেন।

(৫) **প্রয়োগ** (Application)—এই সোপানে নূতন জ্ঞান প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সূত্র গঠন করা হইয়াছে তাহার সাহায্যে কোন কাজ করিতে দিলেই নূতন জ্ঞানের প্রয়োগ হইবে। সুতরাং গণিত, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়েই সূত্র-গঠন ও তাহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা, সম্ভব হইবে। ভূগোল শিক্ষাদানের সময় ম্যাপ আঁকিতে দিলেও প্রদত্ত জ্ঞানের প্রয়োগ হইবে। সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির বিষয়ের পাঠে সূত্র-গঠন সম্ভব নহে, তবে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায়। যেমন, সাহিত্যের পাঠে যে সকল নূতন শব্দ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাদের ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা করিতে দেওয়া যায়। ইতিহাসের পাঠে ২।১টা প্রশ্নের উত্তর করিতে বা লিখিতে বলা যায়।

পঞ্চসোপান পদ্ধতির সমালোচনা

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কোন বিষয় শিক্ষার সময়ে শিশু যে মানসিক কাজ করে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই পঞ্চসোপান পদ্ধতির সৃষ্টি করা

হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে পাঠদানের একটা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিতে হইবে। তথাপি ইহার **কতকগুলি দোষ** আছে। যথা,—(১) হার্বার্টের মতে শিশুর মন ফাঁকা বা শূন্য থাকে, **বাহির হইতে যে জ্ঞান দেওয়া হয় কেবল মাত্র তাহারই প্রভাবে মনের বিকাশ হয়, এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই পঞ্চসোপান পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল** ; কিন্তু এখন উক্ত ধারণা ভুল বলিয়া স্থির হইয়াছে। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের মত এই যে, বংশগতির ফলেই শিশু তাহার মানসিক শক্তি লাভ করে। শিক্ষার দ্বারা তাহার বিকাশ করা যায় মাত্র, তাহাকে নূতন শক্তি দেওয়া যায় না। তবে ইহার দ্বারা সেই পদ্ধতির মূল্য নষ্ট হয় নাই। কারণ, শিশু যে শক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তাহার সম্যক বিকাশ না হইলে তাহার মূল্য নাই এবং জ্ঞানলাভের বা শিক্ষালাভের ফলেই তাহার সম্ভবমত বিকাশ হইতে পারে।

(২) **সোপানগুলি যেই ক্রমে সাজান হইয়াছে শিশু সকল সময় ঠিক সেই ক্রমে শিক্ষা করে না।** যেমন, নূতন জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সহিত পূর্বজ্ঞানের তুলনা হয়, তাহা স্থগিত রাখা যায় না এবং তাহার জন্য স্বতন্ত্র সোপান করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় তুলনা করিবার কোন বাধা নাই, যখনই সম্ভব পুনঃ বিস্তারিত তুলনার জন্যই স্বতন্ত্র সোপানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেইরূপ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তও করে, তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত করে না ; কিন্তু বলা যায় যে, পূর্বজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াই নূতন জ্ঞান সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং বিষয়টি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার পূর্বে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়াই শ্রেয়।

(৩) **পঞ্চসোপান পদ্ধতি অনুযায়ী সকল বিষয়ে পাঠ দেওয়া যায় না** এবং অনেক বিষয়ের পাঠে সমস্ত সোপানগুলির ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু দেখা যাইবে যে প্রায় সমস্ত বিষয়ের পাঠে প্রথম সোপানের ব্যবহার হয় ; বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী দ্বিতীয় সোপানের পরিবর্তন করিবার কথা পূবে বলা হইয়াছে ; তাহা করা হইলে প্রায় সমস্ত পাঠেই তাহারও ব্যবহার করা

যাইবে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সোপানেরও প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা যায়। সমস্ত পাঠেই যে পাঁচটি সোপানের ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কোন কথা নাই। যথা,—বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য সাধারণতঃ পঞ্চম সোপানের ব্যবহার করা যায় না। বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী সোপান-গুলির পরিবর্তন করিয়া যতগুলি সোপান ব্যবহারের প্রয়োজন হয় ততগুলি সোপান ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৪) **ইহাতে পাঠে শিক্ষকের এবং ছাত্রের কার্য নির্দিষ্ট করা হয় নাই।** কিন্তু সোপানগুলির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে যে বিভিন্ন সোপানে এই কার্য বিভাগ করা বিশেষ কঠিন নহে।

(৫) পাঠদানের জন্য কোন একটা কার্য-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করার বিরুদ্ধে এই আপত্তি হয় যে, **ইহাতে শিক্ষকের স্বাধীনতা কমিয়া যায়** এবং **সমস্ত পাঠগুলি যেন এক ছাঁচে ঢালা হয়।** কিন্তু পঞ্চসোপান-পদ্ধতি কেবল পাঠের কাঠামটা যোগায়, শিক্ষক তাহা প্রয়োজনমত পূরণ ও পরিবর্তন করিতে পারেন; সুতরাং ইহাতে শিক্ষকের স্বাধীনতা খর্ব হয় না। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়া ইহার ব্যবহার করিলে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠগুলি এক ছাঁচে ঢালা বলিয়াও বোধ হইবে না। ইহা ছাড়া কেবলমাত্র যে পঞ্চসোপান পদ্ধতিতে পাঠ দিতে হইবে তাহা নহে, বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ততানুযায়ী অন্যান্য পদ্ধতিরও ব্যবহার করা যায়।

ডিউই-পদ্ধতি বা সমস্যা-পদ্ধতি

আমেরিকার প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ ডিউইর (Dewy) মতে শিক্ষা করার কাজকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা,—

(১) **বিষয়ের জটিলতা অনুভব।** পাঠ্য বিষয়টি একটি সমস্যার আকারে ছাত্রের সামনে উপস্থিত করিতে হইবে, যেন সে ইহার জটিলতা অনুভব করিয়া সমাধানের চেষ্টা করে।

(২) **সমস্যার পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ।** সমস্যার বিষয়টি ভালরূপে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার প্রকৃতি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৩) **সমস্যার সমাধান**। অবস্থার বা ঘটনার নানা প্রকার কারণ বা ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়া সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত কারণ বা ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করিয়া সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(৪) **সূত্র গঠন**। পূর্ব সোপানে সমস্যার যে সমাধান করা হইয়াছে, তাহা গুছাইয়া সূত্রের আকারে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৫) **প্রয়োগ**। পূর্ব সোপানে যে সূত্র গঠন করা হইয়াছে এই সোপানে তাহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পঞ্চসোপান পদ্ধতি ও ডিউই নীতি দুইটিই মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রথমটি শিশু কোন বিষয় শিক্ষা করার সময় যে মানসিক কাজ করে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয়টি কোন সমস্যা সমাধানের সময় ছাত্র যে মানসিক কাজ করে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ইহার অপর নাম **সমস্যা-পদ্ধতি**। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে পাঠদানের জন্য ডিউই পদ্ধতি অপেক্ষা পঞ্চসোপান পদ্ধতিই বেশী উপযোগী। তবে সময় সময় উচ্চ শ্রেণীতে কোন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। কেননা প্রশ্নের বা সমস্যার আকারে ছাত্রের সামনে স্থাপন করিলে বিষয়টির প্রতি তাহারা বেশী মনোযোগ দিতে বাধ্য হইবে। ইহা ছাড়া পঞ্চসোপান-পদ্ধতি হইতে সমস্যা-পদ্ধতিতে ছাত্রগণকে শিক্ষালাভের জন্য অধিকতর মানসিক প্রচেষ্টা করিতে হয়। এই দিক দিয়া উহা পঞ্চসোপান পদ্ধতি হইতে শ্রেষ্ঠ। তবে ইহা নিম্নশ্রেণীর উপযুক্ত নহে।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি

(Analytic and Synthetic Method)

শিশু প্রথমে কোন বস্তু বা বিষয়ের অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট ধারণা করে। তাহার ধারণাকে সুস্পষ্ট ও সঠিক করিবার জন্য বিষয়টিকে বা বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহাতে অংশগুলির ভাল জ্ঞান হইলেও সম্পূর্ণ জিনিষটা বা বিষয়টির জ্ঞান নাও হইতে পারে। তাই ইহার পর বিভিন্ন অংশগুলির সহিত সম্পূর্ণ

জিনিষটির কি সম্পর্ক আছে তাহার জ্ঞান দেওয়া এবং বিভিন্ন অংশগুলির সমষ্টি হিসাবে সম্পূর্ণ জিনিষ বা বিষয়টির জ্ঞান দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই জিনিষ বা বিষয়টি সম্বন্ধে শিশুর সুস্পষ্ট ও সঠিক জ্ঞান হইবে। যথা,—একটি বৃক্ষের সঠিক জ্ঞানদানের জন্য প্রথমে বৃক্ষটিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার শিখর, মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র ইত্যাদির জ্ঞান দিতে হইবে ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক দেখাইতে হইবে। তাহার পর তাহাদের সহিত সমস্ত বৃক্ষটির সম্পর্ক দেখাইয়া বৃক্ষটির জ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

একটা বাক্যের জ্ঞান-দানের জন্যও এই কার্য-প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সংশ্লেষণ-পদ্ধতি বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অনুপূরক। বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতে কোন পাঠ আরম্ভ করিলে সংশ্লেষণ-পদ্ধতির সাহায্যে তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে, অন্যথা শিশুর জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে না।

আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি

(Inductive and Deductive Method)

কতকগুলি উদাহরণ পরীক্ষা করিয়া সেই সকল উদাহরণ হইতে যুক্তির সাহায্যে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা একটা সূত্র গঠন করার প্রণালীকে আরোহী পদ্ধতি বলে। যথা,—রাম মরিয়াছে, হরি মরিয়াছে, যদু মরিয়াছে ; এই সকল উদাহরণ পরীক্ষা করিয়া আমরা যুক্তির সাহায্যে "মানুষ মরণশীল" এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি বা সূত্র গঠন করিতে পারি। অথবা, পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে উত্তাপে লৌহ, তাম্র, কাঁচ, মাটি, পাথর, জল সমস্তই প্রসারিত হয় ; সুতরাং আমরা "উত্তাপ প্রসারিত করে" (Heat expands) এই নিয়ম প্রস্তুত করিতে পারি।

কিন্তু আরোহী প্রণালীতে যে সূত্র গঠিত হয় বা সত্য আবিষ্কৃত হয় তাহার বহুল প্রয়োগ করিয়াই তাহা নির্ভুল সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কেননা, যদি একজন মানুষও অমর বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে মানুষ মরণশীল এই সত্যটিকে নির্ভুল বলা যায় না।

কোন সূত্রের প্রয়োগ করিয়া তাহার সত্যতা নির্ধারণ করার প্রণালীকে অবরোহী পদ্ধতি বলে। যথা, "মানুষ মরণশীল" সুতরাং রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি সকল মানুষ মরিবে। "উত্তাপে জিনিষ প্রসারিত হয়", সুতরাং উত্তপ্ত করিলে লৌহ, তাম্র, কাঁচ, মাটি, পাথর, জল প্রভৃতি সমস্ত জিনিষ প্রসারিত হইবে।

আরোহী ও অবরোহী প্রণালীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির অনুপূরক। আরোহী প্রণালীর সাহায্যে আমরা যেই সূত্র গঠন করি বা নিয়ম আবিষ্কার করি, অবরোহী প্রণালীর সাহায্যে তাহা প্রয়োগ করিয়াই তাহার সত্যতা নির্ধারণ করিতে পারি। সুতরাং আরোহী প্রণালীতে কোন পাঠ আরম্ভ করিলে তাহা অবরোহী প্রণালীর সাহায্যে সমাপ্ত করিতে হইবে।

ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য আরোহী-অবরোহী প্রণালীই সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

ইংলণ্ডের লর্ড বেকন এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন, ইহার ফলে বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক বিষয় শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। বস্তুতঃ এই পদ্ধতিতে গবেষণার ফলে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি করা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং ছাত্রগণকে এই পদ্ধতির সহিত সুপরিচিত করা প্রয়োজন এবং পূর্বোক্ত কতকগুলি বিষয় এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি
(Heuristic Method)

এই প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হইলে ছাত্রকে আবিষ্কারকের স্থানে স্থাপন করিতে হয় এবং তাহাকে নিজে পরীক্ষা করিয়া বা অনুসন্ধান করিয়া সত্য আবিষ্কার করিতে হয়। এই জন্যই ইহাকে **আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি** বলে।

ছাত্রকে একটা লৌহদণ্ড, একটা কাঁচের দণ্ড, একটা পাথর দণ্ড, একটা মাপিবার যন্ত্র (scale) ও একটা spirit lamp দেওয়া গেল। সে প্রথমোক্ত জিনিষগুলির দৈর্ঘ্য মাপিয়া লিখিয়া রাখিবে। তাহার পর spirit lamp

জ্বালাইয়া উহার আগুনে সেইগুলি উত্তপ্ত করিয়া পুনরায় মাপিবে। ইহার ফলে সে দেখিবে যে উত্তপ্ত করার পর প্রত্যেক জিনিষ প্রসারিত হইয়াছে। সুতরাং সে সিদ্ধান্ত করিবে যে, উত্তাপ সমস্ত জিনিষকে প্রসারিত করে। (Heat expands)। ইহা বলা বাহুল্য যে আরোহী-অবরোহী পদ্ধতিতেই ছাত্রকে এই পরীক্ষার সাহায্যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এবং তাহার সত্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে।

এই প্রণালীতে শিক্ষাদানের উপকারিতা এই যে, ছাত্র নিজে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করে বা সত্য আবিষ্কার করে বলিয়া জ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব হয় এবং তাহার উদ্ভাবনী প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। তবে ইহার বিরুদ্ধে এই আপত্তি হয় যে, সকলের উদ্ভাবনী শক্তি থাকিতে পারে না। সেই শক্তি যাহাদের আছে তাহাদিগকেও সত্য আবিষ্কারের পুর্বে আবিষ্কারক যে সকল ভ্রম-প্রমাদ করিয়াছিলেন তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া সময় ও শক্তির অপব্যবহার করিতে দেওয়া অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্রকে পরীক্ষা করিতে দিলে সেই সকল ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা থাকে না। কি সত্য বা নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে তাহার কিছুমাত্র আভাষ না দিয়া শিক্ষক ছাত্রকে ঠিকভাবে পরীক্ষা করিবার কার্যে সাহায্য করিতে পারেন। পরীক্ষার ফল দেখিয়াই ছাত্র সত্য বা নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারে।

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য এই প্রণালী বিশেষ উপযোগী।

আলোচনা পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক শ্রেণীর সামনে একটি বিষয়, সমস্যা বা প্রশ্ন স্থাপন করেন এবং ছাত্রগণকে তৎসম্বন্ধে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলেন। তাহারা বিভিন্ন মনোভাব লইয়া আলোচ্য বিষয়টি পরীক্ষা করে এবং তাহার বিভিন্ন দিক্ আলোচনা করে। শিক্ষক তর্কসভার সভাপতির ন্যায় ছাত্রদের আলোচনা ঠিক পথে পরিচালিত করিয়া তাহাদিগকে ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করেন। প্রয়োজনমত তিনি বিষয়ের

বিভিন্ন দিকে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং পরিশেষে নিজ মতামত জ্ঞাপন করিয়া পাঠের উপসংহার করেন।

এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে, ইহাতে **ছাত্রগণ পরস্পরের সহযোগিতায় শিক্ষালাভ করে** এবং আলোচ্য বিষয়টি বিভিন্ন দিক্ হইতে পরীক্ষা করিয়া তাহার সবিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। বিশেষতঃ ইহাতে তাহাদের বিচার-শক্তির চর্চা ও বিকাশ হয়।

ইহার অসুবিধা এই যে, নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণকে এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যায় না। কারণ ছাত্রগণের বিচারশক্তির বিকাশ হইবার পূর্বে তাহারা কোন কঠিন প্রশ্নের বা বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে না। তাহা ছাড়া যে বিষয়ে ছাত্রদের কিছুমাত্র জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই সেই বিষয় এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যায় না; তাহাদের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বিষয় সম্বন্ধে তাহারা আলোচনা করিতে পারে না। বস্তুতঃ এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নূতন জ্ঞান দেওয়া যায় না, পূর্বার্জিত জ্ঞান বৃদ্ধি করা যায়, তাহাকে শৃঙ্খলাপুর্ণ করা যায় এবং তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। তবে এক ছাত্রের পূর্বার্জিত জ্ঞান অন্য ছাত্রের নিকট নূতন জ্ঞান হইতে পারে এবং শিক্ষকও বিষয়টি সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান দিতে পারেন। এই ভাবে ছাত্রদের নূতন জ্ঞানলাভও হইতে পারে।

ওয়েল্টন পদ্ধতি

Welton লক্ষ্যভেদে পাঠের **নিম্নলিখিত শ্রেণী-বিভাগ** করিয়াছেন:—

(১) **জ্ঞানের প্রসারমূলক পাঠ**। এই শ্রেণীর পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রের জ্ঞানবৃদ্ধি বা তাহাকে প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষাদান। অবশ্য নূতন জ্ঞান উপলব্ধির সাহায্য করাও ইহার লক্ষ্যের অন্তর্গত। পঞ্চসোপান-পদ্ধতিই এই শ্রেণীর পাঠের উপযোগী, তবে ইহাতে সকল সময় সকল সোপানের ব্যবহার হয় না। ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ ইহার অন্তর্গত।

(২) **জ্ঞানের গভীরতাসম্পাদক পাঠ**। ইহাতে নূতন জ্ঞান দেওয়া হয় না, ছাত্রের যে জ্ঞান আছে তাহা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিয়া গভীর করা

হয় এবং তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে বা সূত্র গঠন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ডিউই পদ্ধতি, সমালোচনা পদ্ধতি, বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও আরোহী প্রণালীই এই শ্রেণীর পাঠের উপযোগী। স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, নৈতিক বিষয়ের পাঠ ইহার অন্তর্গত করা যায়।

(৩) **জ্ঞান বা সূত্রের প্রয়োগমূলক পাঠ**। এই শ্রেণীর পাঠের উদ্দেশ্য পূর্বার্জিত জ্ঞানের বা সূত্রের ব্যবহার শিক্ষাদান। অবরোহী প্রণালীই এই পাঠের উপযোগী। গণিত, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ ইহার অন্তর্গত।

(৪) **কোন কার্যে দক্ষতাদানকারী পাঠ**। লিখন, অঙ্কন, হস্তশিল্প ইত্যাদির পাঠ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সাধারণতঃ আদর্শের অনুকরণ বা কল্পনার সাহায্যে এই কাজের বহুল আবৃত্তি করিয়াই এই দক্ষতা লাভ করা যায়। তবে প্রথমে লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিতে হইবে এবং ভাল আদর্শ সামনে স্থাপন করিতে হইবে। তাহার পর লক্ষ্য ও আদর্শের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিয়া কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং সেই নিয়মগুলির অনুসরণ করিয়া যথেষ্ট কাজ করিতে দিতে হইবে। সর্বশেষে কাজের ফল বিচার করিতে শিক্ষা দিতে হইবে।

পাঠের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগের সহিত আরও দুই শ্রেণীর পাঠ যোগ করা যায়। যথা,—

(৫) **ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধির পাঠ**। ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিবার এবং পুস্তক পড়িয়া তাহার মর্মগ্রহণ করিবার শক্তি বৃদ্ধি করাই এই শ্রেণীর পাঠের লক্ষ্য। পঞ্চসোপান-পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করিয়া এই শ্রেণীর পাঠ দেওয়া যায়। দ্বিতীয় সোপানে শিক্ষকের বর্ণনার পরিবর্তে ছাত্রগণকে নির্দিষ্ট বিষয় পাঠ করিতে, তাহার অর্থ শিক্ষা করিতে এবং মর্মগ্রহণ করিতে দেওয়া যায়। তৃতীয় সোপানে অনুরূপ গদ্য বা পদ্য পড়িয়া শুনাইতে পারা যায়। চতুর্থ সোপানে পুনরালোচনা করা যাইতে পারে এবং পঞ্চম সোপানে নূতন নূতন শব্দ ও বাক্যাংশগুলির প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যায়।

Lesson plan
Lesson note

(৬) **পুনরালোচনামূলক পাঠ**। ছাত্র পূর্বে যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে তাহার পুনরালোচনা, শৃঙ্খলাবিধান এবং প্রয়োগই এই পাঠের লক্ষ্য। এই পাঠে পঞ্চসোপান-পদ্ধতির দ্বিতীয় সোপানেই পুনরালোচনার কাজ হয় এবং তাহাতেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতে হয়। এই সময়ে চতুরতার সহিত প্রশ্ন করিয়া পূর্বজ্ঞানকে শৃঙ্খলাপূর্ণও করা যায়। প্রয়োজন ও সম্ভব হইলে তৃতীয় সোপানে তুলনা ও চতুর্থ সোপানে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যায়। গণিতের পাঠে ছাত্রগণকেই আরোহী প্রণালীতে ২।১টি অঙ্ক করিয়া সূত্র গঠন করিতে এবং অবরোহী প্রণালীতে সূত্রের প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায় এবং শেষোক্ত কাজেই বেশী সময় ব্যয় করিতে হয়।

Welton পাঠের যে শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন কেহ কেহ তাহাকে Welton-পদ্ধতি নাম দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী পাঠের শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন এবং পূর্ববর্ণিত পাঠদান-পদ্ধতির প্রয়োজনমত পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠে তাহাদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, নূতন কোন পদ্ধতির সৃষ্টি করেন নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠতালিকা ও পাঠটীকা

(Schemes of Lessons and Lesson-Notes)

পাঠতালিকা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিষয় বা তাহার অংশবিশেষ ধারাবাহিকরূপে শিক্ষা দিতে হইলে বৎসরের প্রথমেই প্রত্যেক বিষয়ের পাঠতালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তাহা না করিলে পাঠ্য-বিষয়ের কোন অংশ শিক্ষাদানে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হইতে পারে, অপর প্রয়োজনীয় অংশও তাড়াতাড়ি শিক্ষা দিতে হইতে পারে, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পাঠ্য-বিষয়

শিক্ষাদান সম্ভব না হইতে পারে। সুতরাং সমস্ত বৎসরের শিক্ষাদান-কার্য সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে বৎসরের প্রথমে প্রত্যেক পাঠ্য-বিষয়ের পাঠ-তালিকা প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন।

পাঠতালিকা প্রস্তুত করার পদ্ধতি

পাঠতালিকা প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে সময়-তালিকা (time-table) দেখিয়া সমস্ত বৎসরে এবং তাহার এক এক ভাগে (terms) কোন্ বিষয়ে কতকগুলি পাঠ দেওয়া যাইবে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। বন্ধের দিনগুলি বাদ দিয়াই কাজের দিনের সংখ্যা স্থির করিতে হইবে। তাহার পর সেই বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি (syllabus) কে প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের জন্য সমগ্র বৎসরের যতটা ভাগ (terms) করা হয় তত ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। পরিশেষে পাঠ্যসূচির এক এক ভাগকে বৎসরের এক এক ভাগে যতগুলি পাঠ দেওয়া সম্ভব তত পাঠে বিভক্ত করিয়া পাঠতালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। পাঠ্য-পুস্তকের পৃষ্ঠার হিসাবে পাঠের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করিয়া এক এক পাঠে কতটা বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব অথবা পাঠ্যসূচির এক এক বিষয়-এককে (subject unit) কতগুলি পাঠ দেওয়া প্রয়োজন তাহা স্থির করিয়াই পাঠের পরিমাণ ও সংখ্যা নির্দিষ্ট করিতে হইবে। বিষয়ের বিভিন্ন অংশের কাঠিন্য ও গুরুত্বানুযায়ীও তাহাতে পাঠের সংখ্যার তারতম্য হইবে। ইহা ছাড়া বৎসরের প্রত্যেক ভাগের শেষে পুনরালোচনার জন্য কয়েকটি পাঠ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট পাঠে নূতন বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইতিহাসের পাঠতালিকা

শ্রেণী—পঞ্চম মান। সময়—বৎসরের প্রথম ভাগ (জানুয়ারী—এপ্রিল) পাঠ্য-সূচি—প্রথম হইতে হর্ষবর্ধন। পাঠ সংখ্যা—৩৮

সময়	বিষয়াংশ	পাঠসংখ্যা
জানুয়ারী ঃ	ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা ও ইতিহাসের উপর তাহার প্রভাব	১
	ভারতের আদিম অধিবাসী	২

সময়	বিষয়াংশ	পাঠসংখ্যা
	আর্যজাতির আদিম বাসস্থান, তাহাদের ভারত-আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন	৩
	আর্যজাতির ধর্ম ও সমাজ	৩
	রামায়ণের গল্প ও ঐতিহাসিক তথ্য	১
ফেব্রুয়ারী ঃ	মহাভারতের গল্প ও ঐতিহাসিক তথ্য	১
	বুদ্ধদেবের জীবনী ও উপদেশ	১
	আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ও তাহার ফলাফল	২
	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ইতিহাস	১
	মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ	১
	মহামতি অশোক	২
	শুঙ্গ ও কাণ্ববংশের ইতিহাস	১
	অন্ধ্র সাম্রাজ্য	১
মার্চ ঃ	গ্রীক ও শক আক্রমণ	১
	কণিষ্কের ইতিহাস	১
	গুপ্তবংশ—	
	চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত	১
	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত	১
	পরবর্তী গুপ্ত সম্রাট্‌গণ	১
	ফাহিয়ানের ভারত-বিবরণ	১
	গুপ্ত সভ্যতা	১
	হূণগণ ও যশোবর্মন	১
	হর্ষবর্ধন	১
	হিউয়েন্‌সাঙের ভারত-বিবরণ	১
এপ্রিল ঃ	পুনরালোচনা-মূলক পাঠ	৮
	মোট পাঠসংখ্যা	৩৮

পাঠ-টীকা

(Lesson-notes)

পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা 57.

দক্ষতার সহিত যে-কোন জটিল কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই তাহার জন্য সুচিন্তিত কর্মসূচি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে শিক্ষাদান-পদ্ধতি ও শিক্ষাদান-কৌশল সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে যে কার্যারম্ভের পূর্বে পাঠদানের সুচিন্তিত কর্মসূচি প্রস্তুত না করিয়া ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ না করিয়া পাঠদানের ন্যায় জটিল কার্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করা ও তাহাতে সফলতা অর্জন করা সম্ভব নহে। **পাঠটীকাই পাঠের পূর্বকল্পিত কর্মসূচি।** যত্নের সহিত পাঠটীকা প্রস্তুত না করিয়া পাঠদানের চেষ্টা করিলে শিক্ষকের পদে পদে ভুল হইবে, সময় ও শক্তির অপব্যয় হইবে, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বা ভুল পন্থার অনুসরণ করিয়া তিনি ছাত্রকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইতে অসমর্থও হইতে পারেন। ইহাও বলা প্রয়োজন যে, কেবল কোন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিলেই ভাল পাঠ দেওয়া যায় না। পাঠদানের পূর্বে শিশুর শক্তি বা বিকাশানুযায়ী পাঠ্য-বিষয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করিলে, তাহা ঠিকভাবে গুছাইয়া না লইলে, কি পর্যায়ে ও পদ্ধতিতে তাহা শিশুর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে স্থির না করিলে, এবং যে যে প্রদীপনের সাহায্যে তাহা চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে ও শিশুর মনে গাঁথিয়া দিতে হইবে সেগুলি প্রস্তুত না করিলে, পাঠদান-কার্য সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। পাঠদানের পূর্বে পাঠটীকা প্রস্তুত করিলেই এই সমস্ত বিষয় শিক্ষকের প্রয়োজনীয় মনোযোগলাভ করিতে পারে এবং তিনি সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দক্ষতার সহিত পাঠ দিতে পারেন। সেনাপতির পক্ষে যেমন যুদ্ধের সুচিন্তিত পরিকল্পনা (plan), চিত্রকরের পক্ষে যেমন চিত্রের খসড়া-নক্‌সা (plan in outline), শিক্ষকের পক্ষে তেমন পাঠটীকা। অবশ্য শিক্ষকের ব্যবসায় সম্বন্ধীয় শিক্ষা (Professional Training) ও অভিজ্ঞতার পরিমাণানুযায়ী প্রস্তুত হওয়ার

কাজেই পরিমাণ কমবেশী হইবে। কিন্তু পূর্বে কিছুমাত্র প্রস্তুত না হইয়া কেহই পাঠদান-কার্যে, বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক ছাত্রদের শ্রেণীতে পাঠদান-কার্যে, সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না।

পাঠটীকা প্রস্তুত করিবার প্রণালী

(১) **বিষয়-নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ**—পাঠটীকা প্রস্তুত করিবার জন্য শিক্ষককে সর্বপ্রথমে শ্রেণীর উপযোগী পাঠ্য-বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে এবং তাহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। কেবল শ্রেণীপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া তিনি ভাল পাঠ দিতে পারিবেন না।

(২) **পাঠের লক্ষ্য নির্ধারণ**—তাহার পর পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞানদান ও শিশুর বিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাঠের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(৩) **বিষয়ের পরিমাণ নির্ধারণ ও তাহা ঠিকভাবে সাজান**—ছাত্রের বয়স ও মানসিক বিকাশানুযায়ী পাঠ্য-বিষয়ের পরিমাণ স্থির করিতে এবং তাহাদের শিক্ষালাভের উপযোগী আকারে তাহাকে সাজাইতে হইবে। ইহার পর পাঠ্য-বিষয়কে কয়েকটি স্বাভাবিক ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক শীর্ষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে সাধারণতঃ তিন শীর্ষের বেশী করা উচিত নহে।

(৪) **পাঠদান-পদ্ধতি নিরূপণ**—ছাত্রের বিকাশ ও বিষয়ের উপযোগী পাঠদান-পদ্ধতি নিরূপণ করিতে হইবে। নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষাদানের জন্য পাঠদান-পদ্ধতির কি কি সোপান ব্যবহার করা যায় এবং বিভিন্ন সোপানে কি কাজ করা প্রয়োজন তাহাও স্থির করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠদান-পদ্ধতির ব্যবহার ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৫) **প্রয়োজনীয় শিক্ষাকৌশল, শিক্ষাসরঞ্জাম ও প্রদীপন নির্ধারণ**—শিশুকে শিক্ষালাভ-কার্যে সাহায্য করার জন্য, পাঠ তাহার নিকট চিত্তাকর্ষক করার জন্য এবং পাঠ্য-বিষয় ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়ার জন্য কি

(৪) **পাঠটীকায় পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে খুটিনাটী** (details) **খবর লেখার প্রয়োজন নাই।** তাহার সাধারণ বর্ণনা থাকিলেই হইবে। **কিন্তু পাঠদান-পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হইবে।**

পাঠ-টীকার আকার

শিক্ষকের নাম................ .....বিদ্যালয়ের নাম........................

তারিখ ও সময়......................শ্রেণী..................

বিষয়......................

সাধারণ পাঠ (বিষয়—একক)...................

বিশেষ পাঠ (নির্দিষ্ট পাঠে শিক্ষণীয় বিষয়—এককের অংশ)...................

উদ্দেশ্য (ক) প্রত্যক্ষ (বিষয় সম্বন্ধীয়)

(খ) পরোক্ষ (ছাত্রের বিকাশ সম্বন্ধীয়)

উপকরণ............

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
১ম	(ক) পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা (খ) নূতন পাঠের সূচনা বা লক্ষ্য ঘোষণা	শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বিধান ও গৃহকাজ সংগ্রহ। প্রথমে ছাত্রের পূর্বজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে হইবে। তাহার পর ২।১টি প্রশ্ন করিয়া ছাত্রের পূর্বজ্ঞানের সহিত নূতন পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে এবং নূতন জ্ঞান লাভের জন্য ছাত্রের ঔৎসুক্য জাগাইতে হইবে। প্রস্তুতীকরণের প্রশ্নাবলী :—
২য়	বিষয়ের বিভিন্ন শীর্ষ ও এক এক শীর্ষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	এই স্থলে কি পর্যায়ে ও প্রণালীতে জ্ঞান দান করিবেন, কি কি শিক্ষা-কৌশলের ব্যবহার করিবেন, ছাত্রকে কি কি কাজ করিতে দিবেন তাহার বর্ণনা দিতে হইবে। এক এক শীর্ষের বর্ণনার বা জ্ঞান-দানের পর তাহার পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলীও লিখিতে হইবে।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
৩য়	যে পূর্ব জ্ঞানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে তাহার সারাংশ।	যে প্রণালীতে তুলনা করা হইবে তাহা লিখিত হইবে। অথবা যে সকল প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রকে তুলনা করার কার্যে সাহায্য করা হইবে সেই প্রশ্নগুলি লিখিত হইবে।
৪র্থ	কোন নিয়ম বা সূত্র গঠন করিতে হইলে তাহা এস্থলে লিখিতে হইবে।	সূত্রগঠনের প্রণালী বর্ণনা করিতে হইবে অথবা সমস্ত পাঠের পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী লিখিতে হইবে।
৫ম	অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের জন্য যে কাজ করিতে দেওয়া হইবে তাহা এস্থলে লিখিতে হইবে।	কি প্রণালীতে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হইবে এবং ছাত্রের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য শিক্ষক কি করিবেন তাহা বর্ণনা করিতে হইবে।

বিভিন্ন পাঠে পাঁচটি সোপানের কি পরিবর্তন হইবে তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ের আদর্শ পাঠটীকা সেই সকল বিষয় শিক্ষাদান-পদ্ধতির সঙ্গে দেওয়া হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রেণী-পাঠনার সময় ছাত্রের অমনোযোগিতার কারণ ও তাহার প্রতিকার

পাঠে ছাত্রের অমনোযোগিতার কারণগুলিকে **তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা** যায়। যথা,—

(ক) **অবস্থান-জনিত**

১। বাহিরের গোলমাল বা চাঞ্চল্যকর দৃশ্য মনোযোগ দানে বাধা দিতে পারে।

২। শ্রেণী-কামরায় ভাল আলো-বাতাস প্রবেশের সুবন্দোবস্ত না থাকার দরুণ ছাত্রগণ শীঘ্র অবসাদগ্রস্ত হইতে পারে এবং তাহার ফলে পাঠে অমনোযোগী হইতে পারে।

৩। আরামদায়ক বা কার্যোপযোগিভাবে বসিবার ব্যবস্থার অভাবে বা দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকার জন্য ছাত্রগণ অমনোযোগী হইতে পারে।

৪। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মিত হইলে ছাত্রগণ অস্বস্তি অনুভব করিবে ও অমনোযোগী হইবে।

(খ) **ছাত্রের দোষজনিত**

১। শিশুর স্বাভাবিক চঞ্চলতা।

২। ছাত্রের কোন শারীরিক পীড়া বা মানসিক অশান্তি।

৩। ছাত্রের বিদ্যালাভে আগ্রহের অভাব।

৪। কোন ছাত্রের কৌতুকজনক হাবভাব বা অঙ্গভঙ্গি।

(গ) **শিক্ষকের দোষজনিত**

১। পাঠ অতি সহজ বা অতি কঠিন হওয়া।

২। পাঠদান কার্য আনন্দদায়ক ও সজীব না হওয়া।

৩। শিক্ষাদানের যথেষ্ট কৌশল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ব্যবহার না করা।

৪। পাঠের দৈর্ঘ্য, পাঠ্য বিষয় বা পাঠদান-পদ্ধতি ছাত্রের বয়সের বা বিকাশের উপযোগী না হওয়া।

৫। এক ভাবে বা এক স্বরে দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া, অথবা শিক্ষকের স্বর অতি কর্কশ, অতি উচ্চ বা অতি মৃদু হওয়া।

৬। পাঠদান-কার্যে ছাত্রগণকে সহযোগিতা করিতে না দেওয়া।

৭। উপর্যুপরি কঠিন বা বেশী মানসিক শ্রমজনক পাঠ দেওয়া, দিবসের শেষভাগে সেইরূপ বিষয়ের পাঠ দেওয়া।

৮। শিক্ষকের মুদ্রাদোষ এবং কৌতূহলোদ্দীপক আকৃতি, প্রকৃতি বা পোষাক-পরিচ্ছদ।

৯। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব বা আন্তরিকতার অভাব।

১০। শ্রেণীতে সুশাসন বজায় না থাকা।

প্রতিকার—

(১) জনবহুল স্থান হইতে দূরে, স্বাস্থ্যকর স্থানে বিদ্যালয় নির্মাণ।

(২) বিদ্যালয়-গৃহে ভাল আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা।

(৩) ছাত্রগণকে আরামদায়ক ও কার্যোপযোগী আসনে বসিতে দেওয়া। আসন কিরূপ হওয়া উচিত পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) প্রত্যেক পাঠের পর পাঁচ মিনিট এবং দিবসের মধ্যভাগে আধ ঘণ্টা অবসর দেওয়া ও দিবসের শেষ ভাগে অল্পবয়স্ক ছাত্রগণকে শ্রেণী-ব্যায়াম করিতে দেওয়া।

(৫) শিশুকে সর্বদা কার্যে রত রাখাই তাহার স্বাভাবিক চঞ্চলতার প্রতিকার।

(৬) কোন ছাত্রের প্রকৃত অসুস্থতার বা মানসিক অশান্তির প্রমাণ পাইলে তাহাকে বিদায় দেওয়া উচিত।

(৭) কোন ছাত্র কৌতুকজনক হাবভাব দেখাইতে বা অঙ্গভঙ্গি করিতে থাকিলে ছাত্রগণের দৃষ্টি কোন্ দিকে আকৃষ্ট হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়াই দোষী ছাত্রকে বাহির করা যায়; বালকসুলভ চপলতার জন্য উহা করিলে

তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিলেই সে তাহা হইতে বিরত হইবে। তবুও পুনঃ সেইরূপ করিলে তাহাকে পিছনের বেঞ্চে বসিতে দেওয়া যায় বা তথায় দাঁড় করাইয়া রাখা যায়।

(৮) কোন ছাত্রের বিদ্যালাভে আগ্রহ না থাকিলে তাহাকে মনোযোগী করা কঠিন। তাহার আগ্রহাভাবের কারণ নির্ণয় করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা যায়। পুরস্কারের লোভ ও শাস্তির ভয় দেখাইয়াও তাহার আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করা যাইতে পারে।

(৯) পাঠ যাহাতে সর্বপ্রকারে শ্রেণীর উপযোগী হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। গড়পড়তা ছাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রেণীতে পাঠ দিতে হইবে। উচ্চমেধা ও ক্ষীণমেধা শিশুগণকে স্বতন্ত্র কাজ দিতে হইবে।

(১০) প্রয়োজন মত শিক্ষাদানের কৌশল ও সরঞ্জামের ব্যবহার করিলে ছাত্রের মনোযোগ লাভে সাহায্য হইবে।

(১১) শিক্ষকের উচ্চারণ সুস্পষ্ট এবং তাহার স্বর শ্রেণীর সকল ছাত্রের শ্রুতিগোচর হয় এমন উচ্চ হইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে তাহার স্বর পরিবর্তন করিতে হইবে।

(১২) পাঠদান-কার্যে ছাত্রগণকে সহযোগিতা করিবার সুযোগ দিতে হইবে, সময় সময় তাহাদিগকেও কোন কোন কাজ করিতে দিতে হইবে।

(১৩) বেশী মানসিক শ্রমজনক বিষয়গুলি দিবসের প্রথম ভাগে শিক্ষা দিতে হইবে।

(১৪) শিক্ষকের পাঠদান কার্য আনন্দদায়ক বা চিত্তাকর্ষক করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

(১৫) শিক্ষককে যত্নের সহিত যাবতীয় মুদ্রাদোষ পরিহার করিতে হইবে এবং তাহার আকৃতি-প্রকৃতিতে বা পোযাক-পরিচ্ছদে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু না রাখিবার প্রয়াস পাইতে হইবে।

(১৬) শিক্ষকের কিছু ব্যক্তিত্ব থাকিতে হইবে এবং শিক্ষাদান-কার্যে তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ থাকিতে হইবে। শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাব হইলে পাঠ সজীব ও চিত্তাকর্ষক হইবে না।

(১৭) যে কোন প্রকারেই হউক শ্রেণীতে সুশাসন বজায় রাখিতে হইবে। পাঠদান আরম্ভ করিবার পূর্বে শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বিধান করিতে হইবে। পাঠদানের সময় প্রধানতঃ চক্ষুর সাহায্যে শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইবে।

পাঠ চিত্তাকর্ষক করিবার ও তাহাতে ছাত্রের অনুরাগ সৃষ্টির উপায়।

পাঠ চিত্তাকর্ষক করিবার ও তাহাতে ছাত্রের অনুরাগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। পূর্বে বলা হইয়াছে যে পাঠে ছাত্রের মনোযোগ লাভ করিতে না পারিলে তাহাকে কিছুই শিক্ষা দেওয়া যায় না। কিন্তু মনোযোগদানের সহিত অনুরাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। **পাঠে ছাত্রের অনুরাগ সৃষ্টি করিতে পারিলেই শিশু তাহার প্রতি মনোযোগ দিবে।** স্বাভাবিক ও ইচ্ছামূলক এই উভয় প্রকার মনোযোগ দান ছাত্রের স্বাভাবিক বা অর্জিত অনুরাগ সৃষ্টির উপর নির্ভর করে। সুতরাং **ফলপ্রদ পাঠ দিতে হইলে পাঠটি চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে এবং তাহার প্রতি ছাত্রের অনুরাগ সৃষ্টি করিতে হইবে।**

পাঠে ছাত্রের স্বাভাবিক অনুরাগ লাভের উপায়।

(১) প্রফুল্লতা, সজীবতা ও সহানুভূতির সহিত পাঠদান।

(২) জ্ঞানদানে ও জ্ঞানলাভে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের আগ্রহ সৃষ্টি। আগ্রহের সহিত শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করিলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ে বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন এবং পাঠের প্রতি ছাত্রের অনুরাগ জন্মিবে। (২য় ভাগে ১ম অধ্যায়—২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

(৩) পাঠ্য বিষয়ের জলন্ত, মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ বর্ণনা। (পঞ্চম অধ্যায় দেখুন)

(৪) বস্তু, ছবি, আদর্শ প্রভৃতি নানা প্রদীপনের সাহায্যে, বিশেষতঃ রঙ্গিন চিত্রের সাহায্যে পাঠদান।

(৫) পাঠে নানাপ্রকার বৈচিত্র্যের সৃষ্টি।

(৬) নানা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাঠদান, গল্পের আকারে পাঠদান; শিশু গল্প শুনিতে ভালবাসে বলিয়া গল্পের আকারে পাঠ দিলে তাহা শিশুর নিকট চিত্তাকর্ষক হয়।

(৭) খেলার আকারে শিক্ষাদান। শিশু খেলা করিতে ভালবাসে বলিয়া খেলার ভিতর দিয়া শিক্ষা দিলে পাঠের প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মে।

(৮) যাহাতে ছাত্রের কৌতূহল, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব জাগ্রত হয় এমত পাঠদান।

পাঠে কৃত্রিম অনুরাগ সৃষ্টির উপায়ঃ—

(১) ছাত্রের কোন প্রকার স্বার্থের বা উপকারের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া পাঠের লক্ষ্য নির্দেশ করা। যথা,—গল্পের বই পড়িবার জন্য পড়িতে শিক্ষা করা, দাদার নিকট পুতুল আনিতে লেখার জন্য লেখা শিক্ষা, কারবার করিয়া ধনী হইবার জন্য লাভ-ক্ষতির অঙ্ক শিক্ষা করা ইত্যাদি।

(২) ছাত্র যাহাতে সহযোগিতা করিতে পারে এমন ভাবে পাঠদান। পাঠে সহযোগিতা করিবার জন্য ছাত্রকে যত বেশী সুযোগ দেওয়া হইবে তাহাতে ছাত্রের ততবেশী অনুরাগ জন্মিবে।

(৩) **যাহাতে ছাত্রের কিছু চিন্তা করিয়া পাঠ অনুসরণ করিতে হয় সেই ভাবে পাঠদান।** যন্ত্রের মত শিক্ষা না করিয়া চিন্তা করিয়া শিক্ষা করিতে হইলে পাঠের প্রতি শিশুর অনুরাগ জন্মিবে। কেননা শিশু তাহার শারীরিক বা মানসিক শক্তির ব্যবহার করিতে ভালবাসে।

(৪) বিভিন্ন কল্পনাবৃত্তির ব্যবহার হয় এমন পাঠদান। পুনরুৎপাদিনী, প্রত্যক্ষকারিণী ও সৃষ্টিকারিণী কল্পনার সাহায্যে পাঠ দিলে তাহার প্রতি শিশুর অনুরাগ জন্মে।

(৫) প্রতিযোগিতা, স্বার্থসিদ্ধি, পিতামাতার বা শিক্ষকের অনুমোদন বা প্রশংসালাভ প্রভৃতি যে কোন প্রবৃত্তির সাহায্যে **ছাত্রকে কোন বিষয় পাঠে কিছুকাল নিয়োজিত রাখিলে তাহার প্রতি শিশুর কৃত্রিম অনুরাগ জন্মে।** যথা—গণিতের কাজ প্রথমে নীরস বোধ হইলেও কিছুকাল সেই কাজ করিলে তাহার প্রতি কৃত্রিম অনুরাগ জন্মে।

(৬) **সমস্যার আকারে পাঠদান।** সমস্যা সমাধানের জন্য আগ্রহ হয় বলিয়া ইহাতে পাঠে ছাত্রের অনুরাগ হয়।

(৭) **ছাত্র জয়লাভের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে এমন ভাবে পাঠদান।** শিশুর পথ হইতে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অপসারণ না করিয়া শিক্ষক এই ভাবে পাঠ দিবেন যেন ছাত্র নিজ চেষ্টায় বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে; নিজ চেষ্টায় কোন কঠিন কাজ করিতে পারিলেই ছাত্র জয়লাভের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে এবং পাঠে তাহার অনুরাগ জন্মিবে।

ইহা বলা বাহুল্য যে পাঠে অনুরাগ সৃষ্টির জন্য প্রথমে মনোযোগ দানের বাধাগুলিও দূর করিতে হইবে। পূর্বে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে।

ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ
(Development of the student's individuality)

বর্তমান শিক্ষাদান-পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগ এই যে, ইহাতে ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। তাহাদিগকে অতিরিক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়, একই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় ও পরিচালনা করা হয়। তাহারা শিক্ষকের বর্ণনা শুনিয়া বা পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার সময় তাহা বমন করে। তাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া শিক্ষা করিতে এবং নিজের ভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে না। ইহার ফলে তাহাদের ব্যক্তিগত বিশেষত্বগুলি লোপ পায় এবং তাহারা একই ছাঁচে গড়া পুতুলের আকার ধারণ করে। সেইজন্য J. Adams তাহাদিগকে বিদ্যালয়িক শিশু (institutionalised children) নাম দিয়াছেন।

এই গুরুতর দোষের প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যায়:—

(১) শিক্ষাদান কার্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ছাত্রগণকে যত বেশী সম্ভব স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিতে দিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয়ের বা নির্দিষ্ট পুস্তকের কিছু অংশ দলগত ভাবে শিক্ষা দিয়া অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তিগত ভাবে স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিতে দেওয়া যায়। শ্রেণী-পাঠনার অনুপূরক ভাবে পরিদর্শিত পাঠ (Supervised lessons), ডল্টন প্লেন, কার্যসমস্যা-পদ্ধতি (Project Method), যৌথ প্রণালীতে (Co-operative Method) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়।

(২) পাঠদানের সময় ছাত্রগণকে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা সাজিতে না দিয়া শিক্ষা কার্যে যত বেশী সম্ভব সহযোগিতা করিতে দিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয় শিক্ষার জন্য ছাত্রগণই প্রথম চেষ্টা করিবে, তাহারা স্বচেষ্টায় উপলব্ধি বা আয়ত্ত করিতে না পারিলে শিক্ষক তাহাদিগকে প্রয়োজন মত সাহায্য করিবেন মাত্র। যে সকল বিষয় ছাত্রের জ্ঞাত থাকার সম্ভাবনা, শিক্ষক তাহা নিজে না বলিয়া প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের নিকট হইতে আদায়ের চেষ্টা করিবেন। পুনরালোচনা, সারাংশ পঠন প্রভৃতি কাজ প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের দ্বারাই করাইতে হইবে। সকল সময়ে কোন না কোন আকারে ছাত্রগণের দ্বারা নূতন জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষকের বা পুস্তকের বর্ণনা অন্ধভাবে গ্রহণ ও তাহার প্রতিধ্বনি না করিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া শিক্ষা করে এবং নিজের ভাবে ও নিজের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। একই আদর্শ দেখিয়া যেমন শ্রেণীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত ছাত্রগণকে তাহার ভিন্ন ভিন্ন চিত্র আঁকিতে হয়, সেইরূপ একই বর্ণনা শুনিয়া বা পড়িয়া সকল ছাত্র একই ভাবে তাহা গ্রহণ করিতে বা প্রকাশ করিতে পারে না। যদি তাহা করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা না করিয়া শিক্ষা করিয়াছে। তাহা দেখাইয়া দিয়া তাহাদিগকে লজ্জা দিতে হইবে। পরীক্ষার সময়ে নিজের ভাবে ও নিজের ভাষায় উত্তর না করিলে তাহা অগ্রাহ্য করা যায় বা তাহার মূল্য হ্রাস করা যায়।

(৪) যে সকল বিষয় সমালোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যায় সেই বিষয়গুলি সমালোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেননা কোন বিষয়ের সমালোচনা করিতে হইলে ছাত্রকে বাধ্য হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

(৫) কেবল এক একটা পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া এক এক বিষয় শিক্ষা না করিয়া ছাত্রগণ যাহাতে পুস্তকাগারে গিয়া নানা পুস্তক পড়িয়া এক এক বিষয় শিক্ষা করে তাহার সুযোগ ও উৎসাহ দিতে হইবে। নানা পুস্তকে একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পড়িয়া শিক্ষা করিলে তাহারা একই বিষয়কে

নানাদিক হইতে দেখিতে শিখিবে এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্থ হইবে।

(৬) বিভিন্ন ছাত্রের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতির সহিত মিল রাখিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দেওয়া হইলে তাহাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিবে। ১১।১২ বৎসর ও ১৪।১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে ছাত্রগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে তাহা নির্ধারণ করিয়া তাহার বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে।

(৭) ছাত্রগণকে তর্কসভায় যোগদানের সুযোগ এবং উৎসাহ দেওয়া হইলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে হইবে এবং তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের বিশেষ সাহায্য হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে তর্কসভা (Debating Society) স্থাপন করা প্রয়োজন।

মোটের উপর ছাত্রগণকে যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইলেই তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উত্তম শিক্ষাদানের লক্ষণ

(Characteristics of Good Teaching)

১। পাঠের লক্ষ্য ও তাহা সাধনের উপায়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং পাঠের লক্ষ্য সর্বদা সামনে রাখিয়া ও অবান্তর বিষয় পরিহার করিয়া পাঠদান।

২। শিশু যাহাতে ভাল শিক্ষালাভ করে সেই ভাবে পাঠদান। সুতরাং তাহার স্বাভাবিক শিক্ষা-প্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। **শিক্ষকের শিক্ষাদানের ফলে শিশু শিক্ষালাভ না করিলে শিক্ষাদান কার্য নিষ্ফল হইয়াছে মনে করিতে হইবে।**

৩। পাঠের বিষয়, পরিমাণ, পর্যায়, দৈর্ঘ্য ও পাঠদান-পদ্ধতি শ্রেণীর বা ছাত্রদের উপযোগী হয় সেইরূপ পাঠদান।

৪। প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহাদের উপর জোর দিয়া পাঠদান।

৫। পাঠ আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক হওয়া।

৬। শ্রেণী-পাঠনার সময় ছাত্রগণের প্রতি যত বেশী সম্ভব ব্যক্তিগত মনোযোগ দান।

৭। ছাত্রগণকে যেন চিন্তা করিতে হয় সেইরূপ ভাবে পাঠদান। কেবল নানা তথ্য সরবরাহ করিয়া তাহাদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিলে ভাল পাঠ হয় না।

৮। পাঠে কিছু বৈচিত্র্য থাকা।

৯। পাঠ্য বিষয় ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা করা হয়।

১০। ছাত্র স্বচেষ্টায় যাহাতে শিক্ষালাভের সুযোগ ও উৎসাহ পায় এবং পাঠ্য বিষয়ে তাহার অনুরাগ সৃষ্টি হয় সেইরূপ ভাবে পাঠদান।

১১। পাঠদান কার্যে ছাত্রগণকে সহযোগিতা করিতে দেওয়া। যে কাজ ছাত্রগণ করিতে পারে শিক্ষকের তাহা না করা।

১২। প্রফুল্লতা, সজীবতা, আন্তরিকতা ও আত্মবিশ্বাসের সহিত পাঠদান।

১৩। ছাত্রের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির সহিত পাঠদান। ইহার জন্য নিজের বাল্যাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে কল্পনার সাহায্যে ছাত্রদের স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহাদের মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

১৪। **ছাত্রের সঙ্গে কাজ করা, ছাত্রের জন্য কাজ না করা।** ছাত্রকে চিন্তা করিতে, কঠিন বিষয় বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে দিতে হইবে। তাহার পথের সমস্ত বাধা দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে।

১৫। যাহাতে ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় সেইরূপ শিক্ষাদান। তাহাকে নিজের ভাবে চিন্তা করিতে ও কাজ করিতে এবং নিজের ভাবে ও ভাষায় তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে উৎসাহ দিতে হইবে।

পাঠদানে কতিপয় সাধারণ দোষ

(Some common faults in teaching)

১। পাঠের পূর্বকল্পিত কার্য-পদ্ধতির অভাব। পাঠের লক্ষ্য নির্দিষ্ট না করিয়া বা গন্তব্যস্থলে পৌছিবার জন্য প্রকৃষ্ট পথ ঠিক না করিয়া পাঠদান।

২। এক পাঠে অতিবেশী বিষয় শিক্ষাদানের চেষ্টা করা।

৩। অতি দীর্ঘ বা অনাবশ্যক ভূমিকা দানে সময় নষ্ট করা।

৪। বিষয়ের যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন না করিয়া কেবল পাঠ্য পুস্তকের বর্ণনার আবৃত্তি করা।

৫। প্রয়োজনীয় অংশগুলির উপর অধিকতর জোর না দিয়া সমস্ত বিষয় একই ভাবে বর্ণনা করা।

৬। একটানা দীর্ঘ বর্ণনা দান বা কেবল বর্ণনার সাহায্যে পাঠদান।

৭। যে সকল বিষয় ছাত্রের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বা কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা করা উচিত, তাহাদের মৌখিক বর্ণনা দেওয়া।

৮। অনাবশ্যক বা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা।

৯। দোষযুক্ত (defective) প্রশ্ন করা বা লক্ষ্যহীন প্রশ্ন করিয়া সময় নষ্ট করা।

১০। পাঠ্য বিষয় ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়ার জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করা।

১১। অত্যন্ত দ্রুত পাঠ দেওয়া।

১২। ছাত্রকে পাঠদান কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে না দিয়া শিক্ষকের সমস্ত কাজ করা।

১৩। সমস্ত শ্রেণীর উপর দৃষ্টি না রাখিয়া অল্প কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখিয়া পাঠ দেওয়া।

১৪। **প্রতিধ্বনিমূলক পাঠ দেওয়া।** শিক্ষক একটা কিছু বলিয়া বা বর্ণনা দিয়া ছাত্রকে তাহা অক্ষরশঃ পুনরাবৃত্তি করিতে বলা বা উৎসাহ দেওয়া।

১৫। **অসম্বদ্ধ পাঠ।** পরস্পর সম্পর্কশূন্য অনেক বিষয় ছাত্রের সামনে স্থাপন করা।

১৬। **যন্ত্রের মত পাঠ দেওয়া।** পাঠ আনন্দদায়ক ও প্রেরণাদায়ক না হওয়া।

১৭। পাঠ্য বিষয় শ্রেণীর উপযোগী না হওয়া। শ্রেণীর পক্ষে অতি সহজ বা কঠিন হওয়া।

১৮। পাঠদান-পদ্ধতি বিষয়ের বা শ্রেণীর উপযোগী না হওয়া।

শিক্ষা সম্বন্ধে কতিপয় সারগর্ভ নীতিবাক্য

(Some Educational Maxims)

১। অল্পবয়স্ক শিশুগণকে প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে (Teach the children mainly through their senses)।

২। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বস্তুসম্পর্কশূন্য জ্ঞানে যাইতে হইবে (Concrete to abstract)।

৩। শিশুর জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যে তাহাকে অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে (From known to unknown)।

৪। সরল বিষয় হইতে জটিল বিষয়ে যাইতে হইবে (From simple to complex)।

৫। বিষয়ের অনির্দিষ্ট জ্ঞান হইতে সঠিক জ্ঞানে যাইতে হইবে (From indefinite to definite)।

৬। সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে অংশের জ্ঞানে যাইতে হইবে (From whole to parts)। এখানে সম্পূর্ণ বলিতে ছাত্র যে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানে তাহাই বুঝায়।

৭। অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান হইতে যুক্তিযুক্ত স্থানে যাইতে হইবে (From Empiricism to rationalism)।

৮। মনোবিজ্ঞান-সম্মত ক্রম বা পদ্ধতি হইতে যুক্তিযুক্ত ক্রম বা পদ্ধতিতে হইতে হইবে (From psychological to logical)।

৯। উদাহরণ হইতে সূত্রে যাইতে হইবে এবং পুনঃ সূত্র হইতে উদাহরণে আসিতে হইবে (From examples to rule and again from rule to examples)। আরোহী ও অবরোহী প্রণালীতে এই কথাই বলা হইয়াছে।

১০। বিশ্লেষণ হইতে সংশ্লেষণে যাইতে হইবে (From analytic to synthetic)।

১১। প্রকৃতির অনুসরণ কর (Follow nature)। প্রকৃতি যে নিয়মে কাজ করে সেই নিয়মে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মনীষী রুশো উপদেশ দিয়াছেন।

১২। পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে পাঠগ্রহণ করিতে হইবে (Teaching must be accompanied by learning)।

১৩। আনন্দদায়ক এবং প্রেরণাদায়ক ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে (Teaching must be interesting and inspiring)।

১৪। ছাত্রকে নিজ চেষ্টায় শিক্ষা করিতে উৎসাহ দিতে হইবে (Students should be encouraged to learn by self-efforts)।

১৫। ছাত্রের ব্যক্তিত্বের সম্মান করিতে হইবে (Individuality of the child must be respected)।

১৬। বই পড়া বা পাঠ শ্রবণ হইতে অভিজ্ঞতার সাহায্যে বেশী শিক্ষা হয় (Experience is a better teacher than study of books or oral instructions)।

১৭। ছাত্রের সহযোগিতায় শিক্ষা দিতে হইবে (Lessons must be given in co-operation with the class)।

১৮। মানবজাতির শিক্ষা লাভের ইতিহাসের সহিত মিল রাখিয়া শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে (Education of the child must accord with the education of man, considered historically)।

যথা,—মানুষ যেমন প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষা করিত, প্রকৃতির প্রভাবের প্রতিক্রিয়া করিয়া শিক্ষা করিত, কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা করিত, শিশুকেও সেই সেই উপায়ে ও ক্রমে শিক্ষা দিতে হইবে।

১৯। শিশুকে কাজ করিয়াই শিক্ষালাভ করিতে দাও (Let the pupil learn by doing)।

২০। শিশুকে শিক্ষা দেওয়া অর্থ শিশুর বিকাশ সাধন করা (To educate a pupil is to develope him)।

Reference

1. T. Raymont—The Principles of Education, Chaps. VIII & XI.

2. Welton– Principles and Methods of Teaching. Chap. III

3. J. Landon—The Principles and Practice of Teaching and Class-Management. Chaps. I—V.

4. Percival R. Cole—The Method and Technique of Teaching. Chaps. IV—XII.

5. Valentine Davis—The Matter and Method of Modern Teaching. Chap. VII.

6. B. Dumvile—Teaching, Chaps. II—IX, XIII.

7. P. Wren—The Indian Teacher's Guide, Chaps. VIII and X!

8. T. Raymont—Modern Education, Chap. VIII.

সমাপ্ত